Boighar.com

বি.এবিডি ও বইঘর নিবেদন

দিঘলীতলার কান্না

শফীউদ্দীন সরদার

রোকন

বইঘর

দিঘলীতলার কান্না

www.boighar.com

শফীউদ্দীন সরদার

বইঘর
www.boighar.com
[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
দূরালাপনী : ০১৭১১৭১১৪০৯, ০১৭২১১২২৫৬৪

বই ঘর

দিঘলীতলার কান্না
শফীউদ্দীন সরদার

প্রকাশক
ব ই ঘ র -এর পক্ষে
এস এম আমিনুল ইসলাম

© সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৫

প্রচ্ছদ
হা মীম কেয়ায়েত
www.boighar.com
কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস
২৬/২ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০
www.boighar.com
মূল্য : ১৮০ টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-91406-4-1
www.boighar.com

DIGLITOLAR KANNA : By ShafiUddin Sarder
Published by : S M Aminul Islam, BhoiGhor : 43 Islami Tower
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100 First Edition : February 2015 © by the publisher

Price : 180 Taka only

উ|ৎ|স|র্গ

www.boighar.com

আমার স্নেহের নাতনী
সাগুফতা ইরানীকে
–দাদা শফীউদ্দীন সরদার

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

আমাদের কথা

www.boighar.com

বাংলা-সাহিত্যে শেকড়সন্ধানী ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচিত, তুমুল জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শফীউদ্দীন সরদার। ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস লিখে তিনি বাংলা-সাহিত্যে এক ভিন্নমাত্রা সংযোজন করেছেন। তাঁর সৃষ্টিকর্ম আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি বর্তমান প্রজন্মকে ইতিহাস শেখানোর নতুন টনিক হিসেবে কাজ করছে। একই সঙ্গে তিনি লিখেছেন অনেক সামাজিক গল্প-উপন্যাস। এসব সৃষ্টিকর্মে মুসলিম ঐতিহ্যকে তিনি যেমন ধারণ করেছেন দরদের সঙ্গে, তেমনি নৈতিক ও ইসলামী মূল্যবোধকে তুলে ধরেছেন মমতার সঙ্গে।

ইচ্ছা ছিল বর্ষীয়ান এই কথাসাহিত্যিকের সবগুলো গল্প এক মলাটে গ্রন্থবদ্ধ করে সমগ্র বের করার। কিন্তু সময় স্বল্পতা ও প্রকাশনা শিল্পের বেহাল দশায় এবার সেটি সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই যে গল্পগুলো এখনও গ্রন্থবদ্ধ হয়নি সেগুলো নিয়েই প্রকাশ করা হলো গল্পগ্রন্থ 'দিঘলীতলার কান্না'। এই বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে শফীউদ্দীন সরদারের অপ্রকাশিত তেমন কোনো গল্প আর অবশিষ্ট থাকবে না। ভবিষ্যতে তাঁর সবক'টি গল্পগ্রন্থ একসঙ্গে করে গল্প সমগ্র বের করার ইচ্ছা আমাদের রয়েছে। আশা করি শফীউদ্দীন সরদারের ভক্ত পাঠকরা এ বইটি থেকে নতুন স্বাদ আস্বাদন করতে পারবেন।

বইঘরের ঐতিহ্য অনুযায়ী এ বইটিও সর্বাঙ্গ সুন্দর ও নির্ভুলভাবে পাঠকদের উপহার দিতে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। পরবর্তী সংস্করণের জন্য বিজ্ঞ পাঠকের যে কোনো পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। মহান আল্লাহ তায়ালা কিংবদন্তীতুল্য বর্ষীয়ান এই কথাসাহিত্যিককে পূর্ণ সুস্থতার সাথে নেক হায়াত দান করুন। আমিন।

তারিখ
১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঈ.

সমর ইসলাম
নিউজরুম এডিটর
একুশে টেলিভিশন, ঢাকা

সূ চি প ত্র

www.boighar.com

অতীত দিনের স্মৃতি / ৯
কলির কেষ্টো / ১৯
হুঁশেই আছে হুসেন আলী / ২৫
বাড়তি ঈদ / ৩৩
আমার ছেলেবেলার ঈদ / ৪২
ধোলাইনামা / ৪৭
অবশেষে / ৫২
শীল যায় কিল খায় / ৬৩
শরাফত আলীর স্বাধীনতা / ৭০
বেতনভুক্ত খাদক / ৭৪
দিঘলীতলার কান্না / ৭৯
মার ছক্কা / ৮৬
ত্যাগ / ৯১
অপরিণামদর্শী / ৯৯
পথের ছেলে / ১০৫
বাহাদুর / ১১০
ভদ্রতা / ১২৫
দুলালীর দিনকাল / ১২৯
ভুলিও স্মৃতি মম / ১৩৩
সাবাশ চাচী, সাবাশ / ১৪৩
ভ্রান্তি / ১৪৯
এক যে ছিল ছোট্যাকানা / ১৫৫
দুলাহ মিয়া / ১৬৩

www.boighar.com

দিঘলীতলার কান্না

শফীউদ্দীন সরদার

কৃতজ্ঞতা

ROKON

SCAN &EDITEDBY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING
THE ORIGINAL BOOK.

দিঘলতলার কান্না

www.boighar.com

অতীত দিনের স্মৃতি

www.boighar.com

'অতীত দিনের স্মৃতি কেউ ভুলে না কেউ ভুলে'– কবি নজরুল ইসলামের গানের একটি কলি। অতীত দিনের সকল কাহিনী সকল স্মৃতি সকলেই এক সাথে ভুলে না। ব্যক্তিজীবন, জাতীয় জীবন– সব ক্ষেত্রেই এ সত্য চরম সত্য। বিশেষ করে জাতীয় জীবনের বিপর্যয়ের স্মৃতি বা কাহিনী কেউ কেউ ভুললেও সকলেই ভুলে না। প্রসঙ্গ এসে হাজির হলেই সে কাহিনী আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগে অনেকের।

কারবালার স্মৃতি দুনিয়ার তামাম মুসলমানের এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি। পলাশীর বিপর্যয়ও বাংলার মুসলমানদের তেমনই এক অবিস্মরণীয় অতীত। কেউ কেউ ভুলে গেলেও পলাশীর কাহিনী বাংলার মুসলমানেরা সকলেই ভুলেনি। ভোলার উপায় নেই। জাতীয় জীবনে মুসিবতের মেঘ দেখা দিলেই সেদিনের সেই বিপর্যয়ের কথা ও কাহিনী নতুন করে মুসলমানদের মনে জাগে আবার। মনে পড়ে মীরজাফর, মীরন, মীর কাশিম, খাদেম হোসেন প্রমুখ স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গের উপলব্ধির কথা। তাদের বিভ্রান্তি, অজ্ঞতা ও স্বার্থপরতার কথা। কথায় বলে 'হিস্ট্রি রিপিট্স্ ইট্সেল্প'। অতীতের পুনরাবৃত্তি দেখলে মনেই শুধু পড়ে না, হু হু করে পড়ে।

ঈসায়ী ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে অস্ত গেল বাংলার সৌভাগ্য সূর্য। অপহৃত হলো বাংলার আজাদী। বাংলার বুকে নেমে এলো আঁধারী। সূচিত হলো বাংলার দুর্ভাগ্যের অধ্যায়। অবশ্য সবার জন্যে নয়। দুর্ভাগ্য সূচিত হলো বাংলার মুসলমান অধিবাসীদের, যারা বাংলার সিংহভাগ জনগোষ্ঠী। বেঈমানী ও নির্জলা মিথ্যাচারের বেসাতির কারণে অবলুপ্ত হলো বাংলার স্বাধীনতা। দোষের ভাগী হয়ে রইলো কিছু নামসর্বস্ব মুসলমান যাদের ঘাড়ে ভর করে এবং যাদের গোঁফে আঠা লাগিয়ে মুসলমান শাসনের বিরোধী গোষ্ঠী বাংলার আজাদী ইংরেজ বণিকদের হাতে তুলে দিলো। আজাদী বিকিয়ে দিয়ে নিজের ভাগ্য গড়ে নিলো তারা।

সেরেফ ব্যক্তি স্বার্থের জন্যে মুসলমান গাদ্দারেরা আর ব্যক্তি স্বার্থের সাথে হিংসা ও বিদ্বেষ চরিতার্থ করতে মুসলমান শাসনের বিরোধী চক্র বাংলার স্বাধীনতা পানির দামে বেচে দিলো। ফলশ্রুতিতে দুর্দিন সূচিত হলো কেবল মুসলমান জনগোষ্ঠীর জন্যেই। কারণ, মুসলমান গাদ্দারদের ধোলাই করা মগজের মতো ঐ বিরোধী চক্রের মগজ আদৌ ভোঁতা ছিল না। ফতে চাঁদ, জগতশেঠ, মানিক চাঁদ, রাজ বল্লভ, রায় দুর্লভ, উমিচাঁদ, নন্দকুমার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ মুসলমান শাসনের উৎখাতে এত কাঠখড়ি এতদিন ধরে আর এত কষ্ট করে নিজেদের দুর্দিন আনার জন্যে পুড়ায়নি। তাদের সুদিন আসবে বুঝেই পুড়িয়েছে তারা তা। সুদিন তাদের এসেছেও অবারিত ধারায়।

এদিক দিয়ে বিচার করলে মুসলমান শাসনের এইসব অমুসলমান বৈরী ব্যক্তিরা অনেকখানি প্রশংসারও হকদার। আচরণ তাদের ঘৃনিত হলেও, লক্ষ্য তাদের ঘৃনিত নয়। সেটা বরং মহৎ ও বৃহৎ। বলা যায়, এক বৃহৎ স্বার্থের তারা একনিষ্ঠ সাধক। নিবেদিতপ্রাণ তপস্বী। সাধনার মাধ্যমে ব্যক্তি স্বার্থের সাথে তারা তাদের সজাতির বৃহৎ স্বার্থ হাসিল ও সুদৃঢ় করেছে। নবাবের নকরী থেকে বেরিয়ে এসে ইংরেজদের সহায়তায় তাদের জাতিকে প্রভুত্বের পর্যায়ে উঠার পথ করে দিয়েছে তারাই। তাদের অবদানের জন্যেই কালক্রমে তাদের নিজ ধর্মের লোকেরা জমিদার ও রাজা-মহারাজা হয়ে পরোক্ষভাবে হলেও বাংলার শাসকের পদে বসেছে।

এদিক দিয়ে উদ্যোগ তাদের নিঃসন্দেহে প্রশংসার। বিশেষ করে 'মারি অরি ছলে কি কৌশলে'– এই যাদের শাস্ত্রীয় বিধান, সেখানে মিথ্যাচার আর জালিয়াতি করা তাদের চিন্তায় মারাত্মক কিছু ব্যাপার নয়। সবার উপরে কথা, স্বজাতির অর্থাৎ স্বধর্মের লোকদের স্বার্থ মজবুত করতে যারা জান বিপন্ন করেছে, তাদের এক তরফাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই।

হেয় আর নিকৃষ্ট কেউ হলে তা মুসলমান নামধারী দালাল আর গাদ্দারেরা। বাংলার স্বাধীনতা বিলুপ্তিতে তাদের দোষের হিস্যা কম হলেও, ঐসব নাম সর্বস্ব মুসলমান গাদ্দারদের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতা যেমনই নিকৃষ্ট তেমনই ঘৃনাতীত ঘৃনিত। নিছক ব্যক্তি স্বার্থের খাতিরেই গাদ্দারী করেছে তারা। দেশের স্বার্থ তো দেখেইনি, তারা স্বজাতির ও স্বধর্মের স্বার্থটাও দেখেনি। তাদের কৃতকর্মের ফলে তাদের বংশধরেরা নর্দমা সাফ করে মজুরে পরিণত হবে কি না, তাদের স্বজাতি অর্থাৎ কওমটা রসাতলে যাবে কি না, আজ যারা মস্তকে তাদের হাত বুলিয়ে চলেছে কাল তারা তাদের পশ্চাৎভাগে পদাঘাত করবে কি না– এসব ভাবনা একটুও ভাবেনি। সেরেফ ব্যক্তি স্বার্থের জন্যেই তারা নিজের দেশ ও কওমের ভাগ্য নিয়ে সওদাবাজি করেছে।

ফলাফল যা হবার তাই হয়েছে। তাদের সেই ব্যক্তি স্বার্থও তারা ক্ষণিকের অধিককাল ধরে রাখতে পারেনি। মন্ত্রণাদাতা বন্ধুদের শক্ত লাথি খেয়ে কেউ বা তখনই তা হারিয়েছে, কেউ বা 'ক্লাইভের গর্দভ' হয়ে ক্লাইভের তাঁবেদারি করার বদৌলতে কয়েকদিন পরে তা হারিয়েছে। কারো আবার জিল্লুতি সর্বস্ব খোয়ানোর পরও শেষ হয়নি। প্রাণ বাঁচানোর তাকিদে দূর-দূরান্তে পালিয়ে যেতে হয়েছে এবং ফকিরের বেশে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে পথেই পড়ে মরে থাকতে হয়েছে। এ ছাড়া, বজ্রপাতও হয়েছে সিরাজের হত্যার হোতা মীরনের মাথায়।

এ সমস্ত ইতিহাস যেমনই মসীলিপ্ত তেমনই চটকদার। ঈসায়ী ১৭৫৭ সনের ২৩শে জুন তারিখে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা পলাশীর প্রান্তরে পরাজিত হলেন। বাংলার মালিকানা চলে গেল ইংরেজ বেনিয়াদের হাতে। সপরিবারে পলায়নকালে মীর জাফরের জামাতা মীর কাশিমের হাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ধৃত হলেন

রাজমহলের নিকটে এবং নীত হলেন মুর্শিদাবাদে। মীরজাফর তনয় মীরনের নেতৃত্বে তিনি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলেন ঐ সনেরই ৩রা জুলাই তারিখে। বেঈমানী করার বিনিময়ে এর কয়েকদিন আগেই বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হলেন সিপাহসালার মীরজাফর। ক্লাইভ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যান্য প্রধানগণ মীর জাফরের প্রতি এ অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন পূর্বচুক্তি অনুযায়ী। অনুগ্রহ লাভে ধন্য হলেন নতুন নবাব।

কিন্তু এ অনুগ্রহ নির্জলা মধুরই ছিল না। এর পেছনে হুলও ছিল বিষাক্ত। এই বিষে অচিরেই নয়া নবাব মীর জাফর জর্জরিত হয়ে গেলেন। বেঈমানী করার চুক্তিপত্রে শুধু মসনদ লাভের শর্তই ছিল না। এজন্যে ইংরেজদের প্রভূত অর্থ প্রদানের শর্তও ছিল সে চুক্তিতে। শর্তের অর্থ নয়া নবাবকে শোধ করতে হলো মসনদে উঠে বসার সাথে সাথেই। প্রচুর অর্থ দিতে হলো অতিরিক্ত উপঢৌকন হিসেবে। ক্লাইভসহ কোম্পানির বিভিন্ন নেতৃবর্গের বিভিন্ন অর্থ চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে নবাব মীর জাফরের রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল। জেনানাদের জেওর বেচে ষড়যন্ত্রের মিত্রদের পুনঃ পুনঃ অর্থ চাহিদা পূরণ করতে হলো তাঁকে। বিশেষ বাণিজ্য সুবিধেসহ ২৪টি পরগনার জমিদারি স্বত্বও ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলেন তিনি। এরপরও বেড়েই চললো ইংরেজদের অর্থচাহিদা। অর্থ প্রদানে অপারগ বা বিলম্ব হওয়ায় বেড়েই চললো ক্লাইভসহ কোম্পানির নেতৃবর্গের অসন্তুষ্টি। নয়া নবাব দিশেহারা হয়ে গেলেন।

সেরেফ অর্থনৈতিক নির্যাতন আর জিল্লতিই নয়। মসনদে উঠে নবাবের সামান্যতম মর্যাদাও পেলেন না নতুন নবাব মীরজাফর। পেলেন না কোন মহলেই যথাযথ সম্মান। ইংরেজদের কাছে নতজানু হয়ে চলতে চলতে এবং ক্লাইভের তাবেদারী করতে করতে সব মহলেই তিনি 'ক্লাইভের গর্দভ' নামে সুপিরিচিত হলেন তখ্‌তে উঠে বসার অল্প দিনের মধ্যেই। ইংরেজদের তুষ্ট রাখতে গিয়ে তাদের অপমানজনক আচরণ অহরহ হজম করতে লাগলেন তিনি। ফলে পাত্রমিত্র, সভাসদ ও কর্মচারীদের কাছে তিনি অত্যন্ত হেয় ও অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হয়ে গেলেন দিনে দিনে। তার মুখের উপর এবং তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিদ্রূপ করতেও দ্বিধা করতেন না অনেকেই।

এমন অনেক নজীরের উল্লেখ আছে অনেক স্থানে। একদিন ভরা দরবারে মির্যা শামসুদ্দীন নামক এক সভাসদকে অন্য এক সভাসদ অভিযোগ করে বললেন– 'কর্নেল ক্লাইভ আপনার উপর বড়ই নাখোশ আছেন। কারণ আপনি নাকি কর্নেলের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ করেছেন।'

জবাবে মির্যা শামসুদ্দীন নবাব মীর জাফরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন– 'কি যে বলেন জনাব! আমি কর্নেলের গর্দভকে দিনে তিনবার কুর্নিশ না করে খাদ্য স্পর্শ করিনে, আর আমি করবো কর্নেলের সাথে অসম্মানজনক আচরণ?'

এ রকম পরোক্ষ বিদ্রূপই কেবল শুনতে হয়নি নবাব মীর জাফরকে, দালালী করে

মসনদে আসার দরুন কোম্পানির অনেক প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ অনেক সময় অনেক কটুকথা তাকে প্রত্যক্ষভাবে শুনিয়েছেন পাত্রমিত্র সভাসদদের সামনেই।

একদিন নবাব সময় নির্দিষ্ট করে দিয়ে জোর তাকিদ ও তলব দেওয়া সত্ত্বেও ক্লাইভের এক সহকর্মী এবং নবাবের দরবারে কোম্পানির সাময়িক প্রতিনিধি মি. লিউক স্ক্র্যাফ্টন দরবারে হাজির হতে বিস্তার বিলম্ব করলেন। দরবারে সেদিন সভাসদগণ ছাড়াও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিদেশী দূতেরা উপস্থিত ছিলেন। দরবারের কার্যক্রমের সাথে মি. স্ক্র্যাফ্টন সেদিন বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন এবং তার অত্যধিক বিলম্ব হেতু দরবারের কাজ স্থগিত হয়ে রইলো। এতে করে 'নবাবের আদেশের কোন মূল্য নেই, এ নবাবকে আদৌ কেউ নবাব বলে গণ্য করে না'– এই মর্মে দরবারে চাপা গুঞ্জরণ শুরু হলো। স্ক্র্যাফ্টনের এই আচরণের জন্যে নবাব বড়ই অপমানিতবোধ করলেন। অনেক পরে মি. স্ক্র্যাফ্টন এসে হাজির হলে নবাব মীর জাফর নবাবী চালে রুষ্টকণ্ঠে বললেন– মি. স্ক্র্যাফ্টন, জরুরি তলব দেয়া সত্ত্বেও আপনি এত দেরী করলেন কেন?

নবাবের রোষের প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূপেক্ষ না করে মি. স্ক্র্যাফ্টন হো হো করে হেসে উঠে বললেন– ডেরী! আইমিন লেট্! হাঁ, হাঁ, হামার লেট্ হইয়াইছে– ডেরী হইয়াছে বিলকুল।

নবাব পূর্ববৎ রোষভরে বললেন– কেন দেরী হলো?

স্ক্র্যাফ্টন বললেন– আসিবার পঠে হামি একঠো গ্রেভ, আইমিন কবর ডেখিলো। হামার ডুপ্টারী (দপ্তরী) হামাকে জানাইয়া ডিলো, ওই কবর জেনারেল মীর মর্ডান বাহাডুরকা কবর আছে। মাই গড্! জেনারেল মীর মর্ডান বাহাডুর বহুট বড়া ওয়ারিয়ার– বহুট ব্রেভ ফাইটার, হামি টাহা জানে। হামি কিয়া করিবে? দেন এ্যাস্ত দেয়ার হামি ডাঁড়াইয়া গেল। মাঠার হ্যাট্ খুলিয়া লইয়া টাহার কবরের প্রতি 'বো' করিল, স্যালিউট্ করিল। ঠোড়া টাইম সাইলেন্ট্ ঠাকিয়া টাহার আট্মার প্রটি সম্মান প্রডর্শন করিল।

অপরিসীম বিস্ময়ে নবাব মীর জাফর বললেন– তাজ্জব!

সাহেব বললেন– উস্কো বাড, কবরে ঠোড়া ফ্লাওয়ার, আইমিন ফুল ডিটে হামার খাহেশ হইল। ডুপ্টারী ফুল আনিটে ডেরি করিল। বহুট বহুট লেট্।

: সাহেব!

হামি ফুল ডিয়া জেনালেকা কবর অ্যাডোর্ন করিল। সম্মান করিল। টাহার পর অভি জলডি জলডি চলিয়া আসিল। হামি আচ্ছা কাম করিয়াছে, ইজ্জট্কা কাম। ইজ ইট নট্? ঠিক নেহি?

চোখে মুখে সীমাহীন বিরক্তি ফুটিয়ে তুলে নবাব মীর জাফর বললেন– তার মানে? ওরা তো আপনাদের শত্রু। দুশমন।

দুশমনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গেলেন?

ও ইয়েস! জরুর টাহা করিটে হইবে। হি ইজ এ হিরো। বহুট বড়া আট্মা। উহাকে টো জরুর সম্মান ডেখাইটে হোবে।

নবাব ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন– বটে! বাংলার নবাবের চেয়ে ঐ কবরটাই আপনার কাছে বড় হলো! নবাবকে বসিয়ে রাখাটা আপনার কাছে কিছুই নয়? এত সাহস আপনার?

: হোয়াট?

আপনারা পেয়েছেন কি? নবাবকে উপেক্ষা করে, নবাবের হুকুম অমান্য করে আপনি গেলেন ঐ একটা ফালতু লোকের কবরের প্রতি সম্মান দেখাতে? আমার চেয়ে ঐ মৃত মীর মর্দানটাই কি আপনার কাছে বেশী সম্মানী হলো?

: অফকোর্স! হান্ড্রেড্ টাইম্স। উও আডমী হাপনার চেয়ে বহুট জিয়াডা অনারেবল, আইমিন সম্মানী আছে।

নবাব হুংকার দিয়ে বললেন– হুশিয়ার সাহেব! কিসে সে জিয়াদা সম্মানী হলো?

সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে রোষভরে বললেন– উও আড্মী টাহার কান্ট্রির জন্যে, টাহার কওমের জন্যে, জান ডিয়াছে। কুয়ী সেলফ্ ইন্টারেস্ট ডেখে নাই। কুয়ী লোভ টাহাকে টাহার মহট্ কর্টব্য হইটে টলাইটে পারে নাই। আওর হাপনি? হাপনি একজন গ্রীডি, আইমিন, লোভী আডমি আছে। হাপনি হাপনার পারসোন্যাল ইন্টারেস্টকো লিয়ে, ব্যক্টি স্বার্ঠের জন্যে, হাপনার ডেশ্ আওর জাটির সাঠে গাড্ডারি করিয়াছে। বেঈমানী করিয়াছে। সার্ঠের লোভে হাপনি হামাডের ডালাল হইয়া কাজ করিয়াছে। সম্মানের হাপনি কুচু হকডার না আছে।

: সাহেব!

জেনারেল মীর মর্ডান একঠো মহট্ ডিলের আডমী, ঈমানডার লোগ্। আওর হাপনি একঠো ট্রেটর আছে। বিশওয়াশ ঘাটক। জিয়াদা লাভ ডেখিলে হাপনি ফের ডুসরা আডমীর সাঠে ডোষ্টি করিয়া হামাডের সাঠে বেঈমানী করিবে। হাপনাকে হামরা বিশওয়াশ করে না। বিশওয়াশের আন্ফিট্ আডমী সম্মান পাইবে কেনো, বাটাও?

এরপর নবাব আর মাথা তুলতে পারেননি।

মরহুম মীর মর্দানের প্রতি মি. লিউক স্ক্র্যাফ্টনের শ্রদ্ধাবোধটা কৃত্রিম বা অকৃত্রিম যা-ই হোক, মীর জাফরকে ইংরেজরা কিছুমাত্র সম্মানের চোখে দেখতো না বা পরোয়াও করতো না। ইংরেজদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মীর জাফর আবার গুলন্দাজ বণিকদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে ইংরেজরা তাকে তখনই গদি থেকে নামিয়ে দিলো এবং তার জামাতা মীর কাশিমকে এনে মসনদে বসালো। বিনিময়ে মীর কাশিমও ইংরেজদের বহু অর্থ উপঢৌকন দিলেন, খোশদিলে দান করলেন বর্ধমান, মেদেনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা।

কিন্তু মীর কাশিমের এই খোশহাল অধিককাল রইলো না। বেহুশের হুশ ফিরে কাছায় আগুন লাগার পর। মসনদে উঠেই তিনি বুঝতে পারলেন, এটা নবাবী করা

নয়, ক্রীতদাসের মতো ইংরেজদের গোলামী করা। ফলে তিনি ইংরেজদের প্রভুত্ব খাটো করে নবাবের ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। তার দরবারের যে অশুভ চক্রটি মুসলমান শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা হোক– এটা কল্পনা করতে পারে না, তারা আবার ইংরেজদের সাথে জোরদারভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। এই অশুভব্যূহ ভেদ করে ইংরেজদের সাথে তিনি কোন যুদ্ধেই কামিয়াব হতে পারলেন না। স্বদেশী বেঈমানদের বেপরোয়া বেঈমানীর কারণে কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ গিরিয়া, উদয়নালা, মুঙ্গের প্রভৃতি যুদ্ধে একের পর এক তিনি পরাজিত হলেন। ইংরেজরা আবার মীর জাফরকে এনে বাংলার মসনদে বসালো।

রাজ্যহারা মীর কাশিম শেষ চেষ্টা করলেন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের সাথে মিত্রতা স্থাপন করলেন তিনি। তাদের সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে শেষবারের মতো তিনি ইংরেজদের মোকাবেলায় নামলেন বকসারের ময়দানে। ঈসায়ী ১৭৬৪ সনে বকসারে ঘোরতর লড়াই হলো এই সম্মিলিত ফৌজ ও ইংরেজ বাহিনীর মধ্যে। পরিস্থিতি মীর কাশিমের মোটেই পক্ষে ছিল না। নসীবও মোটেই প্রসন্ন ছিল না তার। চরম বেঈমানীর শিকার হয়ে বকসারেও চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলেন তিনি। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার মন্ত্রী মহারাজ বেণী বাহাদুর এবং মুঘল বাদশাহ শাহ আলমের দেওয়ান সেতাব রায় চরম বেঈমানী করে সুপ্রশস্ত করে দিলো ইংরেজদের জয়ের পথ। ইংরেজরা অযোধ্যাও দখল করে নিলো এবং বেণী বাহাদুর এতে আহ্লাদিত হওয়া বই দুঃখিত হলেন না। মীর কাশিম ভগ্ন হৃদয়ে ও প্রাণের ভয়ে অযোধ্যার আরো পশ্চিমে পালিয়ে গেলেন এবং পথে পথে ঘুরতে লাগলেন ফকিরের ছদ্মবেশে।

একটানা কয়েকটি বছর নবাব মীর কাশিম দীনহীন হালে ঘুরে বেড়ালেন পথে পথে। নানাজনের কাছে ফরিয়াদ করে ফিরতে লাগলেন। এইভাবে ঘুরে বেড়ানোর কালে দিল্লীর কাছাকাছি এক জায়গায় নবাব মীর কাশিমের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে বাংলার আর এক সর্বহারা ও ভাগ্যাহত ব্যক্তি হাজী আফতাবের। নবাব মীর কাশিম ভাগ্যাহত হয়েছিলেন নিজেদের আক্কেল গুণে। হাজী আফতাব ভাগ্যাহত হয়েছিলেন নিজের দোষে নয়, মীর কাশিমদেরই ঐ বেআক্কেলীর কারণে। একের দোষে অন্যের ভোগান্তির ব্যাপার ছিল হাজী আফতাবের।

হাজী আফতাব ছিলেন বাংলার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। নবাব সিরাজউদ্দৌলার দরবারে একজন দ্বিতীয় কাতারের সভাপসদও ছিলেন তিনি। সর্বস্ব হারিয়ে তিনি এখন এই মুলুকে এসে পরিবার পরিজন নিয়ে কোনমতে কালাতিপাত করছিলেন। এক অখ্যাত এলাকার বিরান পথে আচমকাই মীর কাশিমকে আবিষ্কার করলেন হাজী আফতাব।

হাজী আফতাব পথ বেয়ে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে দেখলেন, পথের এক জনহীন প্রান্তে পত্রহীন এক বৃক্ষতলে ধুলোর বিছানায় শুয়ে আছে এক রাহাগীর। পরনে তার শতছিন্ন লেবাস, দেহখানি হাড্ডিসার। অথচ ঐ হাড্ডিসার দেহ থেকেই বিচ্ছুরিত

হচ্ছে আভিজাত্যের রশ্মি।

হাজী আফতাব কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। ব্যাপারটা জানার জন্যে তিনি পথ থেকে নেমে ঐ বৃক্ষতলে এলেন। সন্ধানী নজরে রাহাগীরের মুখের দিকে চেয়েই তিনি চমকে উঠলেন। দেখলেন, ধুলোয় শায়িত ব্যক্তিটি বাংলার নবাব মীর কাশিম।

মীর জাফরের জামাতা মীর কাশিম বাংলার তখতে বসেছেন এ খবর তিনি শুনেছিলেন। এ খবরও শুনেছিলেন যে, ইংরেজরা আবার মীর কাশিমের হাত থেকে মসনদ কেড়ে নিয়ে তার শ্বশুর মীর জাফরকে দিয়েছে। মীর কাশিমের নবাবী আর নেই। তার অর্থ কি এই? মসনদ থেকে একদম এই বিরান পথের ধুলোয়?

হাজী সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। নবাব মীর কাশিম তখন কিঞ্চিৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। হাজী আফতাবের উপস্থিতি টের পেলেন না মীর কাশিম। হাজী আফতাব একদৃষ্টে তার এই নিদারুণ হালতের দিকে চেয়ে রইলেন। চেয়ে থাকতে থাকতে অকস্মাৎ তার স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো কয়েক বছর অতীতের এক ঘটনা–

নবাব সিরাজউদ্দৌলা তখন বাংলার তখতে আসীন। তাঁকে উৎখাত করার জন্যে সামরিক বিভাগের বিশেষ ব্যক্তিত্ব এবং শেঠ রাজ বল্লভদের দলে ভিড়ে তিনি অহরহ বৈঠক দিচ্ছেন ইংরেজদের সাথে।

www.boighar.com

মীর জাফরের সাথে হাজী আফতাবের কিছুটা ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিছুটা আত্মীয়তাও ছিল কিছু দূর দিয়ে। সেই সুবাদে হাজী আফতাব একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হাজির হলেন মীর জাফরের দপ্তরের বিশেষ এক কক্ষে। কক্ষে তখন অন্য ধর্মের কোন লোক ছিল না। যারা ছিলেন সবাই তারা মুসলমান। ছিলেন সালার মীর জাফর, তদীয় পুত্র মীরন, তদীয় জামাতা মীর কাশিম, সহকারী সৈন্যধক্ষ খাদেম হোসেন ও মীর জাফরের আরো কয়েকজন মুসলমান সহযোগী। তারা তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ-সালাপ করছিলেন। এমন সময় হাজী আফতাব হাজির হলে তারা গোপন আলাপ করছেন এটা বুঝতে না দিয়ে মীর জাফর হাসিমুখে বললেন– আরে এই যে হাজী সাহেব, আসুন আসুন। কতদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। কেমন আছেন?

হাজী আফতাব বললেন– আছি তো ভালই। তবে একটা কথা শুনে মনটা বড় খারাপ হলো, তাই হাঁটতে হাঁটতে এলাম।

কেমন! কি কথা বলুন তো শুনি?

: নবাবের পক্ষ ছেড়ে আপনারা নাকি জগৎ শেঠ বাবুদের সাথে হাত মিলিয়েছেন?

জবাবে মীর জাফর তনয় মীরন নাখোশকণ্ঠে বললেন– তাতে কি হয়েছে? উত্তম লোকদের সাথে হাত মেলানোর মধ্যে আপনি দোষের কি দেখলেন?

হাজী আফতাব চকিতে একটু থমকে গেলেন। এরপর ঈষৎ গম্ভীরকণ্ঠে বললেন– উত্তম লোক। হ্যাঁ, উত্তম লোক তো আমরা সবাই। তবে এক একজন এক এক দিক দিয়ে। শেঠ বল্লভ অতিথি বৎসল আর খোলা দিলের মানুষ। ওরাই দেশের

শ্রেষ্ঠ নাগরিক আর বলতে গেলে দেশের আর দশের এখন ওঁরাই ভরসা। অন্যদের যে মানসিকতা দেখছি, তা উল্লেখেরও অযোগ্য।

: সাহেবজাদা।

আপনাদের প্রিয় কিছু দাম্ভিক, গোঁয়ার আর গণ্ডমূর্খের মতো ওঁরা মোটেই সংকীর্ণমনা নন।

কিন্তু ওরা তো ইংরেজদের পক্ষের লোক। ইংরেজগত প্রাণ। ইংরেজদের সুখে ওদের সুখ, ইংরেজদের দুঃখে ওদের দুঃখ।

এবার জবাব দিলেন মীর কাশিম। তিনি বললেন– হতেই হবে। আমাদের সকলেরই মানসিকতা তাই হওয়া উচিত। ইংরেজরা এদেশে এখন বিরাট এক শক্তি। আর না হোক, তাদের সাথে মিত্রতা বজায় রেখে চলাই এখন সবার আমাদের কর্তব্য। ওদের সাথে শত্রুতা করলে লাভ আমাদের এক বিন্দুও নেই, আছে কেবলই ক্ষতি। তদুপরি ওরা আমাদের বন্ধু। পরম উপকারী বন্ধু। ব্যবসার মাধ্যমে কর-শুল্ক দিয়ে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোটা ধরে রেখেছেন ওরা। ইংরেজরা আমাদের সম্পদের উৎস, সৌভাগ্যের ডিব্বা।

: কিন্তু তারা তা এদেশটা গ্রাস করার তালে আছে?

মীর কাশিম বিরক্তির সাথে বললেন– এটা খামাখা আপনাদের এক জুজুর ভয়। ওরা এদেশ নিতে আসবে কেন? ওদের কি নিজের দেশ নেই। আমাদের চেয়ে এখন অনেক উন্নত দেশ ওদের। এ জঞ্জাল ওরা নিতে আসবে কেন? দুর্জনদের হাত থেকে এদেশের জনগণকে মুক্তি দিতে ওরা আমাদের সাহায্য করতে চান– এই আর কি! ওরা আমাদের সাহায্যকারী বন্ধু।

: কিন্তু নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে উচ্ছেদ করে ওরা তো এদেশের স্বাধীনতাটাই বিপন্ন করতে যাচ্ছে?

মীর জাফরের আওলাদ মীরন ফের বললেন– স্বাধীনতা তাতে বিপন্ন হবে কেন? ঐ দুর্জন, গোঁয়ার আর গণ্ডমূর্খ সিরাজই কি এদেশের স্বাধীনতার একমাত্র স্বত্বাধিকারী, না স্বাধীনতা রক্ষার একমাত্র সৈনিক? স্বাধীনতাটা কি তার পৈতৃক সম্পত্তি? আমাদের কথা বাদই দিলাম, ঐ জগৎ শেঠ, রায় দুর্লভ, রাজবল্লভ বাবুরা কি এদেশের স্বাধীনতা চান না? তারা কি এদেশের বাসিন্দা নন? স্বাধীনতার প্রতি কি তাদের দরদ নেই?

: কিন্তু মুসলমান শাসনটা তো এতে করে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে?

: কে বিলুপ্ত করবে?

ঐ জগৎ শেঠ বাবুরা আর ইংরেজরা? হাজার হোক, ওরা বিধর্মী। ওরা চাইবে কেন, তাদের মাথার উপর মুসলমান শাসন থাকুক।

মীরনের রোষ আরো বেড়ে গেল। তিনি গরমকণ্ঠে বললেন– দেখুন হাজী সাহেব! খামাখা ঐ স্বধর্ম বিধর্মের কথা তুলে দেশের সৎ নাগরিকদের মধ্যে বিভেদ পয়দা

করবেন না। ঐ বিষ ছড়াবেন না।

বিষ ছড়ানো হবে কেন? এইটেই তো স্বাভাবিক কথা। আমাদের সমাজ ধর্ম কি আর ওদেরগুলো আর এক। একেবারেই পৃথক জিনিস। আমাদের দীন আর জীবনযাত্রা বিপন্ন হতে পারে ভয়ে আমরাই কি চাইবো, আমাদের মাথার উপর ওদের শাসন থাকুক?

কেন চাইবো না? আমাদের জীবনযাত্রা তাতে বিপন্ন হবে কেন? মুসলমান অমুসলমান সবাই আমরা ভাই ভাই। এক ভাইয়ের দ্বারা আর এক ভাইয়ের ধর্ম আর জীবনযাত্রা বিপন্ন হবে কেন?

: তা না হলে সেটা তো মহৎ বিষয় ছিল। কিন্তু আলামত কি তাই দেখা যাচ্ছে?

আলবত দেখা যাচ্ছে। বরং আপনারা কিছু সংকীর্ণমনের মানুষেরাই ওদের মতো উদার হতে না পেরে, মুসলমান অমুসলমানকে পৃথক করে দেখছেন আর দেশে বিভেদ পয়দা করছেন। মনোভাবটা উদার করুন।

এরপরও হাজী আফতাব জোর দিয়ে বললেন– তবুও এটা সত্য যে, ঐ ইংরেজ আর শেঠ বাবুরা যত উদারই হোন, এই মুসলমান হুকুমাতের পক্ষের লোক কখনো তারা নন। এটাকে বরদাস্ত করার উদারতা আদৌ তাদের নেই। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে উৎখাত করার পর শেঠ বাবুদের পক্ষে রেখে ইংরেজরা যদি এদেশের মালিকানা নিজের হাতে তুলে নেয় তাহলে থাকবে আমাদের হুকুমাত, না থাকবে এদেশের আজাদী?

সীর কাশিম পুনরায় ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন– অসম্ভব। আমরা আছি কি করতে? সে সুযোগ তাদের দেবো কেন আর তারাই বা তা নেবেন কেন? ইংরেজরা এদেশে বাণিজ্য করতে এসেছেন, এদেশ কেড়ে নিতে আসেননি। এত হীন মানসিকতার লোক তারা নন।

তবু যদি কেড়ে নিতে চায় তারা? সিরাজকে পরাজিত করে তারা যদি মসনদের দিকে এগোয়, পারবেন আপনারা তখন তাদের ঠেকাতে?

আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর আমাদের অগ্রাহ্য করে এগুবেন তারা? কি যে আপনাদের কল্পনা!

তাই যদি এগোয়? যুদ্ধে জয়ী হয়ে তামাম ক্ষমতা হাতে নেয়ার পর, আপনাদের ওরা যদি মোটেই আর গ্রাহ্য না করে? আপনাদের কথায় যদি আদৌ আর কান না দেয়?

মীর কাশিম ধমকে উঠে বললেন– থামুন! কিছুটা আত্মীয় আছেন, ঐ আত্মীয়ই থাকুন। হিংসুটে মন নিয়ে আজগুবি কল্পনার জাল বুনবেন না; আর তা বুনে সবাইকে বিভ্রান্ত করবেন না। আমরা কি তখন বসে বসে ঘোড়ার ঘাস কাটবো? তেমন অবস্থা দেখলে, ঐ বেনিয়াদের এই দেশ থেকে লাথি মেরে বের করে দেবো।

মীর জাফর এ কথায় চমকে উঠে বললেন– আহ! খবরদার, খবরদার! ওকি

বেআদবী করছো? এ কথা সাহেবদের কানে গেলে তারা বেজায় নাখোশ হবেন যে!

অন্য এক প্রসঙ্গ নিয়ে একদল অন্য লোক এসে পড়ায় এ আলোচনা আর এগোয়নি।

এরপর একদিন সংঘটিত হলো পলাশীর যুদ্ধ। এ দেশের মালিকানা চলে গেল ইংরেজদের হাতে। বিপক্ষের লোক হওয়ায়, পলাশীর পরে পরেই অমুসলমান ব্যবসায়ীরা হাজী আফতাবের ব্যবসায়ের মালমাত্তাসহ তার সর্বস্ব লুটে নিলো। একই সাথে ইংরেজদের দালালেরা হাজী সাহেবের জানের উপর হামলা করে বসলো। অগত্যা পরিবার-পরিজন নিয়ে হাজী আফতাব বাংলা ছেড়ে পালিয়ে দিল্লীর পার্শ্ববর্তী এই এলাকায় এলেন আর সেই থেকে এখানেই তিনি আছেন। আজ এই পথ প্রান্তে মীর কাশিমকে পড়ে থাকতে দেখে সেদিনের সেই স্মৃতিটি বার বার তার মানসপটে ভেসে উঠতে লাগলো। মনে হতে লাগলো মীর কাশিমের সেদিনের সেই দাম্ভিক উক্তি।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন– ইংরেজদের লাথি মেরে বাংলা থেকে বের করে দেয়ার বড়াই করলেন যে মীর কাশিম, সেই মীর কাশিম আজ বাংলার বাইরে বিদেশের এই ধুলোয় আর ইংরেজরা গাঁট হয়ে বসে আছে বাংলায়।

দালাল-গাদ্দারেরা কতই না দূরদৃষ্টিহীন হয়।

হাজী আফতাবের মৃদু কাশির শব্দে মীর কাশিমের তন্দ্রা ছুটে গেল। 'কে কে' বলে আতংকের সাথে তিনি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন। একদৃষ্টে মুখের দিকে চেয়ে থাকার পর চিনতে পেরে তিনি আবেগভরে জড়িয়ে ধরলেন হাজী আফতাবকে।

এরপর দুইজন ঐ গাছের তলেই বসলেন। তারা দুইজনই এই অবস্থায় এই দূর এলাকায় কেন, একে অন্যের প্রশ্নের জবাবে দুইজনই পর পর তা ব্যাখ্যা করে শোনালেন। মীর কাশিমের বিবরণ শুনে হাজী আফতাব এক ফাঁকে বললেন– কাঙ্গালের কথা বাসি হলে মনে পড়ে জনাব। এমনটা যে ঘটবে, তা সেদিন আগেই আমি বলেছিলাম। কিন্তু আপনারা তাতে কর্ণপাতই করলেন না। আজ দেখুন তো, পারলেন আপনারা ইংরেজদের বাংলা থেকে বের করে দিতে? বরং আপনারাই তো, মানে আপনিই তো...

কথার মাঝেই মীর কাশিম করুণকণ্ঠে বললেন– কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেবেন না হাজী সাহেব। কত বড় যে ভ্রান্তির উপর তখন আমরা ছিলাম, আজ তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।

হাজী আফতাব আফসোস করে বললেন– আজ আর তা বুঝতে পেরে ফায়দা কি জনাব? সর্বনাশ যা করার তা তো করেই আপনারা ছেড়েছেন।

মীর কাশিম আর জবাব দিতে পারেননি।

কলির কেষ্টো

এক হলো পয়গম্বর, আর হলো অবতার। চাল চলন আদব-আখলাক আলাদা হলেও কাজটা দুইয়ের প্রায় একই। অর্থাৎ মানুষের মনের ময়লা পরিষ্কার করে তার পরম কল্যাণ সাধন করা। সূক্ষ্ম পার্থক্যটা হলো– পয়গম্বরেরা পরকাল ও পরমজন প্রত্যাশী আর অবতারেরা ইহলোকে আত্মপ্রচারে বিশ্বাসী। পয়গম্বর পাঠান আল্লাহ। অপরদিকে পরম প্রভু নিজেই নাকি অবতার হয়ে ইহলোকে আসেন। শাস্ত্রকারদের কথা।

তা আসুন। তবে পয়গম্বর আর আসবেন না। শেষ পয়গম্বরের মাধ্যমেই পয়গম্বর পাঠানো শেষ করেছেন আল্লাহ। রইলো এখন অবতার। পরম প্রভু বিশ্ববাজার গরম করে কতবার যে অবতার হয়ে এ বিশ্বে অবতরণ করলেন, তার ইয়ত্তা নেই। তবে ভাব দেখে ধরে নেয়া হয়েছিল– শরম পেয়েই পরম প্রভুও শেষমেশ চরম অবস্থান নিয়েছেন। মেকার হয়ে এসে বেকার মানুষকে দেখার মতো করে মেরামত করার খাহেশ তাঁর মিটেছে। কয়লার ময়লা যে ধুলেও যায় না, এটা শেখার মতো আক্কেল তার হয়েছে। অমানুষকে মানুষ বানানোর ঠেকা আর তাঁর নেই।

কিন্তু ওরে বাবা! একি উল্টা দৃশ্য। পরম পুরুষ তো পরম পুরুষ, তেত্রিশ কোটি দেবতারাই যে গুষ্ঠি সমেত অবতার হয়ে এ দুনিয়ায় অবতীর্ণ হবেন– এটা কি ভাবার কথা? কিন্তু বাস্তবে তাই হয়েছে। স্বর্গীয় মালগাড়ী ভর্তি হয়ে এসে তাঁরা এ দুনিয়ায় অবতরণ করেছেন। তা করবেন করুন আর অন্যের ঘাড়ে পড়ুন। কিন্তু না, সবার আগে পড়েছেন একদম আমাদের ঘাড়ে। এই অবতরণ করার পথে এ্যাক্সিডেন্টের কারণে মালগাড়ীর কয়েকটা বগি হঠাৎ করে উল্টে একদম আপ্সাইড্ ডাউন। ফলে, মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ার মতো কয়েক লক্ষ অবতার আগেই ঝর ঝর করে ঝরে পড়েছেন এই সোনার বাংলার বুকে। ব্যস্, কম্ম কাবার। অবতারগণ কোমর বেঁধে এখানেই স্বকর্মে মনোনিবেশ করেছেন। সোনার বাংলার মানুষকে সোনার মানুষ বানানোর দুর্মদ মানসিকতা নিয়ে তাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন। স্বর্গের সুখ মর্ত্যেই তাঁরা দিতে চান সোনার বাংলার মানুষদের। বাংলাটাকে বানাতে চান আনন্দভরা স্বর্গের নন্দন কানন। ছুটাতে চান এখানে ডু-ফুর্তির ফোয়ারা। বিভিন্ন নামে আর বিভিন্ন পরিচয়ে তাঁরা কর্মরত আছেন মানুষের রূপ ধরে। ছোট্ট বাংলাদেশ আর কয়েক লক্ষ অবতার। তাই, ঘুরতে ফিরতে প্রায়শই সাক্ষাৎ ঘটে এদের।

এমনই এক অবতার কৌশিক আহম্মদ কেদার। বড়ই বিজ্ঞজন। পেশায় স্কুলের পি-ত। লোকে বলে, উনি পি-ত নন, উনি স্কুলের প্রভাষক। মিন্-মিন্ করে ছাত্র

পড়ান না কৌশিক আহম্মদ কেদার। মহাপ্রভুর ভাষণ দেন ক্লাসে। তাক্ লাগান নাবালক ছাত্র-ছাত্রীদের। ভাষণ দেন সহকর্মীদের মাঝেও। অনগ্রসর, ধর্মান্ধ আর কূপমণ্ডুক মানুষেরাই অগ্রগতির বাধা– এই তথ্যই এই অবতার অহরহ প্রচার করে বেড়ান। বলা বাহুল্য, এটা ঐকতানে প্রচার করে বেড়ান এই কয়েক লক্ষ সকলেই। এঁরা জরাজীর্ণ সমাজটাকে একটা ফূর্তিভর্তি বাগানবাড়ি বানানোর বাণী শোনান সবাইকে। কৌশিক আহম্মদ কেদারও সেই বাণী মানুষকে শোনান আর সেই স্বর্গীয় বাণী বিনামূল্যে দ্বারে দ্বারে ফেরি করে বেড়ান।

ভাষণ তাঁর গুরুগম্ভীর। মোহন্তজির মতো ভাবগম্ভীর তাঁর চালচলন। স্বদেশী আন্দোলনের নেতার মতো এই কেদার মিয়া কাঁধে রাখেন সাইডব্যাগ, মাথায় রাখেন কাঁধ-ছোঁয়া বাবরি চুল, গায়ে দেন খদ্দরের লম্বা পাঞ্জাবী, পরিধান করেন ইয়াংকিদের পরিত্যক্ত তালি দেয়া জিংকের প্যান্ট। ভাবটা কবি কবি, মুখে চটুল কবিতা। লেখা পড়েন কালকুটের, বুলি কপ্চান কার্ল মার্কসের। অস্তিত্বে তাঁর ডারউইন, মস্তিষ্কে ফ্রয়েড্।

এহেন জনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার বাঙ্গালী কি কম আছে সোনার বাংলায়? অল্পদিনেই বেশ কিছু সাহাবা, তওবা, নন্দী ভিরিঙ্গী জুটে গেছে কেদার নাথের। থুড়ি, কেদার মিয়ার চারপাশে। নূর মুহম্মদ পার্থ কেদার মিয়ার এমনই একজন সদ্য দীক্ষিত সাগরেদ। পার্থ নামটা কৌশিক মিয়াই জুড়ে দিয়েছেন তার মূল নামের সাথে। এতে নাকি জৌলুশ বাড়ে নামের। অসাম্প্রদায়িকতার খোশবু ছড়ায় ভুর ভুর করে। তবে নূর মুহাম্মদ পার্থ কৌশিক আহম্মদ কেদারের সদ্য দীক্ষিত শিষ্য হেতু গুরুর আদর্শ এখনও সে পুরোপুরি রপ্ত করতে পারেনি। মাঝে মাঝেই নানা রকম প্রশ্ন করে বসে।

একদিন খবরের কাগজ হাতে কেদার মিয়া মুড্ নিয়ে বসেছিল। নূর মুহম্মদ পার্থ এসে বললো– কি গুরু, খুব খুশি খুশি ভাব যে?

বিজয়গর্বে কেদার মিয়া বললেন– ঠুকে দিয়েছি একখানা। কাঠমূর্খ এক নাদান, সাহিত্যের সংজ্ঞাটাই জানে না, সেই ব্যাটা কয়দিন আগে কাগজে এক আর্টিকেল লিখেছিল। দিয়ে দিয়েছি তার এই দাঁতভাঙ্গা জবাব।

হাতে ধরা কাগজটা নাচাতে লাগলেন কেদার মিয়া। পার্থ প্রশ্ন করলো– কি রকম, কি রকম?

কেদার মিয়া বললেন– আরে সে কথা আর কি বলবো? বই-পুস্তক পড়ে না, সাহিত্যের খবর রাখে না, বিদ্যাবুদ্ধি দ্যাড়চোঙ্গা– সেই মূর্খ লিখেছে, অবসর বিনোদনের জন্যে খেলাধূলার প্রতি মানুষের আজকাল অধিক আকৃষ্ট হওয়ার কারণটা কি, সেই কথা। লিখেছে– "ভাল গল্প উপন্যাস আর ভাল সিনেমা ছবি বাজারে এখন দুর্লভ বস্তু। বই পুস্তক সব যৌনতত্ত্বে ভরা আর সিনেমা-ছবি যাত্রা-নাটক সব অশ্লীলতায় ভরপুর। ছেলেমেয়েদের সাথে নিয়ে কোন সিনেমা-ছবি আজকাল আর দেখার উপায় নেই পিতামাতার। গল্প উপন্যাসে কেবলই যৌন আবেদনের

ছড়াছড়ি। কতকগুলো আবার এমন যে, ঘরে দুয়ার দিয়ে একা একা পড়া ছাড়া, প্রকাশ্যে পড়া যায় না। এসব কারণেই রুচিশীল মানুষেরা অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন খেলাধুলা। তাঁরা এখন বাধ্য হয়েই টিভিতে ক্রিকেট খেলা, ফুটবল খেলা এসব দেখেন। অশ্লীলতার কারণে গল্প উপন্যাস পড়া আর ছবি দেখা ছেড়েই দিয়েছেন প্রায়।" শুনো এবার মূর্খের কথাগুলো!

নড়েচড়ে ওঠে পার্থ বললো– আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ। এ লেখা তো আমিও পড়েছি কাগজে। কিন্তু লেখকটা তো কোন অজ্ঞ বা মূর্খ ব্যক্তি নন। বিলেত ফেরত আর বিজ্ঞজন তিনি। লেখালেখিতেও ইতোমধ্যে নাম করেছেন যথেষ্ট।

নাসিকা কুঞ্চিত করে কেদার মিয়া বললো– আরে ছোঃ! ও আবার একটা লেখক নাকি? জ্ঞানের কোন গভীরতাই নেই যার, তার লেখা গরু ছাগল ছাড়া কোন মানুষে পড়ে?

পার্থ বললো– কেন পড়বে না। অশ্লীলতার ব্যাপারে উনি যা লিখেছেন তা তো মিথ্যা নয়!

কেদার মিয়া রুষ্টকণ্ঠে বললেন– একশ'বার মিথ্যা, হাজার বার মিথ্যা।

মিথ্যা! মিথ্যা কি করে? সিনেমা ছবির কথাটা তো বলাই অবান্তর। আজকাল সাহিত্যেও যে অশ্লীলতা ঢুকেছে, যৌনতত্ত্বের যে উৎকট প্রচার শুরু হয়েছে, তাতে সাহিত্য যে আজ অশ্লীলতা মুক্ত– এ কথা বলবে কে?

: বলতেই হবে। অশ্লীলতা বলে সাহিত্যে কোন কথা নেই। শ্লীল-অশ্লীল– যে কথাই লেখা হোক, তা সবই সাহিত্য। সব কথাই মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত আর সাহিত্য মানুষের জীবনের কথাই বলে, বুঝেছো?

পার্থ বললো– কিন্তু মানুষের জীবনে এমন অনেক গোপন ব্যাপার স্যাপার আছে যা খোলামেলা বলা যায় না। আর বললে শিষ্টাচার থাকে না। ঐ লেখকের সাথে এ নিয়ে কথা বলেছি আমি। উনি বলেন, চোখ আছে বলেই সবকিছু দেখা যায় না আর নাক আছে বলেই সব কিছুর ঘ্রাণ নেয়া যায় না। রুচিশীল মানুষেরা তা পারে না। চোখ নাক আছে বলেই ঢাক্না খুলে ডাস্টবিন দেখা আর তার ঘ্রাণ নেয়া– রুচি ও স্বাস্থ্য এ দু'য়েরই বিরোধী। অশ্লীল সাহিত্য তাই সমাজের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।

এসব সংকীর্ণ মনের কথা আর কূপম্-ক মানুষের উক্তি। এইসব দুষ্ট লোকেরাই মানুষের মনের প্রসার ঘটতে দিচ্ছে না।

পার্থ প্রতিবাদ করে বললো– না না, উনি মোটেই দুষ্ট লোক নন। খুবই সৎ সরল আর পরহেজগার মানুষ! পরকালের ভয় তার ভীষণ।

প্রচ- বিরক্তির সাথে কৌশিক আহম্মদ বললেন– ওহ্ হো! তোমাকে এখনও মানুষ করা গেল না। এতদিন ধরে তাহলে বলছি কি আর শিখলে কি? পরকাল বলে কোন কিছুই নেই।

নেই?

না। ঐ আল্লাহ-ঈশ্বর গড্-ফড্ সবই ভোগা। চরম ধাপ্পা। ওসব কোন কিছুই নেই। সবই মানুষের মনগড়া কথা।

: সে কি! ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্য– এ সবও কিছু নেই?

নেই নেই, কিছুই নেই। ধর্মটা হলো মানুষকে ধোকা দেয়ার কেবলই একটা কৌশল। সবই গুল্ বুঝলে, প্রচ- প্রতারণা।

: তাহলে আমরা এই পৃথিবীতে এলাম কি করে?

অটোম্যাটিক্যালি। ডারউইনের 'আরজিন অফ স্পেসিস্' থিওরি পড়োনি? বানর থেকেই দিনে দিনে আমরা মানুষ হয়ে গেছি।

: তাহলে ঐ আদম হাওয়ার ব্যাপারটা?

কেবলই একটা গাল-গপ্পো। আস্ত একটা ব্লাফ্। মানুষকে ভুলিয়ে রেখে ধর্ম ব্যবসায়ীদের লুটেপুটে খাওয়ার সেরেফই একটা ফন্দি।

: তাই?

তবুও সন্দেহ? নাঃ! এখনও তুমি অনগ্রসরই রয়ে গেলে। অগ্রসর মানুষ এখনও হতে পারলে না। প্রগতির সুবাতাস এখনও তোমাকে বিধৌত করতে পারেনি।

: প্রগতির সুবাতাস?

: হ্যাঁ। এই পৃথিবীকে সুন্দর আর আনন্দঘন করতে পারে একমাত্র প্রগতির প্রবাহ। কিন্তু অনগ্রসরতা, কূপমু-কতা আর ধর্মান্ধতা হলো প্রগতির পথের একমাত্র বাধা। এই বাধাগুলো উৎখাত করতে পারলে তবেই এই পৃথিবীটা মানুষের নিরাপদ আবাসে আর নিরবচ্ছিন্ন শান্তির আলয়ে পরিণত হবে।

: তা হবে কি করে? পরকাল আর পাপ-পুণ্যের ভয় মানুষের মনে না থাকলে, মানুষ ন্যায় পথে আর সৎপথে চলবে কেন? মানুষ তো বাই নেচার একটা পশু। এ্যান্ এ্যানিম্যাল। বন্য পশুর তামাম বর্বরতা তার মধ্যে বিদ্যমান। একমাত্র পরকালের কথা, অর্থাৎ পাপের শাস্তির ভয়ই মানুষকে সৎ থাকতে বাধ্য করে। সেই ভয়ই যদি না থাকে, তাহলে তো মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়বে হানাহানিতে। পশুর আচরণ করবে।

কেদার মিয়া বললেন– করবে না, করবে না। প্রগতিই সব দাওয়াইয়ের বড় দাওয়াই, বুঝলে? প্রগতিশীল মানুষ মানেই অগ্রসর মানুষ। আর অগ্রসর মানুষ মানেই সভ্য ও মুক্তচিন্তার মানুষ। সভ্য মানুষের মুক্তচিন্তা আর রুচিই তাকে তামাম অন্যায় থেকে বিরত রাখবে।

এ কথা আমি মেনে নিতে পারলাম না গুরু। মানুষ নামের ঐ পশুর ঠুনকো রুচি আর মুক্তচিন্তা নামের বল্গাহীন খেয়াল খুশি কখনো মানুষকে সৎ রাখতে পারে না। বড় রকমের স্বার্থ আর লোভ লালসা সামনে পড়লে ঐসব কাল্পনিক বন্ধন এক পলকে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। জবাবদিহিতা না থাকলে, কোন রেস্ট্রিক্শানই রেস্ট্রিক্শান নয়। পশুকে বশে রাখতে প্রয়োজন শক্ত মুগুর আর পরকালের ভয়ই

বইঘর ও বিএবিডি
সেই মুগুর। পুণ্যের পুরস্কার আর পাপের কঠোর শাস্তির প্রশ্নই, অর্থাৎ স্রষ্টার প্রতি ভয় আর ভক্তিই পারে পশু মানুষকে পশুত্ব থেকে মুক্ত রাখতে। অন্য কিছুই পারে না।

অবশ্যই পারে। এ লাইনে তুমি একেবারেই নতুন। জ্ঞানবুদ্ধি পোক্ত হয়নি এখনও। পোক্ত হলেই বুঝতে পারবে সব কিছু। ওহো, অসময় হয়ে যাচ্ছে। আমি উঠি। এখনই আমাকে মহিলা ক্লাবে যেতে হবে।

: মহিলা ক্লাবে? সেখানে কি হয়?

নাচ হয়, গান হয়, নাটকের রিহেয়ার্সেল হয়, কাব্য-কবিতার প্রতিযোগিতা হয়। এক কথায়, যাবতীয় বাধা-বন্ধন আর কুসংস্কার থেকে মেয়েদের মুক্ত করা হয়। পর্দা আব্রু সরিয়ে মেয়েদের পুরুষের কাতারে দাঁড় করানো হয় আর পুরুষের সমঅধিকার দান করা হয়।

সে কি! পর্দা আব্রু সরিয়ে একদম ফ্রি মিক্সিং?

অফকোর্স! মৌলবাদী আর ধর্ম-ব্যবসায়ীদের ভ-ামী উৎখাত করতে না পারলে, নারী-স্বাধীনতা আসবে কি করে? প্রগতির পরশ তারা পাবে কি করে?

তাহলে লীভ্-টু-গেদারও বুঝি এই প্রগতির একটা অংশ?

অবশ্যই। নারী-পুরুষ সকলেই স্বাধীন হয়ে জন্মেছে। নিজের ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে চলবে তারা– এই তো অগ্রসর আর সভ্য মানুষের কথা। প্রগতির পরিচয়। পশ্চিমা দেশগুলোর দিকে তাকাও, তাহলেই বুঝতে পারবে।

একটু থেমে নূর মহম্মদ পার্থ ইতস্তত করে বললো– দেখুন গুরু, প্রগতির পরিচয় আর শিক্ষা যা-ই হোক, আপনি একজন শিক্ষক। ছাত্র-ছাত্রীদের আদর্শ। অনৈতিক আর অসামাজিক কর্মকা-ের সাথে আপনি জড়িত থাকলে, সে আদর্শ কিন্তু মিস্মার হয়ে যাবে।

পাগল! তাই কি আমি মিসমার হতে দেই? আমি কি প্রগতিশীল নই? মৌলবাদীদের মতো আমি কি নোংরা নির্বোধ? রুচি নেই আমার? আমি অগ্রসর মানুষ।

* * *

একজন ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে এসব আমার জানার কথা নয়। প্রগতির প্রাণপুরুষ কৌশিক আহম্মদ কেদারের রুচি, চরিত্র আর আদর্শের বড়াই লোক মারফত একদিন আমার কানে এসে পড়লো। শুনে বরং খুশিই হয়েছি। মানুষ আদর্শবাদী হোক, আদর্শ চরিত্রের হোক– এই তো চাই।

বাড়িতে ছিলাম এক সপ্তাহের ছুটিতে। নানা রকম সরকারি কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন আরো চার পাঁচ দিন কোর্টে বসতে পারলাম না। শেষে কোর্টে এসে চেম্বারে ঢুকতেই বেশ কয়েকটি নতুন কেসের কাগজপত্র এনে টেবিলে দিলেন পেস্কার সাহেব।

জানতে চাইলেন, আজ আমার এজলাসে বসার সময় হবে কি না। সময় হবে– এ কথা জানিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম– এতগুলো নতুন কেস্, সবগুলো কি আজই এলো?

পেস্কার সাহেব বললেন– না স্যার। এই দুইটি একশ' সাত ধারার কেস এসেছে আজ। এই তিনটি মেয়েছেলের কেস্ দাখিল হয়েছে বিগত পৃথক পৃথক তিন দিনে। 'কেসগুলো জটিল' বলে যিনি আপনার চার্জে ছিলেন, তিনি আপনার জন্যেই কেস তিনটি রেখে দিয়েছেন। কোন অর্ডার তিনি অর্ডার শিটে লিখেননি।

জটিল কেস্ শুনে মেয়েদের আর্জিগুলো পর পর একটানা পড়ে ফেললাম। অবাক হয়ে দেখলাম, দুইটি মেয়ের অভিযোগ একেবারেই এক ও অভিন্ন। বিয়ের লোভ দেখিয়ে তাদের সম্ভোগ করা হয়েছে এবং মেয়ে দুটি এখন গর্ভবতী। কিন্তু তাদের বিয়ে করতে এখন অস্বীকার করেছে আসামী। তৃতীয় মেয়ের অভিযোগও প্রায় কাছাকাছি। দীর্ঘদিন লীভ-টু-গেদার করার পর কেটে পড়েছে আসামী, আর ধরা দিচ্ছে না। আরো তাজ্জব হয়ে লক্ষ করলাম– তিন কেসেরই আসামী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। আর সে ব্যক্তিটি হলেন প্রগতির প্রবক্তা ঐ কৌশিক আহম্মদ কেদার। বিপুল বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম– একি পেস্কার সাহেব! প্রগতির ঢোল বাজানো কেদারের এই চরিত্র শেষ পর্যন্ত? এত সভ্যতার কথা বলতেন আর নীতি আদর্শ কপ্চাতেন– সেই কৌশিক আহম্মদ তিনটি কেসেরই আসামী?

পেস্কার সাহেব ঈষৎ হেসে বললেন– আর একটা কেসেরও আসামী স্যার! পুলিশেরা সে কেস্ নিয়ে আসছেন আজই।

: কি রকম?

: শিক্ষকতা পেশার মুখে নুড়ো জ্বালিয়ে দিয়ে কৌশিক আহম্মদ কেদার মিয়া আজ মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়েছিলেন শুড়িখানার সামনে। অর্ধোলঙ্গ অবস্থা। টের পেয়ে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে এনেছে। কোর্ট সাব-ইন্সপেক্টার সাহেব আজ এজলাসে দাখিল করবেন সে কেস্। হাজির করবেন আসামীকেও।

হুঁশ-বুদ্ধি হারিয়ে ফেললাম আমি। কিছুটা অজ্ঞাতেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো– 'জয় বাবা প্রগতির পোলা, সাব্বাশ্ বাবা কলির কেষ্টো; ঠাকুর, তুম যুগ যুগ জিও!'

হুঁশেই আছে হুসেন আলী

: কি গো আব্বাস মিয়া! তোমাদের মাঠে এবার ইরি ধানের ফলন কেমন?

আব্বাস মিয়া মানে, বিলবাতা গাঁয়ের আব্বাস আলী শাকিদার। প্রশ্নকর্তা পাশের গাঁয়ের কাজেম উদ্দিন। ইরির আবাদ করে আব্বাস আলী ইদানিং দুটো পয়সার মুখ দেখছে। এতে করে যতটা তার খুশি আনন্দ বেড়েছে তার চেয়ে বেশি বেড়েছে অহংকার। আব্বাস আলী এখন ভারিক্কী চালে চলে। কথা বলে মোটা মোটা।

এ খবর কাজেম উদ্দিন রাখে। অধিক ফলন ফলানো নিয়ে আব্বাস আলীর আর একটা বাড়তি দেমাকও আছে। মুরোদের দেমাক। তাকে সামনে পেয়ে এ কারণেই কাজেম উদ্দিন এই প্রশ্ন করলো। উদ্দেশ্য, আব্বাস আলীর ভাব দেখা।

কাজেম উদ্দিনের প্রশ্নে আব্বাস আলীর মুখমণ্ডলে দপ করে গর্বের আলো জ্বলে উঠলো। বুক ফুলিয়ে জবাব দিলো– তিরিশ মণ– তিরিশ মণ। বিঘে প্রতি এক কুড়ি দশ মণ।

কাজেম উদ্দিন– সে কি! তবে যে তোমাদের গাঁয়ের হুসেন আলীরা বললো, দশ থেকে পনের মণ? শেষের দিকে পানির টান পড়ায় নাকি ধান সব চিটে হয়ে গেছে। পনের মণের অধিক প্রায় লোকেরই ফলেনি?

নাক মুখ কুঞ্চিত করে আব্বাস আলী বললো– হুঁ! হুসেন আলীরা ঐ রকমই বলে। নাচার ঢং না থাকলে উঠোনের দোষ তো দেবেই।

: কি রকম?

: রকম আবার কি? মরদগুণে ইরির আবাদ। আবাদ করার হুনোর হিকমত জানতে হয়, জো-বাও চিনতে হয়। সময় মতো সার-নিড়ানী দিতে হয়। হুসেন আলীরা কি এসব কিছু বোঝে?

: বোঝে না?

মোটেই না। গরুর বেটা গরু, খায় দায় আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘুমায়। চারা গেড়ে এলেই কি ইরি ধান ঢেলে পড়বে জমিতে? ইরি ফলাতে মুরোদ লাগে।

: মুরোদ!

হিকমত- হিকমত। হিকমত জানা না থাকলে ঐ দশ পনের মণ হবে নাতো কি ত্রিশ-বত্রিশ মণ হবে?

: আচ্ছা!

: তিরিশ মণের উপরে ছাড়া আমার জমিতে কোনোদিন এক ছটাক কম হয়নি।

ইরির আবাদ পয়লা যখন বিলবাতা গাঁয়ে এলো, তখন গ্রামবাসীরা তাজ্জব। বুনো

আমনের চেয়ে ইরির ফলন তিন চার গুণে বেশি। এছাড়া ইদানিং প্রবল বন্যায় বুনো আমনের আবাদ প্রায় বছরই তলিয়ে যায়। ইরির আবাদ তলায় না। পৌষ মাসে চারা রুয়ে বর্ষা নামার আগেই বোশেখ মাসে ইরি ধান গোলায় উঠে। বড় তাজ্জব ব্যাপার!

এই আবাদ গাঁয়ে আসার প্রথম দিকের কথা। এখন যেমন ছোট ছোট পাম্প মেশিন কিনে পৃথকভাবে আবাদ করছে সামর্থবান লোকেরা, প্রথম দিকে এ অবস্থা ছিল না। বড় মেশিন দিয়ে তখন সবাই মিলে আবাদ করতো এক সাথে। যৌথভাবে স্কীম করে। গাঁয়ের পাশেই নদী। লো-লিফ্‌ট পাম্প মেশিন পেতে পানি তুলতো নদী থেকে। ষাট সত্তর বিঘের ইরি স্কীমে গাঁয়ের কম বেশি সবার জমিই পড়তো। নদীর পানি ড্রেনের মাধ্যমে সবার জমিতে পৌঁছে দেয়া হতো। পাম্প মেশিন চালানোর জন্যে একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার আর পানি বণ্টনের জন্যে একজন নিরপেক্ষ ড্রেনম্যান নিয়োগ করতো গ্রামবাসীরা। একের পর এক সিরিয়ালভাবে সবার জমিতে সমানভাবে পানি দেবে ড্রেনম্যান– এই নির্দেশই দেয়া থাকতো ড্রেনম্যানকে।

কেচালটা শুরু হলো এখান থেকেই। নিরপেক্ষ ব্যাপারটা এমনিতেই এক দুর্লভ বস্তু। এই সোনার বাংলায় এটি এখন প্রায় সর্বত্রই একটা কথার কথা মাত্র। বলতে অনেক জুত। ন্যায়নিষ্ঠার বাহাদুরী বলার মধ্যে থাকে, তাই বলা হয়। নইলে যে, টোপ-লোভ আর চাপের মুখে অনেক আগেই এই নিরপেক্ষ কথাটা দুমড়ে মুচড়ে পক্ষপাতে পরিণত হয়েছে, তা অনেকেই জানে।

ইরির আবাদ আসলেই এক হেকমতি আবাদ। ধানের গোছের গোড়ায় সদা সর্বদা পানি জমে থাকলে আর গোছের মাথায় নিদাঘের খরতাপ পড়লে ইরি ধান ডবল ফলে। আব্বাস আলীর হুনোর হিকমতের বড় হিকমত পানি বণ্টনের এই পক্ষপাত।

আব্বাস আলীর গুষ্ঠিটাই গাঁয়ের মধ্যে বড় গুষ্ঠি। জনগণ অনেক। এদের আবার অনেকেই কলহপ্রিয় ও দাঙ্গাবাজ লোক। ড্রেনম্যানের নিরপেক্ষতা আর টিকে থাকে কতক্ষণ? শক্তের ভক্ত সকলেই। বেচারা ড্রেনম্যান আর করে কি? ফলে, অন্যের জমিতে একবার পানি দিতে আব্বাস আলীর জমিতে তিনবার করে দেয়। তবুও আব্বাস আলী সারা গাঁ খ্যাঁক খ্যাঁক করে ঘুরে বেড়ায়। বলে বেড়ায়, আমি পানি পেলাম না। আমার ধান পুড়েই গেল।

আব্বাস আলীর দ্বিতীয় হিকমত আব্বাস আলীর জমিটাই। বড় কায়দামতো এক দাগে ছ'সাত বিঘে নীচু জমি। এককালে ছোট একটা বিল ছিল এটা। পলি পড়ে পড়ে বিলটা ভরাট হয়ে গেছে। বিলের তলায় সুন্দর আর সমতল জমি পয়দা হয়েছে। পলি পড়া ছ'সাত বিঘে আবাদী জমি। অল্প সারেই ধানের চারা পেখম ধরে উঠে। আব্বাস আলীর দাদার আমলেই বিলের এই তলাটা তাদের নিজস্ব জমি হয়ে গেছে। জমিদারের নায়েবের সাথে ভাব থাকলে কি না হতো সেকালে?

গাঁয়ের অন্যান্য সকলের জমি এই বিলের বাতা বা পাড়ের উপর। ফলে, সবার জমিই আব্বাস আলীর জমির অনেক উঁচুতে। এতে করে, আব্বাস আলীর জমিতে

পৃথকভাবে পানির সেচ না দিলেও এইসব চারপাশের উঁচু জমির ফাঁক ফোকর দিয়ে চুঁইয়ে আসা পানি আব্বাস আলীর জমিতে এসে সব সময়ই জমে থাকে।

আব্বাস আলীর আবাদ করার তৃতীয় হিকমত পানি চুরি। সরু একটা লাঠি হাতে আব্বাস আলী সব সময়ই মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। তার জমির চারপাশের জমিওয়ালারা জমিতে পানি নিয়ে সরে গেলেই কাদায় বাঁধা নরম বাঁধ বা আইলের তল দিয়ে সে লাঠি ঢুকিয়ে দেয়। লাঠি ঢুকিয়ে দিয়ে একাধিক ফুটো তৈরি করে। ঐ ফুটো দিয়ে রাতারাতি সব পানি আব্বাস আলীর জমিতে নেমে আসে। ফুটো করার মওকাটা দিনে যদি নাও পায়, রাতে আর তার হাত ছান্দে কে?

পরের দিন সকালে জমিওয়ালারা জমিতে এসে মাথায় হাত দেয়। সন্ধ্যা বেলা যে জমি পানি দিয়ে ডুবিয়ে দিয়ে গেল, সকালে সে জমিতে এক ফোঁটাও পানি নেই। দেখতে পায় ফুটোগুলো। বুঝতে পারে, এ কুকীর্তি আব্বাস আলীর। চার্জ করলে, আব্বাস আলী ঝাড়া না জবাব দিয়ে বসে। ক্ষেপে ঘুগরীপোকা বা কাঁকড়ায় কাটা খ'ন (ফুটো) দিয়ে যদি পানি বেরিয়ে যায়, সে দোষ কি আমার? আমি কি সারারাত অন্যের জমির ফোকর মুজিয়ে বেড়াবো?

আব্বাস আলীর তৈরি করা ফাঁক-ফোকরের প্রশ্নটা তো আছেই, এর উপর ড্রেনম্যানের পক্ষপাতের করুণতম শিকার হলো ঐ গাঁয়েরই হুসেন আলী। খেটে খাওয়া অসহায় মানুষ। ধনবল জনবল কিছুই তার নেই। সকলের দয়ার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু নিখাদ দয়াটাও এ দুনিয়ায় দুর্লভ।

হুসেন আলীর একখান মাত্র জমি। দেড় বিঘের এক দাগ। সে জমিটাও আবার আব্বাস আলীর জমির সাথে সংলগ্ন। আব্বাস আলীর জমির খাড়া এক দেড় হাত উপরে। ডেনম্যানের পক্ষপাতিত্ব প্রতিবছরই হুসেন আলীর আবাদের দুরবস্থা করে ছাড়ে। অন্যের জমিতে একবার দিতে আব্বাস আলীর জমিতে দেয় তিনবার– এ প্রসঙ্গের বাইরেও, অন্যেরা তিনবার পেতে হুসেন আলী পায় মাত্র একবার। অসহায় লোক বোধে তার অভিযোগে-অনুরোধে কান দেয় না ড্রেনম্যান। পানি নিয়ে ইয়া নফ্সী অবস্থা হলে, কান দেয় না অন্য কেউই।

হুসেন আলীর নুন আনতে পান্তা ফুরায়। বালবাচ্চা বিবি নিয়ে পাঁচজন লোক তারা। তার একার মজুর খাটার উপর সকলের মুখের গ্রাস নির্ভর করে। দিন আনে দিন খায়। কাজ যেদিন জোটে না, সেদিন অনাহার। একখানা মাত্র খড়ের ঘর। আহার জোটাতে সে ঘরটাও ছাওয়া হয় না ঠিক মতো।

এই ইরির আবাদ আসায় নিঃশ্বাস কিছুটা তার সরেছে। পুড়ে ধুড়ে যাওয়ার পরও পনের ষোল মণ ধান যা সে পায়, তা দিয়ে মাস তিনেকের খোরাকটা হয়ে যায়। একমাত্র মজুর খেটে খাওয়ার পথে এ অনেকটা সহায় হয়।

ঠিকমতো আবাদ হলে আর না হোক, দেড় বিঘে জমিতে মণ তিরিশেক ধান সে পেতে পারে। তা পেলে অভাবটা তার আরো বেশি কাটে। তাই, হুসেন আলী এ বছর আবাদের দিকে অধিক নজর দিয়েছে। কর্জ করে টাকা নিয়ে জমিতে ঠিকমতো

কাদা করেছে, ভাল বিছন গেড়েছে, সার দিয়েছে যথাযথ, নিড়ানীও দিয়েছে সে বার তিনেক। ফলে, পানি বণ্টনের অনিয়ম সত্ত্বেও এবার তার আবাদের বেহারা হয়েছে আগের চেয়ে অনেক বেশি তাগড়া।

আসলেই বছরটা এবার আবাদী বছর মনে হচ্ছে। সকলের আবাদই তাগড়া। আব্বাস আলীর তো কথাই নেই। এবার তার বিঘে প্রতি পঁয়ত্রিশ মণ ফলবে, আব্বাস আলী হিসেব কষছে। মনে মনে স্থির করছে, ধান উঠলেই এবার সে ইট দেবে ঘরে। ঝাঁঝড়া ফুটো টিনগুলোও বদলিয়ে ফেলবে সেই সাথে। ফটকা মেরে তার দাদা যে ঘর বানিয়ে গেছে, তা ঐভাবেই আছে। আমনের আবাদ করার সময় পেটের ভাতই আব্বাস আলীর জোটেনি। নীচু জমি সাবার আগেই তলিয়ে গেছে বন্যায়। এখন সে খোরাকী রাখার পরও অনেক ধান বেচতে পারে। বেশ কিছু পয়সা আসে হাতে। ফলন এবার নির্ঘাত আরো বেশি হবে। আর তাকে পায় কে?

আবাদের চেহারা দেখে এমন ভাবনা অনেকেই ভাবছে। ভাবছে হুসেন আলীও। আবাদ উঠলেই এবার সে ঘরটা ভাল করে ছেয়ে নেবে। চালে অনেক ফুটো দেখা দিয়েছে। ভাবছে, কর্জ দেনা শোধ করার পরও বউ বাচ্চাকে কাপড় কিনে দিতে পারবে। কাপড় ওদের তেনা তেনা হয়ে গেছে। খোরাকও আগের চেয়ে আরো দু'এক মাস বেশি যাবে। মজুর খাটার রোজগারটা তো এর সাথে থাকছেই। হুসেন আলীর দিলের কোণে খুশির আভাস ঝিলিক দেয়।

কিন্তু 'হাসির পরে আছে কান্না, বলে গেছে রামশন্না', খুবই প্রচলিত প্রবাদ। এই প্রবাদই ফললো। প্রথম দিকে আবাদের লক্ষণ খুব ভাল মনে হলেও, শেষের দিকে মহা বিপর্যয় দেখা দিলো। এ বছরের খরাটা নজিরবিহীন খরা। বিগত আশ্বিস মাসের পর থেকে এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। বৈশাখ মাস না পড়তেই নদীর পানি শুকিয়ে এলো। জমি তেতে আগুন হয়ে উঠতে লাগলো। এ বেলা পানি দিলে ও বেলায় আবার জমি শুকিয়ে সাদা হয়ে যায়। এর সাথে পানি শুকিয়ে নদীর এত তলায় নেমে এলো যে, অল্প দিনের মধ্যেই হয়তো পানি আর তোলাই সম্ভব হবে না।

সবার ধানেই পুরোপুরি থোড় এসে গেছে। শীষ বেরুবে দু'চার দিনের মধ্যেই। গোড়ায় সব সময় পানি থাকায় আব্বাস আলীর ধানের শীষ ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে অনেকগুলো। এই সময় কলের ড্রাইভার এলান দিলো, এই সেঁচাই শেষ সেঁচা। তেল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। পাইপও আর পানির নাগাল পাচ্ছে না। শহর থেকে তেল আর অতিরিক্ত দু'তিনটে পাইপ নিয়ে না এলে আর পানি তোলা যাবে না।

এ খবরে আর যে যতই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠুক, আব্বাস আলী চিৎকার করে মাথায় তুললো গোটা গাঁ। এক দেড় ইঞ্চি পানি তখনও তার ধানের গোড়াতে আছে। তবু 'পুড়ে গেল– পুড়ে গেল, আমার ধান পুড়ে ছারখার হয়ে গেল' বলে হামলা হাঁকের জোরে সে তার জমিটাই আগে ডুবিয়ে নিলো। অন্যদেরও আসলেই তখন ইয়া

নফসী অবস্থা। তোড়জোরের মাধ্যমে নিজ নিজ জমি ভিজিয়ে নিলো তারাও।
বাদ পড়লো হুসেন আলীর জমি। 'দিবো দিচ্ছি' করে করে গত দুই দুইটি সেঁচাতেও হুসেন আলীকে পানি দেয়নি ড্রেনম্যান। এবারও তার জমি বাদ পড়েই রইলো। তার আবাদের তখন একদম অন্তিম অবস্থা। তার ধানেও পুরোপুরি থোড় এসে গেছে। প্রায় এক মাস যাবত পানি না পাওয়ায়, এই তীব্র খরাতে থোড় সমেত তার ধানের গাছ নেতিয়ে পড়েছে মাটিতে। কুঁকড়ে গেছে পাতা, দুমড়ে গেছে ডাঁটা। ধুলো উড়ছে জমিতে। আজ কিংবা নেহায়েত কাল পরশুর মধ্যেও তার জমিতে পানি না গেলে, তার ধান গাছ সাকুল্যে খড় বনে যাবে। পরে পানি দিয়ে ডুবিয়ে দিলেও, ঐ খড়ে আর জীবন ফিরে আসবে না।
মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। এই অবস্থার মুখে পরের দিন সকাল বেলা ড্রাইভার আবার ঘোষণা দিলো– আজকের সেঁচাই শেষ সেঁচা। তেল সব শেষ। কোনমতে বিকেল তক্ চলবে। নদীর পানিও কাদা ঠেলে আর পাইপের মুখে আনা যাচ্ছে না।
শুনেই ফের লাফিয়ে উঠলো আব্বাস আলী। বেটা-পুত ভাই-ভাস্তে সহকারে লাঠি হাতে ছুটে এলো জমিতে। ড্রেনম্যানকে বললো– জান যদি বাঁচাতে চাও, এ বেলা আমার জমিতেই পানি দাও। ও বেলা যাকে খুশি দিও।
লাঠির মুখে ভূত পালায়। ড্রেনম্যান তো সেরেফ একটা মানুষ। একমাত্র হুসেন আলী ছাড়া সবার জমিতেই পানি দেয়া হয়ে গেছে। দুপুরের দিকে হুসেন আলীকে দিলেও চলবে বোধে ড্রেনম্যান আবার আব্বাস আলীর জমিতেই পানি দেয়া শুরু করলো।
সূর্যটা মাথার উপর উঠে এলো। আব্বাস আলীর পানি নেয়া আর শেষ হয় না। দেখে শুনে হুসেন আলীও মরিয়া হয়ে উঠলো। সে তারস্বরে চিৎকার শুরু করলো। তার চিৎকার শুনে ছুটে এলো সারা মাঠের লোকজন। তারা হুসেন আলীর পক্ষ নিলো। বাধ্য হয়েই ক্ষান্ত হলো আব্বাস আলী। ড্রেনম্যান এবার আব্বাস আলীর জমির মুখ বন্ধ করে দিয়ে হুসেন আলীর জমিতে পানি দেয়া শুরু করলো।
সেদিন শুক্রবার। হুসেন আলীর জমিতে পানি ঢোকা শুরু হতেই মসজিদে জুমার আযান শুরু হলো। আযান শুনে মাঠের লোকজন মাঠ থেকে উঠে আসতে লাগলো। হুসেন আলীও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। গরীর হলেও হুসেন আলী পরহেযগার লোক। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে। আযানের ধ্বনি কানে আসতেই হুসেন আলীর স্মরণ হলো গত জুমায় ইমাম সাহেবের নসিহতের কথা। গ্রামের মসজিদের গ্রাম্য ইমাম সাহেব তাঁর সাদামাটা জ্ঞান অনুসারে ওয়াজ-নসিহত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জুমার নামায পড়ার জন্যে যে সবার আগে মসজিদে আসে সে উটের পরিমাণ সওয়াব পায়। তার পরে যে আসে সে পায় গরুর সমান। তার পরে ছাগলের সমান, তার পরে মুরগীর সমান এবং সবার শেষে যে আসে, সে পায় ডিমের সমান সওয়াব।
পর পর দুই জুমাতে অনেকখানি দেরিতে মসজিদে গেছে হুসেন আলী। আজও দেরি হলে সওয়াব খুবই কমে যাবে ভেবে সে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। আর

তার চিন্তা কি? সকলেরই পানি নেয়া হয়ে গেছে। কেবল তার জমিতেই পানি যাচ্ছে এখন। আপছে আপ জমি তার ভরে যাবে।

তখনই সে ছুটে এলো বাড়িতে। তড়িঘড়ি তৈরি হয়ে মসজিদের দিকে চললো। মনে তার অনেকখানি শান্তি এখন। নামায পড়ে গিয়ে খাওয়া দাওয়া সারতেই জমি তার ভিজে যাবে। জমি একবার ভিজে গেলে আর ভয় নেই। ফুলে বেরুবে ধান। কল আবার চালু হতে দেরী কিছুটা হলেও তার ধান আর মরবে না।

হুসেন আলী ধীর সুস্থে নামায আদায় করলো। নামায অন্তে মিলাদে শামিল হলো। আখেরী মোনাজাতে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করে সে বেরিয়ে এলো মসজিদ থেকে। বাড়ি গিয়ে খেয়ে দেয়ে জমিতে যাবে স্থির করলো।

কিন্তু বাড়ির দিকে আসতেই তার খেয়াল হলো, আব্বাস আলীকে মসজিদে সে দেখেনি। সর্বনাশ! এর মধ্যে আবার কি করে বসলো, কে জানে।

পথ থেকেই সে জমির দিকে ছুটলো। জমিতে এসে পৌঁছেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো হুসেন আলী। যা ভেবেছে তাই। জমি তার আধা কাঠাও ভিজেনি। তার জমির মুখ বাঁধা আর আব্বাস আলীর জমির মুখ খোলা। সেই থেকেই সব পানি আব্বাস আলীর জমিতে গিয়েই পড়ছে।

এ কাজটি আব্বাস আলী নিজেই করেছে। আজকের সেঁচাই শেষ সেঁচা। আবার সেঁচ শুরু হতে অধিক যদি দেরি হয় আর তাতে যদি তার জমির পানি এক ইঞ্চিতে নেমে আসে, তাহলে তার ধানের ফলন কমে যাবে ভেবে আব্বাস আলী নিজেই এ কাজ করে গেছে।

আবার হুসেন আলীর চিৎকারে ছুটে এলো লোকজন। ঘটনা দেখে তাজ্জব হলো তারা। সবাই ফের চার্জ করলো আব্বাস আলীকে। মারাই তাকে উচিত ছিল। কিন্তু আব্বাস আলীর জনবলের ভয়ে তার গায়ে হাত তোলার সাহস কারো হলো না। সবাই তাই চার্জ করলো আবার। কিন্তু আব্বাস আলীর ঐ এক জবাব। সে এর কিছুই জানে না। হয়তো কোন রাখাল পাকালের কাজ। নীচের জমিতে পানি খুব দ্রুত বেগে যায়। তাই হয়তো পানির দৌড় দেখার জন্যে কোন অদ্না ছেলেপুলে এ কাজ করেছে।

হুসেন আলীর জমিতে আবার পানির সংযোগ দেয়া হলো। কিন্তু নসীবের পরিহাস! নিমেষ কয়েক না যেতেই ভট্ ভট্ ভট্টাশ্ করে বিকট এক শব্দ হলো কলের কাছে। এরপরেই পানির বেগ কমে গেল এবং অতঃপর ড্রেন দিয়ে পানি আসা বিলকুল বন্ধ হয়ে গেল।

ঘটনা কি জানার জন্যে কলের কাছে ছুটে এলো হুসেন আলী। এসে দেখে সব শেষ। এই খরতাপের মধ্যে সারাদিন কল চলায় কল একদম জ্বলে গেছে। পার্টস্ সবই নষ্ট হয়ে গেছে। বিদেশী পার্টস্। বড় শহরে না গেলে এসব পার্টস্ পাওয়া যাবে না। আর শহর থেকে অভিজ্ঞ ম্যাকানিক্স ডেকে না আনলে এ মেশিন মেরামত করা ড্রাইভারের পক্ষে সম্ভব নয়। এর উপর তেল চাই, দুই তিনটি

বইঘর ও বিএবিডি
অতিরিক্ত পাইপ চাই, ফান্ডে টাকা নেই, টাকার সংস্থান করা চাই। অর্থাৎ কমছে কম দেড় হপ্তার ব্যাপার।

হুসেন আলী ডুকরে উঠে সবাইকে বললো, ভাইজানেরা! একটা কিছু করুন।

কি আর করবেন তারা? এতসব করা কি দুই এক দিনের কাজ? তদুপরি সবার জমি ভেজা। অধিক গরজ কারোই নেই। একে একে কেটে পড়লো সকলেই।

হুসেন আলী বাড়ি ফিরে শাট হয়ে পড়ে গেল। দুই একদিন কোন্ কথা! নিদেনপক্ষে আগামী কালের মধ্যেও যদি পানি ভুঁইয়ে না যায়, তো তার আবাদ খড়ি। কেটে এনে জ্বালানো ছাড়া ও দিয়ে কিছু হবে না।

হুসেন আলী বুক চাপড়াতে লাগলো। খাওয়া দাওয়া আর হলো না। মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। কেবলই চিন্তা– সারা বছর সে খাবে কি? দেনা শুধবে কি দিয়ে? ঘর ছাইবে কি করে? কাপড়-চোপড় কেনা থেকে সারা বছরের খরচপাতি চালাবে সে কোন্ উপায়ে?

পড়ে থেকে ভাবতে লাগলো। ইতোমধ্যে দুই এক ফোঁটা বৃষ্টিপাতও হতো যদি, তবু হয়তো ধানের গাছ তার আরো দু'একদিন বাঁচতো। কি যে বছর পড়েছে, এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই।

ঐভাবেই অনাহারে সারাবেলা গেল। প্রচণ্ড গরমে ঘেমে তেতে সাঁজ রাতও গেল। পড়ে থেকে আহাজারি করতে করতে মাঝ রাতের দিকে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেল হুসেন আলী। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে খোয়াব দেখতে লাগলো। আসমানের পশ্চিম কোণে বিপুল মেঘের সঞ্চার হয়েছে। আস্তে আস্তে সারা আসমান ঢেকে নিচ্ছে পেঁজা তুলার মতো সাদা-কালো মেঘ। গুড় গুড় করে মেঘ ডেকে উঠলো। এরপরেই শুরু হলো বর্ষণ। নীরব বর্ষণ। বিনা ঝড়ে বিনা বাতাসে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। নেচে উঠলো হুসেন আলীর হৃদয়। ঘুমের মধ্যে থেকেই সে 'আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ' বলে বিড় বিড় করে আওয়াজ দিতে লাগলো।

ছ্যাঁৎ করে অকস্মাৎ পানির ধারা গায়ে পড়লো। পানির ধারা গায়ে পড়তেই চমকে উঠলো হুসেন আলী। ভেঙ্গে গেল ঘুম। কিছুক্ষণ বসে রইলো বেহুঁশ হয়ে। তখনও পানির ধারা ঝরে পড়ছে গায়ে। ঝর পড়ছে আরো বেগে। সংবিতে ফিরে এসেই সে দেখলো, পানি পড়ছে তার ঘরের চালের ফুটো দিয়ে। সাথে সাথেই খেয়াল করলো, কি তাজ্জাব! সত্যি সত্যিই বর্ষণ শুরু হয়েছে। প্রবল বর্ষণ। মেঘ ডাকছে গুড় গুড় করে।

গায়ে চিমটি কাটলো সে। চিমটি কেটে দেখলো, না, মোটেই আর খোয়াব নয়। এখন পুরোপুরি হুঁশেই আছে হুসেন আলী। আনন্দে পুনরায় নেচে উঠলো সে। আঁজলা পেতে পানি ধরে সারা গায়ে মাখতে লাগলো আর মহানন্দে এবার 'আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ' বলে মুক্তকণ্ঠে শব্দ করতে লাগলো।

বালবাচ্চা নিয়ে ঘরের এক কোণে অনাহারে ঘুমিয়ে ছিল হুসেন আলীর বিবি। শব্দ

শুনে সে চমকে উঠে বললো– কি হলো, কি হলো? তুমি এমন করছো কেন?

হুসেন আলী শশব্যস্তে বললো– শোকরিয়া আদায় করো বিবি, আল্লাহ্ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করো। খেয়াল করে দেখো, আল্লাহ্ তায়ালার রহমত বর্ষণ হচ্ছে।

খেয়াল করে তার বিবিও তাজ্জব হলো। বিমুগ্ধ হলো আল্লাহ্র এই রহমতে। স্বামী-স্ত্রী এক সাথে বসে আল্লাহ্ তায়ালার শোকর গুজরী করাতে নিমগ্ন হয়ে গেল।

এ বছরের সব কিছুই নজিরবিহীন। এত বড় খরা দু'দশ বছরের মধ্যে পড়েনি। তার চেয়েও বড় কথা, বোশেখ মাস পড়তে না পড়তেই এত অধিক বর্ষণ হুসেন আলীর স্মরণকালের মধ্যে আর হয়নি। মাঝরাত থেকে শুরু করে পরের দিন নাশতার ওয়াক্ত পর্যন্ত এত বেগে নীরবে ও এমন মুষল ধারে বর্ষণ এই সময়ে আর কখনো হয়েছে বলে হুসেন আলী খেয়াল করতে পারলো না।

বৃষ্টিটা ধরে আসতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো হুসেন আলী। দেখলো, খাঁ খাঁ করা মাঠে এখন থৈ থৈ করছে পানি। উঁচু জায়গা থেকে কল কল রবে পানির ধারা নীচের দিকে নামছে।

www.boighar.com

হাসিমুখে হুসেন আলী জমির দিকে ছুটে এলো। ধান যাদের মুমূর্ষু ছিল, তারাও হাসিমুখে ছুটে এলো জমির দিকে। ছুটে এলো আব্বাস আলীও। তবে হাসিমুখে নয়, মুখে তার তখন কেবলই হায় হায় শব্দ।

জমিতে এসে হুসেন আলী দেখলো, আব্বাস আলীর জমি ডুবে সরোবর হয়ে গেছে। ধানের একটা পাতারও কোন চিহ্ন নেই। ওসব এখন অনেক পানির নীচে। আব্বাস আলীর জমি ভরে পানি এখন হুসেন আলীর জমিতে উঠে এসেছে। তার ধানের গোড়ায় দুই তিন ইঞ্চি পানি দাঁড়িয়ে গেছে। এর মধ্যেই তার ক্ষেতের চেহারা পাল্টে গেছে। দীর্ঘদিন পর অঢেল পানি পেয়ে নবজীবন লাভ করেছে ধানের গাছ। ধানের গোছ সতেজ ও সোজা হয়ে গেছে। তার আবাদ এখন হাসছে। হাসছে আর পাঁচজনের আবাদও।

আর আব্বাস আলীর আবাদ? শীষ বেরোনোর কালে একদিন এক রাত্রি পানির নীচে থাকলেই সে ধান একদম শেষ। সেখানে আব্বাস আলীর পানির খাহেশ এমন চূড়ান্তভাবে মিটেছে যে, বৈশাখ মাসের খরতাপেও আব্বাস আলীর ধানের গাছ অতঃপর আর কতদিন কতরাত্রি পানির নীচে পচবে, তা আল্লাহ মালুম। আল্লাহ তায়ালার কি তাজ্জব বিচার!

সে নিজের গায়ে চিমটি কাটলো আবার। চিমটি কেটে অনুভব করলো, না, কোনো নেশা, ধাঁধাঁ বা বিভ্রান্তিও নয়। রীতিমতো হুঁশেই আছে হুসেন আলী।

বাড়তি ঈদ

হিসেবী গোলজার মৃধা হিসেবে গোলমাল করে ফেলেছেন। গুরুগম্ভীর ধীরস্থির ও জ্ঞানী মানুষ মৃধা সাহেব। বেহিসেবী কাজ কখনো করেন না। অগ্রপশ্চাৎ ভেবে চিন্তে নিজ বুদ্ধিতে কাজ করেন তিনি। পরের বুদ্ধির উপর আস্থা তাঁর কম। কিন্তু এবার তিনি ঠেকে গেছেন। নিজ বুদ্ধিতে কাজ করে বড়ই বিপাকে পড়েছেন। অনাত্মীয় অপরের কথা বাদ। বয়োবৃদ্ধ শ্বশুর আর বাড়ন্ত পুত্রের প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে জিদ ধরে যে কাজটি তিনি করেছেন, তা নিয়ে এখন তাঁর পস্তানোর শেষ নেই। নিজের ভুলের জন্যে এমনিতেই তিনি চরম অস্বস্তিতে আছেন, তার উপর একদিকে শ্বশুর সাহেব আর অন্যদিকে পুত্রধনের অহর্নিশ ধিক্কারে ঘরের শান্তি বিলকুলই তাঁর তিরোহিত হয়েছে। এর সাথে আছে আবার গোদের উপর বিষফোঁড়া। অন্যের মন্দে আনন্দ যাদের ধরে না, এমন পাঁচজনের পাঁচরকম উক্তি বাইরের শান্তিও তাঁর হরণ করে নিয়েছে।

ভুলটা তিনি হঠাৎ করেই করেননি। এর পেছনে আছে একটা প্রশস্ত পটভূমি। দেড়-দুই বছর আগের এক ইতিহাস। মৃধা সাহেব অবস্থাপন্ন লোক। মানীগুণী মানুষ। মাঠে অনেক জমি জিরাত। পদে তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। অত্যন্ত সজ্জন হওয়ায়, জনগণ এ পদটি তাঁর জন্যে প্রায় রিজার্ভ করেই রেখেছে। ইলেকশানে কোন বারে হারাতে তাঁকে পারেনি কেউ। সংসারটা তার সবদিক দিয়েই ভরাট। খালি কেবল একটা দিকে। বিদ্যার বড়ই অভাব। বংশে কোন বড় বিদ্বান নেই। ক্লাশ নাইনে উঠা একমাত্র তিনি ছাড়া, জমিজমা যার যতই থাক, পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুর কুল, শাশুড়িকুল এই চার কুলে তাঁর আর কেউ মাইনর পাশও করেন নি। অবশ্য সেকালে গ্রাম এলাকার মুসলমানদের প্রায় সকলের অবস্থাই ঐ এক। বিদ্যা ধনে ধনবান বড় একটা কেউ নন। তা তাঁরা না হোন, তাঁরা তো আর প্রেসিডেন্ট নন বোর্ডের! মৃধা সাহেব ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। তাঁকে অনেক বড় বড় লোকের সাথে উঠাবসা করতে হয়। অনেক শিক্ষিত লোক তাঁর বাড়িতে আসেন। কিন্তু একমাত্র তিনি ছাড়া, কথা বলার লোক আর কাউকেই পান না তাঁরা সেখানে। এ অভাব মৃধা সাহেবকে অহরহ পীড়া দেয়। গাঁয়ের প্রাইমারী স্কুল ভিজিট করতে এসে এক ম্যাট্রিক পি.টি.আই. পাশ এ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস্ তো একদিন এ নিয়ে অনেক খোঁটা তুলনাই দিয়ে গেলেন তাঁকে। সে বেদনা দিলে তার অক্ষয় হয়ে আছে। তাই তিনি চান, বংশে যখন বিদ্বান কেউ নেই, ভাল করে লেখাপড়া শিখে ছেলেমেয়েরা মস্ত বড় বিদ্বান হয়ে উঠুক।

কিন্তু চাওয়া আর পাওয়া এক কথা নয়। বড় ছেলে আবুল কাওসার আড়াই মাইল দূলে পঞ্চগ্রাম হাইস্কুলে পড়ে। বয়সটাই তার বাড়ছে কেবল, বিদ্যাটা এক তিলও

বইঘর ও বিএবিডি
বাড়ছে না। কয়েক বছর ধরে সে সপ্তম শ্রেণীতেই আটকে আছে, অষ্টম শ্রেণীতে উঠার পাসপোর্ট পায়নি। ছোট ছোট আরো কয়েকটি ছেলে আর একটি মাত্র মেয়ে গাঁয়ের প্রাইমারীতে পড়ে। বড় ভাইয়ের কৃতিত্বের জের ধরে তাদের পড়াশুনার অগ্রগতিও তথৈবচ।

মৃধা সাহেবের দিন কাটে বাইরে বাইরে। ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার হাল ধরার ঘরে কেউ নেই। বড় পুত্র পুনরায় ফেল করার পর টনক নড়লো মৃধা সাহেবের। ছেলের হাইস্কুলের মৌলভী শিক্ষকের সাথে তাঁর খুব ভাব। একদিন তিনি মৌলভী সাহেবকে বললেন– মৌলভী সাহেব, ছেলের রেজাল্টটা তো দেখছেন। এভাবে তো আর চলে না। আমি বাইরে বাইরে থাকি। বাড়িতে ছেলেমেয়েরা আদৌ পড়াশুনা করে কিনা, তা দেখার কেউ নেই। তাই আমি ঠিক করেছি, ক্লাশ নাইন কিংবা টেনের একটা ছাত্রকে জায়গীর রাখবো। ঐ ছেলের দেখাদেখি আমার ছেলেমেয়েরাও পড়াশুনা করবে। ক্লাশ টেনের ছেলে হলেই ভাল হয়। হিন্দুপ্রধান স্কুল। মুসলমান ছাত্র কম। তবু যদি জায়গীর থাকার মতো কোন মুসলমান ছেলে ক্লাশ টেনে থাকে, তাকে অবশ্য অবশ্য আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিন। ক্লাশ টেনের না হলে অগত্যা ক্লাশ নাইনের। এটা আমার বিশেষ অনুরোধ।

মৌলভী ইয়ারউদ্দীন বেগ সাহেব সে অনুরোধ রাখলেন। ক্লাশ টেনের এক ছেলে দিন তিনেক পরেই বই বেডিং নিয়ে মৃধা সাহেবের ছেলে কাওসারের সাথে বাড়িতে এসে হাজির।

কয়েকদিন বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকায়, আগত ছেলেটির সাথে মৃধা সাহেব এ যাবত কোন আলাপই করতে পারেন নি। কয়েকদিন পরে বাদ মাগরিব তিনি এসে ছেলেটির কাছে বসলেন এবং প্রশ্ন করলেন মাওলানা ইয়ারউদ্দীন বেগ সাহেব কি তোমাকে পাঠিয়েছেন?

ছেলেটি বিনম্রকণ্ঠে বললো– জি।

: কোন ক্লাসে পড়ো তুমি?

: ক্লাশ টেনে।

: ক্লাশ টেনে? খুব ভাল কথা। তোমার নাম?

: মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম।

: তোমার বাড়ি?

: জি, এখান থেকে মাইল সাতেক পূবদিকে বালিহাট গ্রামে।

: বাড়িতে কে কে আছে তোমার?

: এখন এক ভাই ছাড়া আর কেউ নেই।

: কেন, তোমার আব্বা-আম্মা?

অনেক আগেই তাঁরা ইন্তেকাল করেছেন। আমার অনেক বড় দুই বোন ছিলেন, তাঁদেরও অনেক আগেই শাদি হয়ে গেছে।

: তোমার সেই ভাইয়ের শাদি হয়েছে কি?

: জিনা। সে আমার চেয়ে মাত্র বছর চারেকের বড়। এখনও তার শাদি হয়নি।
: সে কি! তাহলে তোমাদের রান্নাবান্না করে কে?
: অই আমার ভাই করে। আমি বাড়িতে গেলে দু'জনে মিলে করি।
: কি গজব। তা তোমাদের সাংসারিক অবস্থা কেমন?
শফিকুল ইসলাম এবার মাথা নীচু করলো। নিস্প্রভকণ্ঠে বললো– জি মানে, আমরা খুবই গরীব। মাঠে সামান্য কয়েক বিঘে জমি আর বাড়িতে খান তিনেক খড়ের ঘর।
: মাত্তর?
জি। একটা ঘরে গোটা তিনেক গরু থাকে আর বাকী দুই ঘরে আমরা দুইভাই থাকি। আর কিছুই নেই আমাদের।
: তাহলে তোমার পড়াশুনা চলে কি করে?
: খুব কষ্টে চলে। বই পুস্তক বেশীর ভাগই চেয়ে চিন্তে যোগাড় করি, বাকীটা অন্যের বই দেখে চালাই আর স্কুলে ফুল ফ্রি, মানে বিনে বেতনে পড়ি।
: হুউ!
আর কোন কথা না বলে গম্ভীরভাবে উঠে গেলেন মৃধা সাহেব। এখন একটা দুরবস্থাগ্রস্ত ছেলেকে পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে তিনি বেজায় নাখোশ হলেন মৌলভী সাহেবের উপর।
কিন্তু যারপর নেই খুশী হলেন মৃধা সাহেবের স্ত্রী। স্বামীকে তিনি বললেন– বড়ই চমৎকার ছেলে পাঠিয়েছেন মৌলভী সাহেব। কি সুন্দর তার আক্কেল স্বভাব আর আদব কায়দা। দেখতেও খুব সুন্দর। ঠিক আমাদের আবুল কায়েস বেঁচে থাকলে এমনটিই হতো।
নিঃশ্বাস চাপলেন মৃধা সাহেবের স্ত্রী। মৃধা সাহেব রুষ্টকণ্ঠে বললেন– তা হোক। চেহারা দিয়ে কি করবো আমি? আমি কি তাকে জামাই বানাতে যাচ্ছি? যে কাজে এনেছি, সে কাজ যদি না হয়, তাহলে আর পাঁচটা দিনও তাকে আমি রাখবো না।
মৃধা সাহেবের স্ত্রী প্রশ্ন করলেন– সে কাজ মানে? কি কাজ?
মৃধা সাহেব বললেন– ছেলেমেয়েদের পড়ানোর কাজ। নেহায়েতই কাঙালের ঘরের ছেলে। পরের বই দেখে দেখে পড়ে। নিজেই সে পাশ করতে পারবে কি না সন্দেহ, সে অন্যকে পড়াবে কি?
: কেন, আমাদের সামিয়া তো বললো, খুব ভাল পড়ায়। অনেক তার জ্ঞানগম্মি?
কি যে বলো! সামিয়া তো ক্লাশ ফোরে উঠেছে কেবল। জ্ঞানগম্মি কাকে বলে সে বুঝবে কি?
: কেন বুঝবে না? বয়সটা তো বসে নেই। তের পেরিয়ে চৌদ্দতে পড়েছে।
: আরে দূর! ওটা আবার একটা কোন বয়স নাকি?
মৃধা সাহেব আর কথা বাড়ালেন না। কিন্তু মনে তাঁর খুঁত খুঁত ভাব রয়েই গেল। ছেলেটিকে যাচাই করে দেখার জন্যে পরের দিন ফের তাকে প্রশ্ন করলেন– তুমি কি

এক চান্সেই পাশ করে ক্লাশ টেনে উঠেছো?
মৃধা সাহেবকে চাচা বলে সম্বোধন করে শফিকুল ইসলাম বললো– জি চাচাজান, এক চান্সেই।
: এক চান্সেই? খুব ভাল। তোমাদের ক্লাশে মোট ছাত্র সংখ্যা কত?
: জি, বত্রিশজন।
: তোমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় কে? নিশ্চয়ই বাবুদের বাড়ির কোন ছেলে?
শফিকুল ইসলাম স্মিতকণ্ঠে বললো– জি না, আমি।
মৃধা সাহেব কানে একটু কম শোনেন। বুঝতে না পেরে উচ্চকণ্ঠে বললেন– কি বললে?
শফিকুলও একটু উঁচু গলায় বললো– জি আমিই আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়।
চমকে গেলেন মৃধা সাহেব। বললেন– তুমি! তুমি ফার্স্ট হয়ে ক্লাশ টেনে উঠেছো?
: জি।
: তাজ্জব!
আর কোন কথা তখন বললেন না। ঘটনাটা সত্যি কিনা, তা যাচাই করে দেখার জন্যে মৌলভী সাহেবের সাথে ফের দেখা করে বললেন– মৌলভী সাহেব, যে ছেলেকে পাঠিয়েছেন, সেকি ক্লাশ টেনের ফার্স্ট বয়!
মৌলভী সাহেব বললেন, কে, শফিকুল ইসলাম? সেরেফ ক্লাশ টেনের কেন, সে তো বরাবরই ফার্স্ট বয়। কোন ক্লাশেই কখনো সেকেন্ড হয়ে উঠেনি।
যারপর নেই তাজ্জব হয়ে হয়ে মৃধা সাহেব বললেন– কি তাজ্জব- কি তাজ্জব। তার তো বিষয়বিত্ত সহায় সম্বল কিছুই নেই।
তবু মৌলভী সাহেব আফসোস করে বললেন– দুর্ভাগ্যটা সেখানেই। শুনেছি, এককালে তাদের অনেক জমিজমা ছিল। বাকী খাজনার দায়ে সব কিছু হারিয়ে এখন তারা নিঃস্ব। বই পুস্তকও সব কিনতে পারে না। ঠিকমতো যোগান পেতো যদি, তাহলে ত ফলাফল আরো অধিক আকর্ষণীয় হতো।
: কে কি! তাহলে তো ম্যাট্রিকেও তার ভাল করার কথা?
কথা তো তাই। কিন্তু বই-পুস্তক সব নেই, অর্থকষ্ট চরম, বাড়িতে ফের অনেক কাজ। এ অবস্থায় কি হয়, তা বলা কঠিন।
খুশি হয়ে ফিরে এলেন মৃধা সাহেব। অতঃপর পড়ানোর দক্ষতায় আর বিনম্র আচরণে শফিকুলের উপর তিনি উত্তরোত্তর খুশি হতেই লাগলেন। শফিকুল ইসলাম তাঁর বাড়িতেই স্থায়ী হয়ে রয়ে গেল।
দেখতে দেখতে কেটে গেল একটা বছর। শেষ হলো টেস্ট পরীক্ষা। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফরম পূরণ করে বাড়িতে ফিরে এলো শফিকুল ইসলাম। ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাঁচ ছয় মাস পরে। এই দীর্ঘদিন জায়গীরদারের বাড়িতে অবস্থান করার কোন অজুহাত তার ছিল না।

কিন্তু বাড়িতে এসে শফিকুল ইসলাম চরম সমস্যায় পড়ে গেল। অন্য ছাত্রের যেসব বই দেখে দেখে পড়তো সে, সেগুলো আর হাতের কাছে পেলো না। এর উপর সংসারের তামাম কাজ আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরলো তাকে। ভাইটে তার অনেকটা সংসারী মানুষ। মাতবরী আর দেনদরবার নিয়ে বাইরে বাইরে থাকে। শফিকুল ইসলাম বাড়িতে ফিরে আসায়, এ অভ্যাস তার আরো বেড়ে গেল। ফলে, পাকশাক, ঘরদোর সামলানো আর গরু বাছুরের দায়িত্ব সব এসে শফিকুলের উপর পড়লো। ওদিকে আবার হিন্দু প্রধান স্কুলে প্রায়ই মৌলভী শিক্ষক না থাকায় ক্লাশ সেভেনে কিছুদিন সংস্কৃত ক্লাশ, এইটে কিছুদিন এ্যারাবিক, পুনরায় মৌলভী শিক্ষক না থাকায় ক্লাশ নাইন একদম ফাঁকা। ক্লাশ টেনে উঠে অগত্যা উর্দু নিয়েছে শফিকুল ইসলাম। চার বছরের সাবজেক্টটার অর্ধেকটাও এখনো আয়ত্ব করতে পারেনি সে। বাড়িতে এসে এ সাবজেক্টটা পড়ে রইলো। এতিম হয়ে।

যাই হোক, ঐ অবস্থাতেই শফিকুল ইসলাম যথা সময়ে পরীক্ষা দিতে গেল। অর্থাভাবে পরীক্ষা কেন্দ্রের অনেক দূরে এক পতিত ঘরে অবস্থান নিতে হলো তাকে। খাওয়া দাওয়ার চরম দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে পরীক্ষা দিতে লাগলো সে। এখানেও কারো বই পুস্তকের তেমন একটা সাহায্য সে পেলো না। এর উপর ঘটে গেল আর এক অঘটন। অজ্ঞ হিন্দু শিক্ষকদের নির্দেশনা মতে ক্লাসিক্যাল সাবজেক্ট নামে কথিত তার উর্দু পরীক্ষার দিন ছিল সব পরীক্ষা পাঁচ দিন পরে। তাই, পরে পড়বে বলে এ যাবত সে উর্দুর পাতা খুলেনি। কিন্তু শেষ পরীক্ষা দিয়ে এসে পরের দিন উর্দু নিয়ে বসতেই সে দেখলো, তার পরিচিত এক ছেলে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানলো, উর্দু পরীক্ষা আজই। ফলে, তাড়াহুড়ো করে গিয়ে শফিকুল ইসলাম এই সাবজেক্ট যে পরীক্ষা দিলো, তা সাকুল্যে করুণ। তবু ভাগ্য ভাল! সময়মতো জানতে না পারলে এ সাবজেক্টে পরীক্ষা দেয়াই হতো না তার, যার অর্থ হতো আরো করুণ। পরীক্ষান্তে ক্ষুণ্ন মনে ঘরে ফিরে এলো সে।

এদিকে মৃধা সাহেবের মেয়ে সামিয়া খানমের বয়স এখন পনের বছর চলছে। সে যুগে পাড়াগাঁয়ে মেয়ে ছেলের এ বয়স অনেক বয়স। তার উপর সামিয়া আবার খুবই বাড়ন্ত মেয়ে। সামিয়ার সমবয়সী মেয়ে দরাদ্দর শাদি হয়ে গেল। তা দেখে মৃধা সাহেবও পাত্র খুঁজতে লাগলেন। এই প্রেক্ষিতে জব্বোর এক সম্পর্ক এলো পার্শ্ববর্তী গাঁ থেকে। পাত্র তেমন লেখাপড়া না জানলেও, সাংসারিক অবস্থা বিরাট। মস্ত মস্ত টিনের ঘর, প্রচুর জমিজমা, পুকুর, বাগান আর গরু মহিষ মিলে পাঁচ ছ'খানা লাঙ্গল চলে মাঠে। মৃধা সাহেবের শ্বশুর ও পুত্র আবুল কাওসারের এ ঘর খুবই পছন্দ। প্রেসিডেন্টের মেয়ে হিসাবে বর পক্ষের আগ্রহও বেজায়।

কিন্তু বেঁকে বসলেন মৃধা সাহেব নিজে। বললেন– বড় ছেলের তো লেখাপড়া কিছু হলো না। ছোটগুলোর কি হবে, কে জানে। বংশে বিদ্বান কেউ নেই। মেয়েকে শাদি দিয়ে আমি বিদ্বান জামাই নেবো।

শ্বশুর সাহেব রুষ্টকণ্ঠে বললেন– বিদ্বান জামাই কোথায় পাবে তুমি! মেয়ে তোমার

কালো। কোন বিদ্বান তাকে শাদি করতে আসবে?
মৃধা সাহেব অবিচলকণ্ঠে বললেন– দেখি, কোথাও পাই কি না।
দেখতে লাগলেন মৃধা সাহেব। একটি পাত্রের খোঁজও পেলেন তাড়াতাড়ি। থার্ড ডিবিশনে আই.এ. পাশ করে এখন বি.এ. পড়ছে পাত্রটি। এখানে শাদির কথা তুললেন। কিন্তু সরাসরি বেঁকে বসে বরপক্ষ না করে দিলো। সাধাসাধি করতে গেলে একজন মুখের উপর বললো– কি ফালতু কথা বলছেন! মেয়ে আপনার কালো। বিদ্যায় ফোর পাস। ছেলে আমাদের দু'দিন পরেই গ্র্যাজুয়েট হবে। গ্রাজুয়েট ছেলের শাদি দেবো ঐ রকম একটা গেঁয়ো মেয়ের সাথে? আপনি বরং হাল লাঙ্গল ওয়ালা কোন একটা গেরস্থ ঘর দেখুন।
আরো একটা জায়গায় চেষ্টা করলেন মৃধা সাহেব। কিন্তু ফলাফল ঐ এক। বিদ্বান কেউ তাঁর মেয়েকে শাদি করতে রাজী নয়। শেষ পর্যন্ত মৃধা সাহেব স্থির করলেন, তৈরি ছেলে কেউ যখন রাজী নয়, ছেলে তিনি তৈরি করে নেবেন।
মনস্থির করে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন– ঈসা মিয়ারা বলছে, হাতে এত সুন্দর পাত্তর থাকতে বাইরে খোঁজার দরকার কি? জায়গীর শফিকুল ইসলামের সাথে শাদি দেন না কেন? ওদিকে আবার অনেকেই বলছে, ম্যাট্রিকে ছেলেটা ফার্স্ট ডিভিশানই পেতে পারে। তুমি কি বলো?
ঈসা মিয়ারা মৃধা গৃহিণীর মামাতো ভাই। মৃধা গৃহিণী হেসে বললেন– আমার সাথেও কথা হয়েছে ঈসা মিয়ার। আমিও তো সেই কথাই বলি।
মৃধা সাহেব খুশী হয়ে বললেন– বলো কি? তুমি তাহলে এই বিয়ের পক্ষে?
কেন হবো না? আপনার কি চোখ নেই? দেখতে পাননি দু'জনের মধ্যে কেমন ভাব জমে উঠেছিল? আবেদের মা আপনাকে কিছু বলেনি?
: এ্যাঁ!
ছেলেটার যাবার সময় আমাদের সামিয়া লুকিয়ে লুকিয়ে তার রুমালে ফুল তুলে দিয়েছে। নিজের নাম তুলে দিয়েছে ঐ রুমালে। শেষের দিকে ছেলেটার মানে ঐ শফিকুলের খাওয়া দাওয়া আর নাশতা পানির ব্যাপারে সামিয়ার ঐ বেজায় আগ্রহটাও কি চোখে পড়েনি আপনার?
মৃধা সাহেবের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। চোখে যে তাঁর কিছুই পড়েনি, এমন নয়। তিনিও কিছু কিছু আঁচ করতে পেরেছিলেন। এবার তিনি সিদ্ধান্তে অটল হয়ে গেলেন। ঘটক নিয়োগ করলেন আবেদের মা নাম্নী এক পাড়া বেড়ানী মেয়েকে। শফিকুল ইসলামের এক বোনের গাঁয়ে যাতায়াতের ফলে শফিকুল ইসলামের সাথে তার কিছুটা পূর্ব পরিচয় ছিল।
সৌজন্য সাক্ষাৎ করার জন্যে শফিকুল ইসলাম পরীক্ষা দিয়ে মৃধা সাহেবের বাড়িতে একবার এসেছিল এবং আর একবার আসার ওয়াদা করে গিয়েছিল। সেই ওয়াদা মাফিক আবার এলে আবেদের মায়ের সহায়তার মৃধা সাহেব আটকিয়ে দিলেন তাকে। শাদির প্রসঙ্গে কথা বললেন শফিকুলের ভাই ও ভগ্নিপতিদের সাথে।

শফিকুলের পড়াশুনার একটা গতি হবে চিন্তা করে সবাই তাঁরা রাজী হয়ে গেলেন। শফিকুলের তো দুর্বলতা আগে থেকেই ছিল।

কিন্তু প্রচণ্ড আপত্তি তুললেন মৃধা সাহেবের শ্বশুর ও পুত্র আবুল কাওসার। তাঁরা বললেন অসম্ভব। বাড়িতে ঘর নেই, হাঁড়িতে চাল নেই। কুটুম্বিতা করার জন্যে একটা দিনও আমরা যেতে পারবো না সেখানে। এ বিয়ে হতে পারে না কিছুতেই। কিছুতেই না।

কিন্তু মৃধা সাহেব অনড়। অনেকের অনেক আপত্তির মুখে শফিকুলের সাথেই তিনি শাদি দিলেন সামিয়ার।

ব্যাস! এর কিছুদিন পর থেকেই এজন্যে শুরু হলো মৃধা সাহেবের পস্তানো। তিনি অনুভব করলেন, সত্যিই তিনি ভুল করে ফেলেছেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরুলো অল্প দিন পরেই। ফার্স্ট ডিভিশান নয়, সেকেন্ড ডিভিশান নয়, নিছক থার্ড ডিভিশানে পাশ করেছে শফিকুল ইসলাম। ক্রোধে ফেটে পড়লেন বিরোধিতাকারীরা। সমস্বরে মৃধা সাহেবকে ধিক্কার দিতে লাগলেন তারা। তাদের সাথে আরো অনেকে বলতে লাগলেন– সাড়ে বাইশ টাকা মাইনের প্রাইমারী স্কুলের একটা মাষ্টার হতে পারবে বড়জোর। তাতেও আবার ট্রেনিং লাগবে। এর বেশী আর কিছুই হতে পারবে না মৃধা সাহেবের জামাই। বিদ্বান হওয়ার আশা তার দুরাশা। আই.এ. পাশ করাই সম্ভব নয় তার পক্ষে। সেকেন্ড ডিভিশান একটি কি ফাস্ট ডিভিশানে পাশ করা এ তল্লাটের তামাম ছেলে ফেল করেছে আই.এ.তে। একজনও তারা পাশ করতে পারেনি আর থার্ড ডিভিশানে পাশ করা ছেলে করবে আই.এ. পাশ। হুঁঃ। তবেই হয়েছে।

ঘটনা সত্যি। আশপাশের সবক'টি ছেলেই ইদানিং ফেল করেছে আই.এ.তে। ম্যাট্রিকে প্রায় সকলেই সেকেন্ড ডিভিশান পাওয়া ছেলে তারা। একজন ফার্স্ট ডিভিশানে পাশ করা ছেলে সব অংক ভুল করায় কমপার্টমেন্টাল পেয়েছে আই.এস.সিতে। এই সমস্ত নজীরের মুখে মৃধা সাহেব হতাশার অতল তলে তলিয়ে গেলেন।

ফলাফল যে এই রকমই হবে, শফিকুল তা আগেই অনুমান করেছিল। যদিও ঐ স্কুল থেকে একমাত্র সে একাই পাশ করেছে এবং আর তিন নম্বর কম পড়ায় থার্ড ডিভিশান পেয়েছে, তবু থার্ড ডিভিশান থার্ড ডিভিশানই। এখানে সাফাই গাওয়ার কোন মওকা নেই।

এই অবস্থার মুখে শফিকুল ইসলাম দূরবর্তী এক জেলায় আই. এ. পড়তে গেল। কাছে কোলে কোথাও কোন কলেজ তখন ছিল না। কষ্টে অর্জিত নিজের কিছু পয়সার সাথে এবার শ্বশুরের তরফ থেকে কিছু পয়সা আসায়, বই পুস্তক সবই সংগ্রহ করলো সে। সংসারের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকায়, এবার সে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে লাগলো। দুই বছর কেটে গেল যথা সময়ে। আই.এ. পরীক্ষা দিয়ে যথাসময়ে ফিরে এলো শফিকুল ইসলাম।

বইঘর ও বিএবিডি
মৃধা সাহেব বড় আশা নিয়ে প্রশ্ন করলেন– পরীক্ষা কেমন হলো?

শফিকুল ইসলাম বললো– ভালই হয়েছে।

কিন্তু হা হতোস্মি। রেজাল্ট বেরুলে মৃধা সাহেবের কাছে খবর এলো, থার্ড ডিভিশানও নয় এবার। জামাই তার ডাঁহা ফেল করেছে। ঐ কলেজের কাছেই চাকরি করে এখানকার এক ছেলে। সে-ই খবর পাঠিয়েছে। পর পর আরো কয়েকজন এই একই খবর পৌঁছালো। গাঁয়ের একজন বিশ্বস্ত ও মুরুব্বী মানুষ কার্যোপলক্ষ্যে ঐ শহরে গিয়েছিলেন। তিনি এসে মৃধা সাহেবকে ম্লানকণ্ঠে বললেন– চেষ্টার কোন কসুর করিনি মৃধা সাহেব। কলেজ বন্ধ থাকলেও পঁই পঁই করে খোঁজ নিয়েছি সবার কাছে সব জায়গায়। কিন্তু আফসোস। জামাই আপনার পাশ করতে পারেনি।

খবর শুনে থপ্ করে বসে পড়লেন মৃধা সাহেব। বুঝতে পারলেন, এ জন্যেই ক'দিন থেকে শফিকুলের আর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

রমজান মাস চলছে তখন। রোজা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একদিন পরেই ঈদ। ইউনিয়ন বোর্ডের কাজ সেরে মৃধা সাহেব টলতে টলতে এসে রাস্তার উপর অবস্থিত কছিমুদ্দিনের গোলাঘরে অর্থাৎ মুদিখানার দোকানে, অবসন্নভাবে বসে পড়লেন। চোখ মুখ তাঁর পোড়া কাঠ। দোকানে আরো অনেক লোক ছিল। মৃধা সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে তাদের একজন বললো– সে কি! আপনার অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি প্রেসিডেন্ট সাহেব?

জবাব দিলো অন্য একজন। বললো– অসুখ করবে কেন? শুনোনি, প্রেসিডেন্ট সাহেবের জামাই ফেল করেছে পরীক্ষায়? বড়ই আশা ছিল তাঁর বিদ্বান জামাই নেয়ার। কিন্তু সবই কপাল! সেই আশা করে একেবারে ডোবায় ডুবিয়ে দিলেন মেয়েটাকে। জমি জমা নেই, তেমন কোন চাকরিও ও বিদ্যায় হবে না। কি দুরবস্থায় যে পড়ে গেল মেয়েটা!

www.boighar.com

সমবেদনায় নিঃশ্বাস ফেললো বক্তা। তৃতীয় একজন বললো– বড়ই হিসেবী মানুষ আমাদের এই প্রেসিডেন্ট সাহেব। কত অবস্থাপন্ন ঘর থেকে সম্বন্ধ এলো। অথচ সে সব রেখে হঠাৎ করে এমন বেহিসেবী কাজটা যে কি করে তিনি করলেন!

প্রথমজন বললো– আহা! একদিন পরেই ঈদ। ফল বাড়াবি আর ক'টা দিন পরেই বাড়া। ঈদের আনন্দটা তাঁর একেবারেই মিসমার করে দিলে!

শ্রান্তমনে প্রেসিডেন্ট সাহেব বসে বসে হাঁপাচ্ছিলেন। সমবেদনামূলক হলেও এদের এই আলোচনায় মনটা তাঁর আরো বেশি খারাপ হলো। এ অবস্থায় দোকানদার কছিমুদ্দীন প্রশ্ন করলো– আপনার জামাই এখন কোথায় হুজুর? এদিকে তো তাকে আর দেখিনে?

জবাবে মৃধা সাহেব বিষণ্নকণ্ঠে বললেন– তার কোন খবর আমি জানিনে। হয়তো পরীক্ষার ফল জানতে গেছে।

রাস্তা এই একটাই। ঠিক এই সময় সেখানে এসে হাজির হলো শফিকুল ইসলাম।

দীর্ঘ জার্নির ফলে চেহারা তার বড়ই উস্কো খুস্কো। কাপড় চোপড় ময়লা। হঠাৎ তার আগমনে সকলেই নড়ে চড়ে উঠলো। কছিমুদ্দীন প্রশ্ন করলো– কি জামাই মিয়া, হঠাৎ এ অবস্থায়? পরীক্ষার ফল জেনে এলেন বুঝি?

প্রশ্নের মধ্যে সূক্ষ্ম একটা বিদ্রুপ মিশ্রিত ছিল। শফিকুল ইসলাম সংক্ষেপে বললো– হ্যাঁ, সেখান থেকেই আসছি।

আশার উপর আশা। সে কথা শুনে মৃধা সাহেব ঝুঁকে পড়ে বললেন– কি, খবর কি?

জড়তা কাটিয়ে উঠার জন্যে শফিকুল ইসলাম নীরবে একটু মাথা নিচু করলো। সঙ্গে সঙ্গে ধড়াশ করে উঠলো মৃধা সাহেবের বুক। উপস্থিত লোকজনেরা বিরূপকণ্ঠে বলে উঠলো– ওটা জেনে আর করবেন কি প্রেসিডেন্ট সাহেব? চেহারা দেখে কি কিছুই বুঝতে পারছেন না? যা হবার, তাই হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট সাহেব তবুও ক্লান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন– কি খবর জেনে এলে?

এবার শফিকুল ইসলাম মুখ তুলে স্মিতকণ্ঠে বললো– আমি পাশ করেছি।

কানে কম শোনার কারণে মৃধা সাহেব ঠিকমতো বুঝতে পারলেন না কথাটা। ব্যস্তকণ্ঠে ফের প্রশ্ন করলেন– কি বললে?

শফিকুল ইসলাম অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বললো– আমি পাশ করেছি।

হু হু করে মৃধা সাহেবের চোখে মুখে রক্তের জোয়ার ছুটে এলো। বিপুল আগ্রহভরে ফের বললেন পাশ করেছো?

: জি জি।

: কোন ডিভিশান?

: ফার্স্ট ডিভিশান।

আসন থেকে লাফিয়ে উঠে মৃধা সাহেব বললেন– এ্যাঁ! ফার্স্ট ডিভিশান?

: জি আব্বাজান। সেরেফ ফার্স্ট ডিভিশানই নয়, আমি বৃত্তি পেয়েছি। প্রথম বিশজনের একজন হয়েছি। অনেক দূরে জায়গীর না থেকে হোস্টেলে থাকতে পারলে রেজাল্টটা আরো খানিক ভাল হতো। এই দেখুন রেজাল্ট...

সঙ্গে করে আনা খবরের কাগজটি বাড়িয়ে ধরলো শফিকুল ইসলাম। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে এসে জামাইকে আবেগ ভরে জড়িয়ে ধরলেন মৃধা সাহেব। মুখে কেবলই বলতে লাগলেন– আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসাই আল্লাহ তায়ালার!

উপস্থিত সকলেই কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়েছিল। এবার সকলেই কলকণ্ঠে বলে উঠলো– সোবহান আল্লাহ! কি সুখবর! এ আনন্দের তুলনা নেই। ঈদের আনন্দের আগেই প্রেসিডেন্ট সাহেবকে আল্লাহ তায়ালা জব্বোর আনন্দ দিলেন আজ! বাড়তি আনন্দ... বাড়তি আনন্দ!!

আমার ছেলেবেলার ঈদ

সামনেই ঈদ। আর এই ঈদ নিয়ে আজ চারদিকে কতই না সাজ রব। এই ঈদকে উপলক্ষ্য করে আজ কত উৎসব কত অনুষ্ঠান আর কত আনন্দ। শুরু হয়েছে বিভিন্নমুখী আনযাম। এখনই শুধু নয়, ঈদের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে ঈদের গাহানা– ঈদের কেনাকাটা, কোলাহল আর দৌড়ঝাঁপ। শুরু হয়েছে ঘরমুখো প্রবাসীদের ঘরে ফেরার তৎপরতা। ঈদ উপলক্ষ্যে আজ নারীপুরুষ সকলের, বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের কত সখ, কত সাধ, কত চাহিদা। যুবক-যুবতী আর কিশোর কিশোরীরা আজ মেতে উঠেছে নতুন জামা কাপড় জুতা মোজা আর প্রসাধনী দ্রব্যাদির কেনাকাটায়। আরো ছোটরা ছুটছে রঙ-বেরঙের খেলা, পুতুল, বাঁশি আর স্টিকারের পেছনে। উড়ছে বেলুন, ফেষ্টুন, নিশান ও পোষ্টার। চলছে ঘরদোর ও ঈদগাহের পরিচর্যা। রাস্তায় রাস্তায় আঁকা হচ্ছে ঈদের আলপনা। চলছে ঈদকার্ড আর শুভেচ্ছা বিনিময়। ছাপা হচ্ছে ঈদ সংক্রান্ত হরেক রকম লেখা আর পত্র পত্রিকায় সমানে বেরোচ্ছে ঈদের বিশেষ সংখ্যা। ঈদের প্রায় দশ পনের দিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে এসব কর্মকাণ্ড। আমার এলাকায়, অন্য এলাকায়, সর্বত্র।

অথচ হায়রে সেদিন! এদিন আর সেদিনের মধ্যে কতই না তফাৎ। ঈদ উপলক্ষে মুসলমানেরা আজ যতটা সরব, সেদিন তারা ছিল প্রায় ততটাই নীরব। সেদিন, অর্থাৎ আমার বাল্যকালে আমার এলাকার মুসলমানদের মধ্যে ঈদ এসেছে অনেকটাই নীরবে আর ঈদ উৎসব পালিত হয়েছে আজকের তুলনায় একেবারেই নিস্প্রভভাবে। অন্যান্য শহর বন্দর এলাকায় কিছুটা সজীবতা থাকলেও আমাদের গ্রামগঞ্জ এলাকায় ঈদ ছিল এক দিনের এক ম্রিয়মাণ অনুষ্ঠান। রোজার ঈদে না ছিল তারাবীহ, শবে কদর আর ইত্তেফাক নিয়ে কোন ব্যস্ততা, কোরবানীর ঈদে না ছিল কোরবানীর পশু ক্রয় আর পশু কোরবানীর কোন আনযাম ও আয়োজন। উভয় ঈদেরই অনুভূতি ও গুরুত্ব ছিল নিতান্তই গৌন। ছিল অনেকটা 'প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে, আমার দুয়ার প্রান্তে... এসেছিল পারিনি তা জানতে' –এই রকম। অন্যের বেলায় না হলেও আমাদের মতো অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের কাছে ব্যাপারটা ছিল প্রায় এই রকমই। ঈদ এসে হাজির হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমরা ছেলেরা অনেকে জানতেই পারিনি যে, ঈদ বলে কোন কিছু আসছে। বাংলার অন্যান্য জেলার খবরও যে খুব জৌলুশদার ছিল, এটা মনে করিনে। তবে আমার বর্তমান জেলা নাটোর ও তৎসংলগ্ন এলাকার এ খবর নিতান্তই নিরুৎসাহ ব্যঞ্জক, তথা করুণ।

তখন ইংরেজ আমল। দেশ ইংরেজদের, কিন্তু বাংলার শাসক তখন মূলত হিন্দু জমিদারগণ। বিশেষ করে, বাংলার কৃষক মজদুর আর গ্রামগঞ্জের শাসক তখন হিন্দু জমিদারেরা আর তাঁদের নায়েব গোমস্তারা। আজকের মতো তখনকার গ্রামগঞ্জের মানুষ এত কোর্ট-আদালত চিনতো না। ইংরেজদের সেসব কোর্ট-কাচারী পর্যন্ত পৌঁছার সাধ্যও বাংলার সব মানুষের ছিল না। গ্রামগঞ্জের মুসলমানদের তো সে সাধ্য ছিল না বললেই চলে। দেশব্যাপী জমিদারদের হাজার হাজার খাজনা আদায়ের কাচারীই ছিল তখন কোর্ট আদালত। কাচারীর নায়েব গোমস্তারাই ছিলেন গ্রামগঞ্জের মানুষের, বিশেষ করে মসলমানদের বিচারক ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বিশেষত একজনের জমি অন্যজনের খতিয়ানে তুলে দিয়ে বিত্তবানকে দীন আর দীনকে বিত্তবান বানানোর যেখানে দেদার তাকত রাখতেন তাঁরা, সেখানে তো দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বটেই। বড় লোকদের দু'একটা বড় ব্যাপার ছাড়া এদের বিরুদ্ধে গরীব প্রজাদের অভিযোগ আবেদন খোদ জমিদার বা তাঁর সদর কাচারী পর্যন্তও পৌঁছতো না। অন্য কথায়, পৌঁছানো সহজসাধ্য ছিল না। মুসলমানদের ক্ষেত্রে তো প্রায় নয়ই। নিজে আমি এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

আমার বয়স তখন ছয় সাত বছর। স্থানীয় খাজনা আদায়ের কাচারীর নায়েবের যোগসাজসে আমার গ্রামের এক স্বার্থপর মাতবর তার বাড়ি-সংলগ্ন আমাদের বসতবাটিটি তার নিজ নামে করে নেয়। উদ্দেশ্য ষোলআনাই হীন। তার নিজের ছোট বসতবাড়িতে তার চার পাঁচটি ছেলের ভবিষ্যতে বসত করার স্থান সংকুলান হবে না বিবেচনায়, ঐ মাতবর তার বাড়ি-সংলগ্ন আমাদের বসতবাড়িটি আমার পিতার মৃত্যুর পরে পরেই নায়েবকে হাত করে তার নিজের নামে করে নেয়। অতঃপর চার চারটি ছোট ছোট ছেলে মেয়েসহ আমার বিধবা আম্মাকে সে বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করতে উদ্যত হয়। বাল-বাচ্চাদের নিয়ে আমার আম্মার মাথা-গোঁজার আর কোন ঠাঁই ছিল না। নায়েব গোমস্তার কাছে কোন সুবিচার না পেয়ে নিরুপায় হয়ে আমার আম্মা তখন আমাদের জমিদারের বাড়ি বৃকুৎসায় যেতে বাধ্য হয়। নাছোড়বান্দা হয়ে আমিও তাঁর সাথে যাই। কিন্তু শত চেষ্টা করেও আমার আম্মা আমাদের উপর এই জুলুমের কথা জমিদারের কাছে পৌঁছাতে সমর্থ হননি বা জমিদারের সদর কাচারীতেও এর কোন সুবিচার পাননি। ফিরে এসে আমার অসহায় বিধবা আম্মা নিজের বাড়িঘর তথা বসতবাড়ি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে অন্যের বাড়িতে আসেন। অন্যের বাড়িতে চালা তুলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, ঐ মাতবরের ছেলেরা আজও আমাদের সেই বসতবাড়িতেই বসবাস করছে। আসলে খোদ জমিদারের সাক্ষাৎ গরীব মুসলমান প্রজারা বড় একটা পেতোই না।

থাক সে কথা। পলাশীর পর থেকে পাকিস্তান অর্জন পর্যন্ত, মুসলমানদের তখন চরম দুর্দিন। মুসলমানেরা তখন সর্বস্ব হারিয়ে প্রধানত কৃষক আর দিনমজুরে পরিণত হয়েছিল। হিন্দু নায়েব গোমস্তা আর প্রভাবশালী হিন্দু বাবুদের আজ্ঞাবহ ও কৃপাধন্য

হয়ে বাস করতে হতো তাদের। তাদের অস্তিত্ব ছিল অস্তগামী সূর্যের মতো। তাদের আত্মপরিচয়, স্বকীয়তা, ধর্মীয় চেতনা এবং ইসলামী আচার অনুষ্ঠান প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে আমাদের নাটোর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় এসব হিন্দুধর্মের সাথে মিশে প্রায় একাকার হয়ে গিয়েছিল। এখানে এক মাস পূজোর ছুটি ছিল। কিন্তু রোজার ছুটি একটা দিনও ছিল না। ঈদের ছুটি ছিল শুধুমাত্র একদিন। কোরবানীর ঈদে গরু কোরবানীর কথা আমার এলাকার লোকেরা কল্পনাও করতে পারতো না। হিন্দু জমিদারিতের গো-হত্যা ছিল নরহত্যার চেয়েও অমার্জনীয় অপরাধ। নাটোর শহরকে তখন বৃন্দাবনের সাথে তুলনা করতেন অনেকে। আজও কেউ কেউ তা করেন। এখানে গরু কোরবানীর কথা পাকিস্তান হওয়ার পরও অনেকদিন কেউ কল্পনা করতে পারেনি।

ইংরেজ রাজত্বের শেষলগ্ন পর্যন্তও এখানে মুসলমানেরা একেবারেই একটি অপাংক্তেয় জাতি ছিল। আজ থেকে ষাট পঁয়ষট্টি বছর আগেও নাটোর শহরের কিছু কিছু রাস্তা দিয়ে মুসলমানদের জুতা পায়ে আর মাথায় ছাতা ধরে হাঁটার সাধ্য ছিল না। তাহলে তাকে ধরে গরু পেটা পেটানো হতো। একটি কথা আমার আজও মনে আছে। আমি তখন সবে ক্লাশ থ্রিতে উঠেছি। তখন গ্রামের বড়দের সাথে প্রথম নাটোর শহরে আসি শহরের ছাত্র লাইব্রেরী নামক তৎকালের এক বইয়ের দোকানে বই কিনতে। আমার আজও মনে পড়ে, শহরের শকুলপট্রি রাস্তায় এসে আমি যাদের সাথে এসেছিলাম তাদের সকলের সে কি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থা! রাস্তার দু'পাশে শুকুলদের বাড়ি। এই রাস্তায় আসা মাত্র আমার সঙ্গের সকলেই পায়ের টায়ারের স্যান্ডেল আর মাথার ছাতি গুটিয়ে বগলে নিয়ে কি ভয়ে ভয়ে সেই রাস্তা অতিক্রম করেছিল আর তাদের দেখাদেখি আমিও করেছিলাম। সে দৃশ্য আজও আমার স্মৃতিপটে ভাস্বর হয়ে আছে।

আমার ছেলেবেলায় এই ছিল আমার এলাকার মুসলমানদের অবস্থা। সুতরাং আমার ছেলে বেলায় মুসলমানদের এই ঈদ উৎসব যে কতটা প্রাণহীন আর ম্রিয়মাণ ছিল, তা একটু চিন্তা করলেই উপলব্ধি করা যায়। ঈদের দিনটি কোনদিক দিয়ে আসতো আর কোনদিক দিয়ে যেতো আমরা ছেলেরা তা তেমন একটা বুঝতেই পারতাম না। এর সাথে ছিল পরিস্থিতির প্রভাব। হিন্দু জমিদারদের শাসনাধীন এখনকার দীনদরিদ্র ও মজলুম মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ আর ইসলামী চেতনাবোধ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায়, মুসলমান নরনারীরা ছিল স্বধর্ম ও স্বকীয়তা সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। ইসলামী ধ্যান-ধারণা ছিল প্রায়ই অন্তর্হিত। ফলে, হিন্দুদের উৎসবে উৎসবমুখর হওয়া ছাড়া নিজেদের উৎসব অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অধিক সচেতন ছিল না। তৎপর ছিল না নিজেদের ধর্মীয় আচার বিধি পালনে। নামাজ রোজার সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল একান্তই ঢিলেঢালা। অনেক গাঁয়ে তখন নামাজের জন্যে কোন মসজিদও ছিল না। যে গাঁয়ে ছিল সে গাঁয়ের মসজিদে ওয়াক্তিয়া নামাজ কদাচিত হতো। জুমার নামাজেও সেসব মসজিদে পাঁচ গাঁ মিলে পনের বিশ জন লোক

জোটাই ভার ছিল। দু'চার জন শিক্ষিত মুসলমান ছাড়া নামাজের নিয়ম-কানুন, সূরা নিয়াত আর দোয়া দরূদ শতকরা প্রায় নব্বুই জন লোকই জানতো না। ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে ইমামের দেখাদেখি রুকু সেজদা করাই ছিল তাদের নামাজ পড়া। মসজিদই যে সময়ে সংখ্যায় ছিল অতি অল্প, ঈদগাহের সংখ্যা সে সময়ে আট দশ গাঁয়ের মধ্যে দু'একটির বেশি খুঁজে পাওয়া যেতো না।

এই কিসিমের সমাজে আর মুসলমানদের মধ্যে ঈদ অনুষ্ঠানটি যে আদৌ কোন স্মরণীয় অনুষ্ঠান হতে পারে না– তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। গ্রামের দু'চার জন সচেতন প্রধান মুরুব্বী আর মসজিদের ইমামগণই প্রতি গাঁয়ে মুসলমানদের মধ্যে বয়ে আনতো ঈদের বারতা আর তাঁদের নির্দেশ ও পরিচালনায় পালিত হতো ঈদ উৎসব। ঈদ উৎসব মানে, সকালবেলা দল বেঁধে ঈদের নামাজ পড়তে যাওয়া আর নামাজ পড়ে বসে গ্রাম্য প্রধানের বাহির আঙ্গিনায় তামাম বাড়ির ঈদের খানা এক গামলা করে এনে তা সবার মাঝে বিতরণ করা ও লাইন ধরে বসে তা খাওয়া। এই ঈদের খানাও ছলি একট বিশেষ পদার্থ। এর নাম ছিল পোলা (পোলাও)। আজকের মতো খাস পোলাও তথা কোর্মা পোলাও নয়। মোরগ মুরগীর মাংসের সাথে ঝাল মশলা আদা পেঁয়াজ দিয়ে খিচুরি পাকানোর মতো চাউল পাকানোকেই বলা হতো পোলা। আজ এর নাম ঝাল পোলাও। আমার বাল্যকালে আমাদের এলাকায় এটিই ছিল একমাত্র ঈদের খানা, তথা ঈদের পোলা। বাড়িতে এই পোলা পাকানো দেখেই আমরা শিশুরা বুঝতাম, আজ ঈদ। আর এই পোলাও বিতরণ ও খাওয়ার সাথেই শেষ হয়ে যেতো ঈদ উৎসব। পূজা পার্বণে মুসলমানেরা অনেকেই বাড়িতে মেয়ে জামাই ও আত্মীয়-কুটুম দাওয়াত দিয়ে আনতো। কিন্তু দুই ঈদের কোন ঈদে এমনটি দেখা যেতো কদাচিত।

তাই বলছি, কোথায় আজকের ঈদ উৎসব আর ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ আজকের মুসলিম সমাজ আর কোথায় সেদিনের তথা আমার বাল্যকালের ঈদ আর অজ্ঞ অচেতন মুসলিম সমাজ! তখনকার ঈদ স্মৃতি আমার কাছে কেবলই একটা নিষ্প্রাণ অনুষ্ঠানের অস্পষ্ট স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

তবে এই অস্পষ্ট স্মৃতির মধ্যে একটি অপ্রীতিকর ও একটি হাস্যকর ঘটনা আমার মানসপটে সেদিনের ঈদ স্মৃতিকে বেঁধে রেখেছে শক্ত করে। অপ্রীতিকর ঘটনাটি হলো– ঈদের ঐ পোলা (পোলাও) বিতরণ সংক্রান্ত তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার গাঁয়ে কয়েকবার তুমুল কলহ, আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ ও শেষমেষ গ্রাম্য দলাদলি যা আমার মনকে আজও ভারাক্রান্ত করে তোলে।

হাস্যকর ঘটনা আসলেই হাস্যকর। দূরের এক স্কুলে আমি তখন ক্লাশ সেভেনে পড়ি। জায়গীর বাড়িতে একটি ক্লাশ ফোর ও একটি ক্লাস ফাইভের ছেলেকে পড়াই। ফোরের ছেলে মজিবর রহমান আধ পাপলা। ঈদের ছুটি একদিন হওয়ায় সেবার জায়গীর বাড়িতেই ঈদ করি। বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ হয় না। ঈদগাহে নামাজ পড়তে গেলে ঐ আধপাগলা মজিবর আমার পাশে বসে। নামাজ শেষে শুরু

হয় মোনাজাত। সে এক অতিশয় দীর্ঘ মোনাজাত। অবস্থা দেখে মনে হলো, ইমাম সাহেব এই একটিবারই চান্স পেয়েছেন নিজেকে জাহির করার। 'আল্লাহুম্মা আমিন' বলতে বলতে মুকতাদিদের মুখে ফেনা উঠে গেল, তবু শেষ হয় না মোনাজাত। ক্ষেপে গেল আধপাগলা মজিবর। অবশেষে সে সশব্দে বলতে শুরু করলো 'আল্লাহুম্মা আমিন, আর পারিনে আমিন, পোলা (পোলাও) খাবো আমিন।' ক্রমেই তার কণ্ঠস্বর এত উচ্চ হতে লাগলো যে, হাসি সংবরণ করা আমার দায় হয়ে গেল। ইশারায় নিষেধ করলেও শুনে না। ভাগ্যিস এই মুহূর্তে শেষ হলো মোনাজাত। নইলে মোনাজাতের মধ্যেই বিকট শব্দে হেসে ফেলতাম আমি আর আমার নসিবে জুটতো অশেষ ভর্ৎসনা।

আজও ঈদের কথা উঠলেই আমার কানের কাছে অকস্মাৎ বেজে উঠে আধপাগলা মজিবরের সেই মোনাজাত– 'আল্লাহুম্মা আমিন, আর পারিনে আমিন, পোলাও খাবো আমিন।'

ধোলাইনামা

একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে– 'চোরে চোরে এক রাস্তা, চোরে সাধুতে দুই রাস্তা, সাধুতে সাধুতে তিন রাস্তা।' ব্যাখ্যাটাও সর্বজনবিদিত। দুই চোর দুইদিক থেকে এলে রাস্তা কেউ ছাড়বে না। উভয়ের সিনা ঘেঁষে এক রাস্তা দিয়েই চলে যাবে উভয়ে, দুই রাস্তা বানাবে না। চোর-সাধুর বেলায় চোরকে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সাধু যাবে তফাতে। দূর দিয়ে হেঁটে দুই রাস্তা বানাবে। সাধু সাধু মুখোমুখি হলে ব্যস্, আর কথা নেই। সাক্ষাৎ ভাসুর। অতএব, থাক পথ তুই মাঝখানে, পথ থেকে দুইজন দুইদিকে নেমে দুই নয়া রাস্তা বানিয়ে দূর দিয়ে চলে যাবে। এবার মাঝেরটা হিসাবে নিয়ে দেখুন, সাধুদের জন্যে তিন রাস্তা প্রয়োজন, সাধুরা এক রাস্তায় হাঁটেন না।

অর্থটা বদঅর্থে হলেও কিংবা সাধুদের সৌজন্যবোধ তুলে ধরার সৎঅর্থে হলেও, অন্তর্নিহিত অর্থটা বড় করুণ। সাধুরা সজ্জন হলেও তাঁরা এক নন, তাঁদের মধ্যে ঐক্যের বড়ই অভাব। চোরেরা দুর্জন, কিন্তু তাদের মধ্যে ঐক্যবোধ দুর্বার। মাস্‌তুতো আর পিস্‌তুতো যা-ই হোক না কেন, চোরেরা তবু একে অন্যের ভাই– বুকে বুকে মিল। আর সাধুরা? সাধুরা তার বিপরীত। সাধু মানেই বিচ্ছিন্নতা। ভাই বলা তো দূরের কথা, মুখদর্শনও পাপ। এক জায়গায় এক সাথে দুই সাধুর স্থান নেই। কাছে এলেই সংঘাত। একে অন্যের কানে-কলারে সরাসরি হস্তস্থাপন না করলেও, দুইয়ের গায়ে দুইজন এয়সা মাফিক কর্দম নিক্ষেপ করবেন যে, পাত্তারী গুটিয়ে নিয়ে একজন না একজনকে ছাড়তেই হবে এলাকা।

সাধুরা সজ্জন, কিন্তু নির্বোধ। তাঁদের ঐক্যবোধ নেই। চোরেরা অসৎ কিন্তু বুদ্ধিমান। তারা ঐক্যবদ্ধ। ফলে চোরের হাতের কিল খেয়ে চোরকে 'বাবা' বলে সাধুরাই। চোরেরা বড়জোর বউয়ের ছোট ভাইয়ের সম্বোধনটাই ছুঁড়ে মারে সাধুর দিকে। এর অতিরিক্ত মূত্রত্যাগের প্রয়োজনেও সাধুদের দিকে তারা মুখ ফেরাতে যায় না। সাধুদেরকে পায়ের ধুলো বলেও গণ্য করে না চোরেরা। 'ইত্তেফাক বড়ি কুওৎ হ্যায়', সাধুরা বুঝে না, চোরেরা বোঝে।

অতএব, ভাইও আওর বহিনো, যদি বুদ্ধিমান হতে চান, আসুন আমরা সবাই চোর হই। পিঠ বাঁচানোর প্রয়োজনে চোরের দলে ভর্তি হই। সাধু হয়ে অসাধুর ধোলাই আর অন্য সাধুর থুথু দিয়ে গা-গতরের হালতটা পাল্টে নিয়ে কাজ নেই। নির্বোধের প্রভু হওয়ার বদলে বুদ্ধিমানের নফর হওয়া হাজার গুণে বেহতর। আসুন, ইত্তেফাকের মূল্য যারা বোঝে, আমরা তাদের সাথে শামিল হই।

কি, আমার কথায় আপনি আবার নাক সিটকাচ্ছেন? সিট্‌কাবেনই তো। কারণ, আপনি একজন সাধু। অন্তত নিজেকে আপনি তাই বলে জানেন। আর তা জানেন বলেই আপনি একজন বোকা। কাঠমূর্খ। সেরেফ ব্যাকরণটাই শিখেছেন, সাঁতারটা শেখেননি। কিন্তু আপনি ছাড়া আরো কয়েক কোটি লোক আছে এই দেশে। তারা আপনার মতো বোকাও নয়, আমার ডাকের অপেক্ষায় বসেও নেই। বাস্তবটা তারা বুঝেছে। বাস্তবটা এস্তেমাল করে যেদিকে ইত্তেফাক, তারা সেইদিকে ছুটছে। আপনার দলে থেকে কেউ একা পড়তেও রাজী নয় আর আপনার ছোড়া থুথু ও জোটওয়ালাদের কিল খেতেও চায় না।

ওব্বাবা! এদিকে আবার আপনি যে চোখ রাঙাচ্ছেন বড়? আপনি কে? ও, আপনি একজন মহৎপুরুষ। গুণী? আলেম-দরবেশ মানুষ? যান যান, শিগ্‌গির তাহলে সুন্দরবনের এক কোণে গিয়ে আস্তানা পেতে বসুন গে। এই জনসমাজে থেকে খামাখা ধোলাই হবেন কেন? এত নির্গুণের ভিড়ের মধ্যে বাঁচতে পারেন একা একা?

কি বললেন? একা নন? আপনার মতো অনেক আলেম বুজুর্গ মানুষ এই মুলুকে আছে? আছে তো কি হয়েছে? বসে বসে ধুমছে কচুপোড়া খান গে। অন্ন পেটে থাক না থাক, কচুর পি- কিছুটা পাকস্থলীতে থাকলেও বে-এলেম বদলোকের পিটুনি আপনার মতো এলেমদারের পিঠ মিনিট কয়েক সামলে নিতে পারবে। কেউ তারা আসবে না। অন্য কোন আলেম উলেমাই আপনার পিটন ঠেকাতে আসবে না। আপনারা গুণী হলে কি হবে, মন আপনাদের জটিল। কুটিলও বলা যায়। ঐ যে কথায় বলে, 'নানা মুনির নানা মত?' হক কথা। আপনাদের নেই মতের মিল। মনের মিল তো নেই-ই। প্রত্যেকেই নিজেকে বড় আলেম মনে করলে মিলটা আর হয় কি করে! এ কারণে এক মুনি আর এক মুনির দুশমন। আপনার পিঠে কিল পড়ছে দেখে অন্য মুনি তো দাঁত মেলে হাসবেই। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খেলে ষাঁড় কি কখনোও মূর্ছা যায়?

আপনাকেও চিনেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাকেও, আপনাকেও। আপনি সিরাতুল মুস্তাকিমের পথচারী। আরে হ্যাঁ, সে তো জানিই। আপনি যে শুধু ঐটুকুই নন, তা কি আর জানিনে? আপনি তৌহিদের সৈনিক। আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এ বিশ্বাসী এক নির্ভীক সেপাই, সঠিক পথের হদিস পাওয়া লোক– তা আগেই শুনেছি। ওটাও- ওটাও। পথভ্রষ্টদের পরিণাম চিন্তা করে কলেজা আপনার জার জার– ওটাও বুঝি। কিন্তু ভাই সাহেব, আপনার নিজের পরিণামটা কি ভেবে দেখেছেন কখনোও? 'ওয়া ফিল আখেরাতে হাস্নাতাঁও'-এর আগে 'ফিদ্দুনিয়া হাস্নাতাঁও' তো ওয়াক্তে ওয়াক্তে বলেন। বলেন না? সেই দুনিয়ার ভালাইটার কথা একবারও ভাবেন কি? আপনার সমাজ ও পরিবেশের ভালাই?

কি বললেন? এ দুনিয়াটা কিছুই নয়? ফালতু? তাহলে আর এই দুনিয়াতে আছেন কেন, আর এর 'বদবু' নিচ্ছেন কেন? যান যান, তল্পীতল্পা গুটিয়ে নিয়ে আখেরাতের দিকে সত্বর যাত্রা করুন। খামাখা পথভ্রষ্টদের প্যাঁদানী খেয়ে জানটা কালো করবেন

কেন? কেটে পড়ুন।

হে হে হে...! পথভ্রষ্টদের নসিহত করার খাহেশে এখানে থাকতে চান? কি যে বলেন জনাব! শরমে মরে যাই আর কি? আপনার নসিহত মানবে কোন মূর্খ? নিজেদের মধ্যে একের প্রতি অন্যে আপনারা যেহারে থুথুর তুফান তুলেছেন, তা দেখতে পাচ্ছে না কেটা? এত থুথু জমা আছে যে মুখে, সে মুখের নসিহত আসর করবে কার উপর? একে অন্যের দোষ ধরেই তো নিজেরা আপনারা মরছেন। অপরদিকে দেখুন, ফাঁকে আছে বলে পথভ্রষ্টদের টিকির নাগালও পাচ্ছেন না আপনি। আপনার নসিহত শুনে আপনার কাছে এলেই তো আপনি শুরু করবেন ধোলাই। থুথু মেরে তামাম গায়ে ফেনা তুলে দেবেন। আপনাদের এই বিভাজনের মধ্যে তারা আসতে যাবে কোন দুঃখে! পথভ্রষ্টরা যত নিগুর্ণই হোক, একতার মূল্য ওরা বুঝেছে। আপনাদের মতো একদল আর একদলকে কামড়িয়ে জুদা করে দিচ্ছে না। বরং একজোট হয়ে ওরাই আপনাদের ইক্ষুখাওয়া পিটুনি পিটে হাতের সুখ করে নিচ্ছে। ভবিষ্যতে আরো নেবে। কি বললেন? ইক্ষু খাওয়া পিটুনিটাও বুঝলেন না? একজন তিনজনকে 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল' পলিসিতে ধরে ধরে ছ্যাঁচানি দেয়া। সিকি হয়ে বারো আনাকে ধোলাই।

হাঃ হাঃ হাঃ! আপনার কথা শুনে আর বাঁচিনে মিয়া ভাই। ওরা সিকিরও কম আর আপনারা বারো আনারও বেশি! দাঁড়ান দাঁড়ান। হাসতে হাসতে নারীতে আমার ব্যথা ধরে গেছে। একটু জিরিয়ে নিই। আরে ভাইসাব, গণনাতে আপনারা বারো আনাই হোন আর বত্রিশ আনাই হোন, আসলে আপনি যে একা সেই একাই। আপনাকে ধোলাই করতে পথভ্রষ্টদের কয়েকজন টি.বি.র রুগীই যথেষ্ট। গোটা দলের দরকার নেই।

আরে মুস্কিল! কেন একা– এটা আপনি বোঝেন না? আপনাদের আক্কেলগুণে। এক ভাই হরদম ল্যাং মারছেন আর এক ভাইকে। আপনাকে কেউ ল্যাং মারলে, সে ভাই আপনার পাশে আসতে যাবে কোন পুলকে?

আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝলাম তো। দীন বিপন্ন হলে দীনের খাদেমরা রুখে একবার দাঁড়াবেনই। কামিয়াব হয়তো তারা হবেনও একদিন। 'ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালাকি বাদ'– এ বুলি তো কম শুনিনে আপনাদের মুখে? কিন্তু ভাই সাহেব! তার আগে অনেক পানি গড়িয়ে যাবে ফোরাতের বুক বেয়ে। অনেক ঠ্যাঙ্গানী আর ছ্যাঁচানী খাবেন আপনারা তার আগেই। ঘটে আপনাদের এতটুকু হুঁশবুদ্ধি থাকতো যদি, তা হলে অনায়াসেই সেই জিল্লতিটা এড়িয়ে যেতে পারতেন।

কি বললেন? হুঁশবুদ্ধির দরকার কি? ঈমানের জোরই বড় জোর? কিন্তু হুঁশবুদ্ধি না থাকলে সেই ঈমানের জোরটা যে কোত্থেকে আসে, তা তো বুঝিনে। তাছাড়া সেই ঈমানটাই যে আপনাদের দস্তর মতো নড়বড়ে। ঈমান মজবুত হলে কি ভাইয়ে ভাইয়ে কোন্দল করেন আপনারা? আপনাদের বিপদকালে দীনের খাদেমেরা রুখে দাঁড়াবেন নির্ঘাৎ। তবে ঈমান নড়বড়ে বলে এক সাথে দাঁড়াবেন না। যার ঘাড়ে

যখন দুরমশ্ এসে পড়বে, তিনি তখন দাঁড়িয়ে গিয়ে লাফালাফি করবেন খানিক। এরপর, কারো কোন সাহায্য না আসায় মুগুরের পর মুগুর খেয়ে ঠ্যাং তুলে পড়ে যাবেন। অন্য সব খাদেমেরা তার মদদে আসবেন কখন? তারা তো তখনও একে অন্যের গায়ে থুথু মেরে মেরে নিজেরাই চুলোচুলি করতে থাকবেন। বিপন্নের দিকে তাকানোর সময় কোথায় তাদের?

এই দেখুন! এই হলো আপনাদের নিয়ে মুশকিল। এরপরও হাদীস আউড়িয়ে চললেন? চোখ কানটা তবুও বাইরের দিকে দেবেন না? চেয়ে দেখুন তো একবার বাইরের দিকে। এতটুকু মিল আছে আপনাদের মধ্যে, না ইত্তেফাকের মূল্যবোধ কারো মধ্যে আছে কিছু? সবাই আপনারা আল্লাহ তায়ালার কাছে আত্মসমর্পণ করা লোক। তাঁর কিতাবে বিশ্বাসী আর তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল লোক। মূলে আপনারা এক। অথচ সামান্য কিছু ফিৎনা ফিকাহর হেরফের নিয়ে আপনারা শতদলে বিভক্ত। একের মুখে অন্যে আপনারা ময়লা ছুঁড়তে ব্যস্ত। আপনাদের কমন শত্রুরা আপনাদের মাথার উপর বাঁশ তুলেছে যখন, তখনও আপনারা বাঁশ ঠেকাতে না গিয়ে নিজেদের মধ্যে কে ক'ইঞ্চি দীন থেকে দূরে গেছে, এই জেহাদেই পেরেশান। শত্রু যখন কমন, পিটবে যখন সবাইকেই, তখনও কি আপনারা ভেতরের ঐ ক্ষুদে দ্বন্দ্বটুকু ভুলে গিয়ে বৃহৎ স্বার্থের খাতিরে এক কাতারে সামিল হতে পারেন না? কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে রুখে দাঁড়াতে পারেন না দীন ও কওমের দুশমনের বিরুদ্ধে?

সেইটে আগে করুন। কওমকে আগে রক্ষে করে এসে পরে আপনারা নিজেদের দ্বন্দ্ব মিটমাট করুন বসে বসে। পৃথক অন্নে থাকতে চান, থাকুন। কিন্তু বাইরের হামলা ঘরে এলে সব ভাইয়েরা এক সাথে লাঠি হাতে বেরিয়ে আসবেন না কেন? ওহ্! সত্যের পথের সৈনিক, কওমের খাদেম, কি খামশাই না বুলি আপনাদের? একটু দাঁড়ান! পিটনের চোটে বুলি আপনাদের ক্যামনে ছুটে যায়, একবার যেমন কিছুটা টের পেয়েছেন তার চেয়েও অচিরেই অনেক বেশি টের পাবেন।

কি বললেন? আপনাদের অমুক গোত্র দীনকে খাটো করেছে? অমুক গোত্র কাফের হয়ে গেছে? অমুক বেদাতীতে নেমেছে? আরে ভাই, এতক্ষণ তাহলে বললাম কি? সে বিবেচনায় পরেও তো বসা যায়। আর না হোক, এটা তো আপনি কখনোও বলতে পারেন না যে, অমুক গোত্র আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের পরিবর্তে শিব ঠাকুরের পূজো করতে শুরু করেছে। টুপি আলখেল্লা খুলে ক্রুশ-পৈতা-নামাবলী ঝুলিয়েছে, মসজিদে যাওয়ার বদলে খোল-করতাল নিয়ে নাম-কীর্তনে নেমেছে? তা যখন পারেন না, তখন আপনারা কাঁধে কাঁধ মেলাতে অক্ষম কেন? আপনারা নাস্তিক হয়েও যাননি, কাদিয়ানীও হননি। ঐ যে বললাম, মূলে আপনারা ঠিক আছেন। তবু এত দ্বন্দ্ব কেন? ধাপ ফেলতে কারো কিছুটা কম বেশি হয়তো হচ্ছে। তাতে কি হয়েছে? আল্লাহ রাসূল (সা.)-এর নামটাই যারা মুছে ফেলতে উদ্যত, মঙ্গলদ্বীপ জ্বালিয়ে খোল-করতাল বাজিয়ে আপনাদের মাঝে যারা পৌত্তলিকতা প্রতিষ্ঠা করতে

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, একজোট হয়ে তাদের ঠেকাবেন আগে, না সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে জান কোরবান করতে যাবেন আগে?

কি হলো? ঐ ত্রুটি-বিচ্যুতিওয়ালারা মুসলমানই নয়? ওরাও তো আপনাদের ঐ রকমই কতকগুলো দোষত্রুটি ধরে? ওদের কাছে আপনারাও তো তাহলে মুসলমানই নন। তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, একে আপনারা অন্যের কাছে মুসলমানই নন। সুতরাং এই ফালতু ইস্যু নিয়েই কি আপনারা কামড়া কামড়ি করবেন হরওয়াক্ত? 'নারায়ে তকবির– আল্লাহু আকবার' হাঁক দিয়ে কি এখনও আপনারা এক প্ল্যাটফরমে দাঁড়াবেন না?

তবু বলছেন, কেবল আপনারা সহি আর সবাই বাতিল? থাকেন থাকেন, নিজেদের মধ্যে ঐ জেহাদ নিয়ে এখনও আপনারা জুদা হয়েই থাকেন! মুগুর-ছেঁচা হওয়া থেকে কারো আপনাদের রেহাই নেই, এটা ঠিক জানবেন। একজোট হতে শেখেননি, অথচ ইত্তেফাক আর ঈমানের কথা বলেন? ছোঃ! www.boighar.com

হ্যাঁ হ্যাঁ, ছ্যাঁচানী ওরা দেবেই আপনাদের। দেখতে পাচ্ছেন না– ভেতরে ওদের কত বিভেদ কত জাতিভেদ, কত গোত্রভেদ, কত ছুৎমার্গ, আচারে অনুষ্ঠানে সবাই ওরা কত পৃথক? কত উঁচু কত নিচু জনে জনে ওরা? তবু দেখুন, আপনাদের বিরুদ্ধে জেহাদের বেলায় সবাই ওরা একজোট। শুধু কি ওরাই? আল্লাহ-রাসূল (সা.)-এর নামে যাদের গা জ্বলে তারাও ওদের সাথে একজোট। এক ধর্মে থেকে আপনারা আপনাদের নিজেদের বিরোধ মিটিয়ে নিতে পারেন না, আর ওরা? ধর্মটা গোটাই বদল করে ফেললেও, বৌদ্ধ খৃষ্টান ইহুদিতে রূপান্তরিত হলেও, আপনাদের বিরুদ্ধে জেহাদের ক্ষেত্রে সবাই ওরা ভাই ভাই, একমত একজোট। গোলমাল ওদের যতই থাক ভেতরে, আপনাকে ঠ্যাঙ্গানোর বেলায় ওরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের আপনজন। এক কাতারে দাঁড়িয়ে আপনাদের পশ্চাৎ-ভাগে বংশদ- তাক করার সময় ওরা অন্তর্দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে।

আর কি শুধু এখানে আর এই দেশেই? বিদেশেও আপনাদের ঐ একই অবস্থা। দুনিয়ার তামাম জাতি ভাই হয়ে বাঁশ দিচ্ছে আপনাদের আর আপনারা ক্ষুদ্র স্বার্থে আর ক্ষুদ্র প্রশ্নে নিজেরাই লড়াই করে ঠ্যাং ভাঙ্গছেন নিজেদের। এক কাতারে কখনো আপনারা দাঁড়াচ্ছেন না বা দাঁড়ানোর গরজটাও উপলব্ধি করছেন না। আপনারা ধোলাই হবেন নাতো হবে কি ঐ মামদো মিয়ার বেগমটা?

তামাশা কত? এরপরও নিজেকে আলোর পথের যাত্রী আর সিরাতুল মুস্তাকিমের পথিক ভেবে খোঁড়া ঈমানের ঘোড়ায় চড়ে পাগলা হয়ে লাফাচ্ছেন হুরী আর সরাবন তহুরার উম্মিদে। হুরী পাওয়া তো পরের কথা, আপনার হাড় ক'খানাই গোর পায় কিনা সেই খেয়ালটাই করুন আগে।

অবশেষে

"ছয় মাসের রাহাগুনি, ছয়রোজ রাতোদিনি
গেল মদ্দ টংগীর শহর–
শহরের বিগেচিয়া, ঘোড়া হতে উতারিয়া,
খোলে মদ্দ আপন কোমর॥
ঘোড়া মাঠে চরে খায়, হানিফা বাজারে যায়,
খায় মদ্দ রুটি ও কাবাব–"

–আরে ছোঃ–ছোঃ! কি আমার মদ্দ আর কি তার খাবার! চামচিকে– চামচিকে, বিলকুল চামচিকে।

বাধা পড়লো মনির হোসেনের কথায়। সুর করে পুঁথির কথা আওড়াতে আওড়াতে সে পথ বেয়ে যাচ্ছিল। মোমেনাদের আঙ্গিনার পাশ দিয়ে পথ। আঙ্গিনা থেকে ছোঃ–ছোঃ করে উঠলো মোমেনা খাতুন। থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে মনির হোসেন প্রশ্ন করলো– কি বললে?

মোমেনা খাতুন তাচ্ছিল্যের সাথে বললো– আহারে, মদ্দের কথা নিয়ে কি বাহাদুরী! মেয়ের কাছে মদ্দ যে সেরেফ একটা তেলাপোকা, সে খবরটা রাখো?

: তেলাপোকা!

মোমেনা খাতুন সঙ্গে সঙ্গে সুর করে আওড়ালো–

"(আর) দুধে জলে তিরিশ মণ করিয়া জল পান,
আশি মণ খানা খায় বিবি সোনাভান।"

এরপরে বললো– তোমার ঐ রুটি-খেকো মদ্দের কোন পাত্তা আছে এমন মেয়ের কাছে? কাছে গেলে তেলাপোকার মতোই পিষে মারবে না পায়ের তলে?

: পিষে মারবে?

: তবে কি সোহাগ করবে কোলে নিয়ে?

–বলেই মোমেনা ফের সুর করে আওড়ালো–

"(আর) শিঙার করিয়া বিবি বাঁয়ে বাঁধে খোঁপা,
খোঁপার উপর তুলে দিলো গন্ধলাল চাঁপা।"

এরপর বললো– এমন মেয়ে তোমার ঐ দু'খানা রুটি খেকো মদ্দকে পছন্দ করবে, না পাত্তা দেবে কিছু? সামনে গেলেই থাপ্পড় মেরে শুইয়ে দেবে মাটিতে।

তা বটে। হানিফ মিয়া বলেই এমন মেয়ের পাত্তা পেতে চায় আর তাকে শাদি করতে আসে। আমি হলে, যত শিঙারই করুক আর যত আলতাই মাখুক, অমন মেয়ের দিকে ফিরেও চাইতাম না।

: ফিরেও চাইতে না?

কখ্খনো না। মামদো মিয়ারা ছাড়া এমন মেয়েকে শাদি করার খাহেশ কোন মানুষের হতে পারে না কখনো।

: কেন, পারে না কেন?

: আরে, তিরিশ মণ আর আশি মণ– মানে প্রায় সোয়াশো মণ মাল না হলে যে পেট ভরে না, সেটা তো পেট নয়, আস্ত একটা গোডাউন। আর গোডাউন মার্কা পেট একমাত্র পেতনীদেরই হতে পারে, মানুষের হতে পারে না। ভূত-পেত্নীদের পেট গুদামমার্কা গোলামার্কা– সব রকমই হয়। এবার বোঝো, মামদো মিয়ারা ছাড়া এমন মামদো পেতনীর দিকে মানুষ কি কখনো ছুটে?

: তা হলে তোমার ঐ হানিফ মদ্দই বা ছুটে কেন?

মূলোর মত দাঁত থাকে তো পেত্নীদের। হানিফ মদ্দ চায়, ঐ মূলো দাঁত ভেঙ্গে তার দর্প চূর্ণ করতে।

: তাহলে আবার শাদি করার খাহেশ কেন?

নইলে ঘরে নেবে কি করে? চুল ধরে নিয়ে গিয়ে পা টিপে নেবে বলেই শাদি করতে চায়। পিরিত করার জন্যে নয়।

মোমেনা খাতুন ফুঁশে উঠে বললো– ইহ্ঃ! চুল ধরলেই হলো? মেয়ের চুলে হাত দেয়ার সাধ্যি আছে মরদের?

সাধ্যি আছে কি না, শাদিটা আগে হোক, তখন বুঝতে পারবে– চুল ধরে কেমন হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায়।

ঘর থেকে মোমেনার মা হাঁক দিয়ে বললো– শাদি করার পর চুল ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছে।

আগুনের ছ্যাঁকা লাগলো মোমেনার মায়ের গায়ে। বাঘিনীর মতো গর্জে উঠে বললো– কি এতটা? ছোট মুখে এতবড় কথা? ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার ঐ ফকিরের বেটা ফকিরের মুখে।

একই গায়ে লাগালাগি বাড়ি। মীর্জা আর মুনশী পরিবার বসত করে পাশাপাশি। কিন্তু সম্পর্ক তাদের সাপে-নেউলে। আজকেই কেবল নয়, শতাধিক বছর ধরে দুশমনি চলে আসছে দুই পরিবারের মধ্যে। দুইয়ের অবস্থাই যথেষ্ট ভাল ছিল

এককালে। অঢেল জোত-ভূঁই আর বিষয় বিত্ত। এতে করে কে কার বড়– এই প্রতিযোগিতা চলে আসছে সুদীর্ঘ কাল ধরে। নিজেকে উচ্চ আর অপরকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করতে সুদূর অতীত থেকেই মহাব্যস্ত দুই পরিবার। মুনশীর ক্ষেতে দুই লাঙ্গল চলতে দেখলে, মীর্জারা চালায় তিন লাঙ্গল। মুনশীরা তিনে গেলে মীর্জারা যায় চারে। মুনশীরা ডিঙ্গি নাও বাঁধলে মীর্জারা বাঁধে ছিপ, মুনশীরা ছিপ বাঁধলে মীর্জারা বাঁধে পানসী নাও। মীর্জারা ঘরে টালী দিলে, মুনশীরা দেয় টিন। মীর্জারা টিন দিলে, মুনশীরা আনে ইট। ঈদ পরব আর অনুষ্ঠানেও সমানে চলে এই বাহাস। এরা ছাগল কোরবানী দিলে, ওরা দেয় গরু। ওরা গরু কোরবানী দিলে, এরা দেয় মহিষ। এরা মহিষ দিলে, ওরা খোঁজে উট। কেহ নাহি হারে, কেহ নাহি জিনে।

দিনে দিনে গত হয়েছে অনেকদিন। কালক্রমে পড়ে গেছে দুই পক্ষেরই বাহার। ফৌৎ পড়েছে দু'দিকেরই ধনবল আর জনবলে। জিদ বহাল রাখতে গিয়ে মাঠের জমি বিঘে কয়েকে ঠেকেছে। ঘরের চালে খড় উঠেছে দুই বাড়িতেই। তবু বাহাদুরী কমেনি তাদের একবিন্দুও। বিত্তের জোর না থাকলেও, বাক্যের জোর সমানই আছে দুইদিকে। মুখের জোরে মান বাড়াতে কম যায় না কেউই। অন্তত বছর দশেক আগেও এ ব্যাপারে এদের কাউকেই কম দেখেনি কোন লোক।

ইদানীং হাল ছেড়েছে এক পক্ষ। বছর দশেক হলো, মুনশী পরিবারের মধ্যে একটা মস্তবড় পরিবর্তন লক্ষ করছে গাঁয়ের মানুষ। দুই পরিবারই আকারে ছোট হয়ে এসেছে। কর্তা-গিন্নী আর এক সন্তান নিয়ে দুই পরিবারই মূলত তিন সদস্যের পরিবার। পিতার মৃত্যুর পর মকবুল হোসেন মুনশী পরিবারের কর্তা হওয়ার পর থেকেই মুনশী পরিবারের মধ্যে এই পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। মকবুল হোসেন মুনশী স্বভাবতই একজন শান্তশিষ্ট ধীরস্থির ও বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি ভেবে দেখেছেন, মুখের জোরে কেউ কোনদিন বড় হতে পারে না। সেজন্যে চাই গুণগত অর্জন। মান সম্মান অর্জন না করলে, জোর করে মানী হওয়া যায় না। সে কারণেই ঐ ফালতু প্রতিযোগিতা ছেড়ে দিয়েছেন মকবুল হোসেন মুনশী। নীরব হয়ে গেছেন তিনি। জোর করে বড় হওয়া ছেড়ে দিয়ে মন দিয়েছেন সত্যিকারের বড় হওয়ার দিকে। নীরবে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধনকল্পে। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন একমাত্র সন্তান মনির হোসেন মনিরকে লেখাপড়া শিখিয়ে মস্তবড় বিদ্বান করে তুলতে। ঘরে সম্পদ আর পেটে বিদ্যা থাকলে, মীর্জারা কোন ছাড়, দেশের সবাই তাঁদের সম্মান দেবে বড় বলে– এই হলো মকবুল মুনশীর চিন্তা-ভাবনা। অন্য কথায়, ঠাণ্ডা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন মকবুল হোসেন মুনশী।

অপরদিকে, পূর্বাপর সমানে তপ্ত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে মীর্জা পরিবার। এক্ষণে মকবুল হোসেন মুনশী ঠাণ্ডা মেরে যাওয়ায়, মীর্জা পরিবারের বর্তমান কর্তা নসর আলী মীর্জা হাত পা ছুড়ছেন আনন্দে। মুনশী পরিবারের এই নেতিয়ে পড়া ভাবটার

বইঘর ও বিএবিডি
প্রতি ইংগিত করে, মুনশী পরিবারের তুচ্ছত্ব আর নিজ পরিবারের শ্রেষ্ঠত্ব সবার মাঝে সরবে গেয়ে বেড়াচ্ছেন নসর মীর্জা। বলছেন– 'আরে, কোথায় নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ আর কোথায় দর্জি অহিরুল্লাহ! মীর্জাদের সাথে পাল্লা দিবি মুনশীরা, তোরা? মীর্জা পরিবারের পয়জার বহন করার যোগ্যতাও যে পরিবারের নেই, সেই পরিবার নিজেদের মীর্জা পরিবারের সমকক্ষ ভাবে– হেসে আর বাঁচিনে।' নসর মীর্জা বলে আর হাসে।

পৌষেই প্রাণ বাঁচে না, তার উপর ফের মাঘ। ঠ্যালা সামলায় কে? নিজেদের আশরাফ আর মুনশীদের আতরাফ প্রতিপন্ন করতে নসর মীর্জার পাশাপাশি আরো অধিক সোচ্চার নসর মীর্জার স্ত্রী মছিরন নেছা বিবি। তার দম্ভ-দাপটে দশদিক কম্পমান। অন্য প্রতিবেশীরা এতে মুখ টিপে হাসে। যেহেতু এই দুই পরিবারই গাঁয়ের পুরাতন মানী পরিবার, তাই মুখ ফুটে কেউ কিছু বলে না।

মনির হোসেন ও মোমেনা খাতুন যথাক্রমে মুনশী ও মীর্জা পরিবারের ছেলে ও মেয়ে। মনির হোসেন মকবুল মুনশীর পুত্র, মোমেনা খাতুন নসর মীর্জার কন্যা। কিশোর কিশোরী দু'জন। মনির হোসেন অষ্টম আর মোমেনা খাতুন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। মোমেনা খাতুনের স্কুলে পড়া আর জঙ্গনামা পুঁথি পড়া– এই দুই-ই নসর মীর্জার বাহাসের ফসল। নইলে, মেয়েদের তো দূরের কথা, ছেলেদেরও লেখাপড়া শেখানোর দিকে নজর দুই পরিবারেরই কোন দিন বড় একটা ছিল না। মকবুল মুনশী ছেলেকে স্কুলে দিলেন দেখে, খাটো হওয়ার আশংকায়, নসর মীর্জাও স্কুলে দিলেন তাঁর মেয়েকে। মনির হোসেন সুর করে জঙ্গনামা পুঁথি পড়ে আর পড়শীরা তা শুনতে আসে দেখে, নসর মীর্জা তাঁর মেয়েকেও জঙ্গনামা পুঁথি কিনে দিলেন। মনির-মোমেনা দু'জনই খুব মেধাবী ছাত্র। কেউ শুনতে আসুক আর না আসুক, পড়ে পড়ে মোমেনাও পুঁথির অনেকাংশ কণ্ঠস্থ করে ফেলেছে। পিতা-মাতার দেখাদেখি মুনশীদের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব অনেকটা অজ্ঞাতেই মোমেনার মনেও সংক্রমিত হয়েছে। তাই মনির হোসেনকে পুঁথি আওড়াতে দেখেই সে আজ পুঁথির ভাষায় মনিরকে তাচ্ছিল্য করতে এলো। পুঁথির নায়িকা সোনাভানের পক্ষ নিয়ে আক্রমণ করলো মনিরকে। আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ কিছুদূর এগুতেই 'ঝাঁটা মার– ঝাঁটা মার' বলে ছুটে এলো মোমেনার মা। মনির হোসেন তা দেখে সরে গেল নীরবে। মায়ের এই আকস্মিক হুংকারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো মোমেনা খাতুন।

গড়িয়ে চললো দিন। দিন গড়ানোর সাথে সাথে প্রকৃতির চিরন্তন গতি সঠিক পথে এগিয়ে চললো আপন মহিমায়। ছেলে মেয়ে দু'জনই মেধাবী। চেহারাও দু'জনেরই চিত্তাকর্ষক। এর সাথে পাশাপাশি বসত। সম্ভাব্য ফলাফল ভিন্ন হওয়ার কথা নয় আর তা হলোও না কালক্রমে। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা নিয়ে কিশোর-কিশোরী দু'জন

বইঘর ও বিএবিডি
একে অন্যের মুখোমুখি হতে লাগলো অহরহ। চলতে লাগলো বাকযুদ্ধ ও কলহ। বয়স যতই বাড়তে লাগলো কলহ করার উসিলায় একে অন্যের সান্নিধ্যে আসার টান বাড়তে লাগলো ততই। দিনে দিনে রাগের অন্তরালে উভয়ের অন্তরেই সৃষ্টি হলো অনুরাগ। এবং অবশেষে একদিনের অদর্শনে প্রাণ হলো পেরেশান।

মনির হোসেন বিদ্যালয়ে শ্রেণীর পর শ্রেণী ডিঙ্গিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু অল্পদিনেই বন্ধ হলো মোমেনার পড়াশুনা।

নিকটে কোন হাইস্কুল না থাকায় প্রাইমারীর পর ঘরে এসে বসতে হলো মোমেনাকে। অবশ্য সে জন্যে মোমেনার মনে অধিক দুঃখ রইলো না। হাইস্কুলের বই তাকে গোপনে যোগান দিলো মনির হোসেন। গোপনে তাকে তালিম দেয়ার আশ্বাসও দিলো সে। প্রাইভেটে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়ার নিয়ত নিয়ে পড়াশুনা শুরু করলো মোমেনা।

নসর মীর্জার এসব ধান্দা ছিল না। দুঃখিতও ছিলেন না তিনি মোমেনার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হওয়ার কারণে। অর্থাভাবে মনিরকে ও দু'দিন পরেই স্কুল ছাড়তে হবে– এই ছিল তাঁর দৃঢ় ধারণা আর প্রগাঢ় সান্ত্বনা। দেখে শুনে মস্ত এক খানদানী ঘরে মোমেনার শাদি দিয়ে মকবুল মুনশীর উপর টেক্কা মারবেন তিনি– এই আনন্দেই বিভোর হয়ে রইলেন।

কিন্তু অর্থাভাবে মনির হোসেনের লেখাপড়া আটকালো না। মকবুল মুনশীর ঐকান্তিক চেষ্টায় তাঁর সাংসারিক অবস্থার উন্নতি ঘটতে লাগলো শনৈঃ শনৈঃ। সেই সাথে প্রতিটি পরীক্ষায় মোটা অংকের বৃত্তি পাওয়ায়, মনির হোসেনের লেখাপড়া এগিয়ে চললো পূর্ণমাত্রায়। দেখতে দেখতে সে বিএসসি ক্লাশে উঠে গেল। মোমেনার পড়াশুনাও দ্রুত গতিতে এগোচ্ছিল। আর একটা বছর এগোলে, মাধ্যমিক পরীক্ষা সে অনায়াসেই পাশ করতে পারতো। কিন্তু বাদ সাধলেন তার বাপ। মনির হোসেনের চেষ্টাতেই মোমেনার এই পড়াশুনা চলছে– এটা সঠিকভাবে বুঝতে পারা মাত্রই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো নসর মীর্জার মাথায়। মুনশী পরিবারের সাহায্য মীর্জা পরিবার গ্রহণ করছে– মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার চেয়েও মস্তবড় দুর্ঘটনা এটা। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে তিনি ঘরের মধ্যে আটক করে ফেললেন। বই-পুস্তক ফেলে দিলেন দরিয়ায়।

মনির হোসেন যতই উপর ক্লাশে উঠতে লাগলো, ততই ব্যস্তভাবে খানদানী ঘর খুঁজতে লাগলেন নসর মীর্জা। মীর্জা পরিবারের ডাকহাঁকের সাথে পাত্রীর রূপের কথা শুনে সম্বন্ধও আসতে লাগলো নানা স্থান থেকে। দলে দলে লোক আসতে লাগলো কনে দেখার জন্যে। নসর মীর্জাও খাশি জবাই করে করে আপ্যায়ন করতে লাগলেন তাদের। এতে করে মাঠের অবশিষ্ট জমিটুকুও ফুরিয়ে আসতে লাগলো। কিন্তু সম্পর্ক একটাও পাকাপোক্ত হলো না। ঘর বর দেখে দেখে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে লাগলেন তিনি। গাঁয়ের লোকদের বিশেষ করে মকবুল মুনশীকে চমকিয়ে

দেয়ার মতো একটা ঘরও পেলেন না।

যেতে লাগলো সময়। বাড়তে লাগলো মেয়ের বয়স। পাঁচজনে পাঁচকথা বলতে শুরু করলো। ইতিমধ্যেই মনির হোসেন দুর্দান্ত কৃতিত্বের সাথে বিএসসি পাশ করে ফিরে এলো গাঁয়ে। ডিস্টিংকশান পেয়েছে সে। পাড়াগাঁয়ে যেমন তেমন একজন গ্র্যাজুয়েটই যে যুগে খুঁজে পাওয়া যায় না, সেই যুগে ডিস্টিংকশান মানে একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। দলে দলে লোক আসতে লাগলো মনির হোসেনকে দেখতে। পুত্রের সাথে পিতাকেও ধন্য ধন্য করতে লাগলো সবাই। তীরবদ্ধ হতে লাগলো নসর মীর্জার বুক।

ক্ষ্যাপাকে আরো ক্ষেপিয়ে দেয়া লোকের অভাব নেই দেশে। জনৈক চুগোলখোর এসে নসর মীর্জাকে বললো– খানদানী ঘর দিয়ে আর মুনশীদের সামাল দিতে পারবেন না মীর্জা সাহেব। এখন প্রয়োজন উচ্চ শিক্ষিত বর। আরো অধিক বিদ্বান বর এনে শাদি দিন মেয়ের, মুনশীদের থোতা মুখ ভোতা হয়ে যাবে।

কথাটা মনে ধরলো মীর্জার। তিনি উৎফুল্লকণ্ঠে বললেন– ঠিক ঠিক। ঠিক কথা বলেছেন। ও বাড়ির ছেলে বিএসসি পাশ করেছে, আমি এমএসসি বর এনে শাদি দেবো মেয়ের।

খুঁজে পেতে একটা এমএসসি পাওয়া গেল সাদামাটা। বেকার বসে আছে বাড়িতে। এক্ষণে সে শাদি করতে ভীষণ আগ্রহী। যোগাযোগ করে এসেই আনন্দে নাচতে লাগলেন নসর মীর্জা। গাঁয়ের সবাইকে ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন– এমএসসি, এমএসসি। আমার মেয়ের শাদি হচ্ছে এমএসসি বরের সাথে। বিদ্যার সাগর। এমএসসির পাশে মুনশীদের ঐ বিএসসি– দরিয়ার পাশে ডোবা। হুঁ-হুঁ বাবা, মীর্জারা চিরকালই বাঘের বাচ্চা বাঘ!

www.boighar.com

বরপক্ষের লোক এলো মেয়ে দেখতে। ধরে বেঁধে মোমেনাকেও তাদের সামনে আনা হলো। মেয়ে দেখে খুশি হলো বর পক্ষ। এবার উঠলো দেনা পাওনার কথা– আর মাথাটা ঘুরে উঠলো এখানেই। নগদ চাই পঞ্চাশ হাজার টাকা। পঞ্চাশ হাজার টাকা সেলামী দিলেই সঙ্গে সঙ্গে চাকরি হবে বরের। এর সাথে চাই– মূল্যবান আসবাবপত্র দিয়ে মেয়ে-জামাইয়ের ঘর সাজানো, বর সাজানো, বিয়ের খরচ আর পাঁচজনকে দেখানোর মতো স্বর্ণালঙ্কার। এমএসসি পাশ বরের বউকে ভিখারিণীর মতো সাজিয়ে দিলে চলবে না।

কমছে কম সোয়া লাখ টাকার বায়না। মাঠের জমি প্রায় শেষ। ভিটেমাটিসহ সর্বস্ব বেচলেও তিরিশ-চল্লিশ হাজারের বেশি জুটবে না। নসর মীর্জা বরপক্ষের বিস্তর হাতে পায়ে ধরলেন। কিন্তু কাজ হলো না কিছুই। বর পক্ষ অনড় হওয়ায় ভেঙ্গে

গেল বিয়ে। ভেঙ্গে পড়লেন মীর্জা সাহেব।

বিনি পয়সায় বিদ্বান বর অভাবে নসর মীর্জা যখন দিশেহারা, সেই সময় হুজ্, বুট, প্যান্ট আর গগলস পরা এক বর সাইকেল হাঁকিয়ে হাজির হলো গাঁয়ে। ফুটবল খেলতে এসে মীর্জা সাহেবের অন্য এক প্রতিবেশীর ছেলের সাথে সেই প্রতিবেশীর বাড়িতে এসে উঠলো আর মেহমান হয়ে সেখানেই রয়ে গেল। নাম কামাল হোসেন। এক ফাঁকে মোমেনাকে দেখে মোমেনাকে শাদি করার অভিলাষে কামাল হোসেন আওয়ারা বনে গেল।

খবর শুনে ছুটে এলেন মীর্জা সাহেব। খবর নিয়ে জানলেন, কামাল হোসেন আইন পাশ, বাড়ির অবস্থা বিরাট। মস্ত মস্ত টিনের ঘর, আম-জাম-কাঁঠালের বিশাল বাগান, মাঠে জমি ষাট-সত্তর বিঘে। গাঁয়ের বাড়ি ছাড়াও তাদের শহরে আর একটা বাড়ি আছে মস্তবড়। বরের বক্তব্য– এখনই শাদি দিলে এক পয়সাও ডিম্যান্ড নেই তার। অভিভাবকদের জানালে, ডিম্যান্ডের প্রশ্ন উঠতে পারে অবশ্যই।

বর্তে গেলেন মীর্জা সাহেব। কাউকে না জানিয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি বরের গাঁয়ে গেলেন। গোপনে দেখে এলেন কামাল হোসেনের বাড়ি। কামালের বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য। বিশাল বিশাল টিনের ঘর, বাড়ির সাথে মস্ত এক ফল বাগান। লোকজনদের জিজ্ঞাসা করে জানলেন, ঐ বাড়িওয়ালার শহরেও বাড়ি আছে আর একটা। মাঠে আছে বিস্তর আবাদী জমি।

মীর্জাকে আর পায় কে? বাড়ি ফিরেই শাদির আঞ্জাম শুরু করলেন। ডিমান্ডের ভয়ে বর পক্ষের কর্তাদের টানলেন না। নিজ গাঁয়ের লোকদের জানাতে লাগলেন– মস্ত এক বড়লোকের আইন পাশ ছেলের সাথে শাদি দিচ্ছেন মেয়ের। মুনশীদের চৌদ্দ গুষ্টি খুঁজলেও তাদের কোন আইন পাশ কুটুম কেউ বের করতে পারবে না।

মাঠের শেষ জমিটুকুও হস্তান্তর করে নসর মীর্জা জুড়ে দিলেন ধুমধাম। খাশি কিনলেন, কুটুম জড়ালেন, দাওয়াত করলেন গাঁ– ভিন্ গাঁয়ের অনেক লোককে। বিস্তর দৌড়ঝাঁপ করে দু'তিন দিনেই শেষ করলেন যোগাড়যন্তর। মেয়ে যদিও নারাজ, তবু জোর করেই শাদি দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তিনি।

আজ সেই শাদি। বাদ জোহর কলেমা। সকাল থেকেই বাইরের আঙ্গিনায় পাকের আঞ্জামে লেগে গেল অনেক লোক। অন্যরা নানাজন নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ছুটোছুটি করতে লাগলো আনন্দে। বৈঠকখানার বারান্দায় বসে কামাল মিয়া পা দোলাতে লাগলো পরম পুলকে।

অকস্মাৎ বজ্রপাত। তিন চারজন জোয়ান জোয়ান ছেলে কোথা থেকে ছুটে এলো সেখানে। কামালের উপর নজর পড়তেই সবাই তারা সমস্বরে বলে উঠলো– ঐ–ঐ, ঐ যে শালা সাইকেল চোর বসে আছে এখানে। ধর– ধর–

আগন্তুকদের দেখে ভূত দেখারও অধিক আঁতকে উঠলো কামাল হোসেন।

আগন্তুকেরা এগুতে না এগুতেই বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে পড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিলো সে। প্রাণপণে ছুটতে লাগলো মাঠজঙ্গল পেরিয়ে।

আগন্তুকেরা তাকে ধাওয়া করতে যেতেই মীর্জা সাহেবসহ কার্যরত লোকজন 'কি ব্যাপার' বলে ঘিরে ধরলো তাদের। মীর্জা সাহেব দিশেহারাকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন– তোমরা ওকে তাড়া করছো কেন?

আগন্তুকদের একজন ব্যস্তকণ্ঠে বললো– আপনারা সরুন সরুন! ঐ শালা সাইকেল চোর হাতছাড়া হয়ে গেলে সাইকেলটা আর পাবো না। শালার হাড়হাড্ডি গুঁতো করে ফেলবো আমরা।

মীর্জা সাহেবও ব্যস্তকণ্ঠে বললেন– আহা! সাইকেল তো একটা আছেই এখানে। কিন্তু ঘটনা কি?

সাইকেল আছে শুনে আশ্বস্ত হলো আগন্তুক ছেলেরা। তাদের অন্য একজন বললো– আছে? যাক বাবা তবু রক্ষে! পালিয়ে শালা যাবে কোথায়? একদিন না একদিন হাতের কাছে পাবোই।

: তার মানে? কার সাইকেল ওটা?

: আমার সাইকেল। বদমায়েশটা ওটা চুরি করে এনেছে।

: কি বলছো তোমরা! একজন আইন পাশ ছেলে সাইকেল চুরি করেছে?

আগন্তুকেরা বিপুল বিস্ময়ে একে অন্যের মুখের দিকে চাইলো। এরপর বললো– আইন পাশ! একটা নাইন ফেল অপদার্থ আইন পাশ মানে?

: নাইন ফেল!

ক্লাশ নাইনটাই তো পাশ করতে পারেনি ও। ফেল করেছে দু'দুবার। স্কুল ছেড়ে সেই থেকে বদমায়েশী করে বেড়াচ্ছে। আইন পাশ পেলেন কোথায়?

: সে কি! ঠিক জানোতো তোমরা?

একই জায়গায় বাড়ি আমাদের, ঠিক জানবো না কেন? একই স্কুলে পড়েছি আমরা।

: কি সর্বনাশ! অতবড় ঘরের ছেলে–

অত বড় ঘর। যাদের এক টুকরা ভিটে মাটিও নেই, তারা আবার বড় ঘর হলো কি করে? পরনের কাপড়টাও নেই বললেই চলে। আর একটা ছেলের হুজ্-বুট-প্যান্ট-গগলস একদিনের জন্যে চেয়ে নিয়ে এসে লাপাত্তা হয়ে আছে।

কাঁপ ধরলো মীর্জা সাহেবের গায়ে। বললেন– সে কি কথা! আমি নিজে গিয়ে যে দেখে এলাম– মস্তবড় বাড়ি, বাগবাগিচা, জোত ভুঁই–

আগন্তুকেরা এবার হো হো করে হেসে উঠলো এক সাথে। বললো– ওটা ওদের বাড়ি হবে কেন? ওটা তো এক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ি। বাগবাগিচা জোতভুঁই

সবই ঐ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের। সপরিবার উনি শহরের বাড়িতে আছেন। খালি ছিল বাড়িটা। আশ্রয়হীন বলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দয়া করে একটা ঘরে ঠাঁই দিয়েছেন ওদের। অনেক আকুতি মিনতি করার কারণেই এই দয়া করেছেন। ভিক্ষুকদেরও একটা আশ্রয় আছে। ঐ কামালদের তাও নেই।

মাথায় হাত দিলেন নসর আলী মির্জা। টলতে টলতে থপ্ করে ওখানেই বসে পড়লেন মাটিতে।

অবস্থার প্রেক্ষিতে আর মনির মোমেনার অনুরোধে কিছু লোক এসে মকবুল মুনশীকে বললেন– একি করছেন মুনশী সাহেব? মনির বাবাজী যার পর নেই ভালবাসে মোমেনাকে। মোমেনাও তাই। জেদী বাপটা যার তার সাথে শাদি দেয়ার চেষ্টা করছেন মেয়ের। হুট্ করে এমন কিছু করে ফেললে, মনির-মোমেনা দু'জনেরই জীবনটা বরবাদ হয়ে যাবে।

জবাবে মকবুল হোসেন মুনশী গম্ভীরকণ্ঠে বললেন– তা গেলেও আমি নিরূপায়। একে চিরশত্রুতা, তার উপর বেজায় অহংকারী আর দাম্ভিক ঐ নসর মীর্জা। ঐ চিরশত্রু দাম্ভিকের সাথে আমার কুটুম্বিতা চলতে পারে না কিছুতেই। এমন অসম্ভব অনুরোধ আপনারা করবেন না।

মকবুল মুনশী অল্প কথার মানুষ। সুপারিশকারীরা এখানে কোন সুবিধে করতে পারলেন না। ফিরে এসে তাঁরা আবার নসর মীর্জাকে বললেন– আর কেন মীর্জা সাহেব! জিদটা এবার ছাড়ুন। মোমেনা-মনির পরস্পরকে ভালবাসে। আপনি একটু ছোট হলেই মানে আপনি নিজে একটু মুনশী সাহেবকে ধরলেই, শাদিটা ওদের হয়ে যায়। এতে বড়ই সুখী হবে ওরা।

স্বভাব যায় না মলে, ইল্লত যায় না ধুলে। প্রস্তাব শুনেই গর্জে উঠলেন নসর মীর্জা। বললেন– খবরদার। হাতী মরে গেলেও তার দাম লাখ টাকা, তা জানেন? আমি খাটো হবো ঐ অধমের অধম মকবুল মুনশীর কাছে? প্রাণ থাকতে নয়!

আবার মেয়ের শাদির আঞ্জাম করলেন তিনি। এবার বর আনলেন শহর থেকে। ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখলেন, সত্যিকারের বড় ঘরের ছেলে। কামালের মতো ভাঁওতাবাজ নয়। কিন্তু নসীবের পরিহাস, ভাঁওতাবাজী রয়ে গেল তবুও। শহরে এক বাড়ির খবর অন্যবাড়ি রাখে না। ইতিপূর্বে গোপনে দু'দুটো শাদি করেছে বর। কিছু দিন ফুর্তি মেরে মেরে কেটে পড়েছে বউ ফেলে। একটা বউও বাড়িতে আনেনি। অত্যন্ত সুন্দরী দেখে মোমেনাকে শাদি করার খাহেশ হয়েছে আবার। উচ্ছৃখল ছেলেটা সুন্দরী বউটাকে বাড়িতে আনতে পারে এবার– এই বিবেচনায় বরের বাপ মা সুকৌশলে চেপে গেছেন এসব কথা।

খবর শুনে মতলব আঁটলো মোমেনা ও মনির। দুই দুইবার আপছে আপ কেটে

গেছে ফাঁড়া। এবার যদি একান্তই না কাটে, চূড়ান্ত মুহূর্তে কেটে পড়বে তারাই। কলেমা পড়ানোর তোড়জোর দেখলেই তারা দু'জন পালিয়ে যাবে গাঁ থেকে। থাকুক এই দুই পরিবার শত্রুতা ও জিদ নিয়ে।

অল্প কয়েকজন বন্ধুবান্ধবসহ সত্যি সত্যিই একদিন শাদি করতে চলে এলো বর। শেষ সম্বল ভিটে-মাটিটুকুও বন্ধক রেখে নসর মীর্জা আবার শাদির আঞ্জাম করলেন। কোন দাবী নেই বরের। কাজেই, খোশহালে শেষ হলো বর ও অল্প ক'জন বরযাত্রীর খানাপিনা। এবার এলো কলেমা পড়ানোর সময়। মোমেনা খাতুন এই মুহূর্তে পালানোর উদ্যোগ করতেই, বাহির বাড়িতে শুরু হলো ভীষণ হৈ চৈ ও শাসন গর্জন।

ঘটনা অপ্রত্যাশিত। দুই দুইটি মেয়ের জীবন নষ্ট করে লোকটি আবার আর এক মেয়ের জীবন নষ্ট করতে যাচ্ছে– এ খবর অপর দুই স্ত্রীর অভিভাবকেরা ইতিমধ্যেই পেয়েছিলেন। খবর পেয়ে তারা আর সহ্য করতে পারেন নি। বেটা-ভাস্তে, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবসহ এবার তাঁরা মার মার রবে এসেছেন লাঠিসোটা হাতে নিয়ে।

মস্তবড় একদল ক্রোধোন্মত্ত লোক। এসেই তারা লাঠি ফেললেন দুষ্কর্মের সহযোগী বরের ঐ কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের পিঠে। এরপরেই চেপে ধরলেন বরের কলার। ঘটনাটা সংক্ষেপে সবাইকে শুনিয়ে দিয়েই বরকে তারা হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন মীর্জা সাহেবের বাড়ি থেকে। বলে গেলেন, ভালয় ভালয় আগের বউ দুটিকে গ্রহণ করতে রাজী না হলে, জীবন্তই তারা পুঁতে ফেলবেন বরকে।

আবার ভণ্ডুল হলো মীর্জা সাহেবের মেয়ের বিয়ে। আর্তনাদ করে উঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন শ্রান্ত ক্লান্ত নসর মীর্জা। পড়ে গিয়েই জ্ঞান হারালেন। জ্ঞান যখন ফিরলো তখন তিনি পঙ্গু। অর্ধাঙ্গ একেবারেই অবশ হয়ে গেল তাঁর। তিনি শয্যা নিলেন।

পরবর্তী পরিস্থিতি করুণ। নিজে পঙ্গু। উপার্জনের আর কোন লোক নেই। হাতে অর্থ নেই, চাউল নেই হাঁড়িতে। স্ত্রী-কন্যা নিয়ে শুরু হলো মীর্জা সাহেবের অর্ধাহার আর অনাহারের পালা। শেষ সম্বল ভিটেটাও বাঁধাপড়ায়, ঘটি বাটি বেচে দিন কয়েক চললো। দিন অতঃপর আটকে গেল বিলকুলই। অনাহারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে লাগলো রূপসী মোমেনা খাতুন।

এ অবস্থায় আর ধৈর্য ধরতে পারলো না মনির হোসেন। সে অস্থির হয়ে উঠলো। অবশেষে বিচলিত হয়ে উঠলেন মকবুল মুনশী নিজেও। ঈদ উল-আযহা একদম নিকটে। কোরবানীর ঈদ। ঈদ করা তো দূরের কথা, তাঁর নিকটতম পড়শীর চুলোটাই জ্বলছে না আজ ক'দিন ধরে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী আনন্দ করে ঈদ করা হারাম হয়ে গেল মকবুল হোসেন মুনশীর।

নসর মীর্জা ভাঙ্গবে তবু হেলবে না– এটা জানা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালেন মকবুল হোসেন মুনশী। এক পা দু'পা করে চলে এলেন নসর মীর্জার বাড়িতে এবং মীর্জা সাহেবের শয্যার পাশে নীরবে এসে বসলেন।

সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেল দৃশ্যপট। মকবুল হোসেন মুনশীকে অবাক করে দিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠলেন দম্ভের দিকপাল নসর আলী মীর্জা। এক হাত দিয়ে মকবুল মুনশীকে টেনে নিলেন বুকের কাছে। টেনে নিয়ে অঝরে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন। বিহ্বল মকবুল মুনশী এবার ধরা গলায় বললেন– হতাশ হবার কারণ নেই মীর্জা সাহেব। আমার মনির হোসেন তো আছেই। আপনার পরিবারের ভার নিতে সে বড়ই উদগ্রীব। আপনি যদি দয়া করে সম্মত হন–

পুনরায় সশব্দে কেঁদে উঠলেন নসর মীর্জা। আকুলকণ্ঠে বললেন– সম্মত হওয়ার কথা কি বলছেন ভাই সাহেব? আপনি একটু সদয় হোন এবার। সদয় হয়ে একটি বার সুযোগ দিন আমাকে।

: সুযোগ!

সামনেই কোরবানীর ঈদ। কোরবানী দেয়ার মতো কিছুই আর হাতে নেই আমার। আপনি একটু সদয় হলেই আমাদের এই শত বছরের শত্রুতাকে কোরবানী দিতে পারি আমি। পরম আত্মীয় হতে পারি আপনার।

: ভাই সাহেব!

উচ্ছ্বাস ভরে আওয়াজ দিলেন মকবুল মুনশী। আওয়াজ দিয়েই নসর মীর্জাকে তুলে নিয়ে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন আবেগে।

শীল যায় কিল খায়

সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি নিয়ে কথা তেমন উঠে না। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি নিয়ে কথা উঠে বেধড়ক। প্রশ্ন উঠে– চোখ তাঁর কয়টি? সে চোখের নজর মর্ত্যলোকের সবার উপর সমানভাবে পড়ে কি-না? চোখ নিয়ে জোক্ করার ঝোঁকটা তাঁর কতখানি?

যেহেতু সে তথ্য আয়ত্ব করা সাধ্যাতীত, সেহেতু কথা হয়– সে চোখের মাহাত্ম্য নিয়ে। কথা হয়, সৃষ্টিকর্তার চোখ যেদিকে পড়ে সেদিকে সয়লাব। তাঁর দেয়ার শখ সেদিকে উথলে উঠে জলোচ্ছ্বাসের বেগে। শুরু হয় তাঁর বে-পরিমাণ করুণার বেপরোয়া বোম্বিং। দুয়ার বন্ধ থাকলেও কোন দ্বন্দ্ব নেই। ছাপ্পড় ফেঁড়ে পড়ে গিয়ে প্রাপকের মাথার উপর। কারবারই আলাদা। গ্রহিতার গরজ এখানে একেবারেই গৌন। দাতার দেয়ার গরজ মাত্রাধিক। পীড়াপীড়ি ততোধিক। ব্যাপারটা ঠিক 'নিবিনে ক্যান, নে'– এই রকম। অনেকটা এক বিশেষ বইমেলার খাবার স্টলের মতো– 'খাবিনে ক্যান, খা!' সৃষ্টিকর্তা ঘাড় ধরে নেওয়াতে হলেও নেওয়াবেন, স্টলের ওঁরা ঘাড় ধরে খাওয়াতে হলেও খাওয়াবেন। ফারাগটা শুধু পরেরটায় পয়সা লাগে, আগেরটা খয়রাত।

অপরপক্ষে সৃষ্টিকর্তার চোখ যেদিকে নেই, সেদিকে 'হায় হুসেন!' ধু-ধু কারবালা! অহোরাত্র আহাজারি করেও সেই আহামরি করুণার কণামাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই কেউ বলে, সৃষ্টিকর্তা কানা। কেউ আরো ক্ষোভের সাথে বলে– তা-না তা-না তা-না! আসলে পক্ষপাতের খিস্তিপানা দানা বাঁধুক মর্ত্যলোকে– এই তাঁর খাহেশ।

সবই গুনাহর কথা। কিন্তু এলেমদার আর ঈমানদারের কাছে এটি যতবড় গুনাহই হোক, বে-এলেম অদ্না আদমির মুখ তা বলে বন্ধ করা মুস্কিল। লাঠি ধরা যত সহজ, মুখ ধরা তত নয়। আর্গুমেন্টে গেলেই ওরা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে গজনবী পরিবারকে। বলবে– ঐ গজনবী পরিবারের ভেতরেই আছে সৃষ্টিকর্তার এই সৃষ্টিছাড়া পক্ষপাতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

হক কথা না হলেও, বুরবক বলে বক্তাকে এক ধমকে থামিয়ে দেয়া যায় না। বিতর্ক খাটো করে ভাবতেই হয় একটু। গজনবী পরিবার বিশাল এক একান্ন পরিবার। চার গজনবী পরিবারটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সহোদর চারভাই। মাসুম, মারুফ, মাহমুদ ও মতলব গজনবী। বড় ভাই মাসুম মিয়া শাদির পর ষাট সত্তর বছর ধরে সর্ববিধ পুণ্যস্থানের চাল-চত্বর মাড়ালেন, তাবিজ-পলতে কুড়ালেন, ইসিম-কালাম-দোয়া দিয়ে গা-গতর মোড়ালেন, শিকড়-বাকলার সাথে এমবিবিএস- এফআরসিএস পাটায় পিষে পান করলেন। কিন্তু সবই প-শ্রম। প্রাণের পিয়াস পুরলো না। সৃষ্টিকর্তার নেক নজর তাঁর দিকে ঘুরলো না। আজীবন তিনি নিঃসন্তান রয়ে গেলেন।

অথচ তার অপর তিনভাই এক পাও না নড়ে কেমন করে যে সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টি ধরে ফেললেন, এ রহস্য তাঁরা নিজেরাও জানেন না। কোনো বিশেষজ্ঞও এর কিছু হদিস করতে পারেননি। সৃষ্টিকর্তা তাঁদের উপর সরাসরি দৃষ্টিদান করায়, ঘর তাঁদের সরগরম হয়ে উঠলো সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। বড় ভাইয়ের হালত দেখে ছোটরা প্রত্যেকেই হুটাহুট্ শাদি করলেন কয়েকটা। শরীয়তের কোটা পূরণ করলেন। কি জানি, আঁটকুড়ে খোঁটা যদি সইতে হয় তাঁদেরও।

মাশাআল্লাহ! শাদি করে বিবিগুলো ঘরে এনে তুলতে না তুলতেই নিঁদ-ঘুম হারাম হলো জন্মোৎসবের ধুমে। প্রসবক্রিয়ার ফ্রি-স্টাইল প্রতিযোগিতায় বউগুলো ফি বছর এ্যায়সা-হারে প্রত্যেকেই জোড়া জোড়া বংশধর গজনবীদের প্রেজেন্ট করতে লাগলো যে, গজনবীদের উপর আজগুবী এক গজব নাজেল হয়ে গেল। 'বহুৎ দিন হুয়ে' হিন্দি ছবির মতো সন্তানরূপী অসংখ্য পঙ্গোপালের প্লাবনে বে-অফ-বেঙ্গলে ভেসে যাওয়ার দশা হলো গজনবীদের। হাউ-মাউ-খাউ রবে অতিষ্ট হয়ে গাছে উঠতে শুরু করলেন তাঁরা।

www.boighar.com

গতিক বড়ই খারাপ দেখে দিশেহারা তিন ভাই পড়িমরি ছুটে এলেন বার্থকন্ট্রোল অফিসে। বস্তা বস্তা পিল-বড়ি-রাজা এনে তাঁরা তাঁদের সাজানো ঘরদোর আস্ত একটা গোডাউন বানালেন। মস্ত মস্ত বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিলেন। গোশ্ত খাওয়া ছেড়ে দিয়ে স্বাস্থ্য মাটি করলেন। ভিটেমাটির নাগাল থেকে পুঁটি মাছ সরালেন। ডিম দুধ ছাড়লেন। তবু ফলাফল অশ্বডিম্ব।

এতটার পরও সৃষ্টিকর্তার দান থেকে তাঁরা পরিত্রাণ পেলেন না। নিয়ন্ত্রণের সর্ববিধ বাধা-বন্ধন ছিন্ন করে ভবিষ্যতের গজনবীরা হুড় হুড় করে বেরিয়ে এলো মাতৃগর্ভ থেকে। নিরুপায় গজনবীরা দেখে শুনে রণভঙ্গ দিলেন। 'যো হোগা, জরুর উও হোগা'– বলে চুপচাপ বসে বসে আ-ায় তা দিতে লাগলেন। এরপর একদিন ঠা-া মাথায় বসে গণনা করে দেখলেন, ইতোমধ্যেই প্রত্যেকে তাঁরা গ-া বিশেক পুত্র-কন্যা নাতী ও প্রনাতীর পরম শ্রদ্ধেয় গুরুজনে পরিণত হয়েছেন।

তবুও ঘাব্ড়ানোর ব্যাপার মোটেই এটা ছিল না। বংশধরের সংখ্যা বেশুমার বলে অন্নচিন্তায় হন্যে হয়ে পথে নামার অবস্থা গজনবীদের নয়। আল্লাহ এঁদের কেবল জন দানই করেননি, ধন-সম্পদও দান করেছেন জিয়াদাই। ঘরে-বাইরে ক্ষেতে খামারে যে সম্পদ আছে তাঁদের, একটু নেড়েচেড়ে সাবধানে হিসেব করে খেলে, এর দ্বিগুন পোষ্যও তারা অনায়াসে পালন করতে পারেন।

সমস্যা এটি নয়। বড় সমস্যা হওয়ার কথা যেটি, সেটি হলো– তিন সতেরং একান্ন পরিবারসম বিশাল এই পরিজনকে এক অন্নে রাখার এবং বাহান্ন গোষ্ঠীর তেপান্ন মতকে সমন্বয় করার মতো ম্যানেজমেন্ট। পোক্ত পলিসি ছাড়া এ ম্যানেজমেন্ট কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

কিন্তু গজনবীরা এখানেও সকলের আদর্শ। সব পলিসির সেরা পলিসি 'অনেষ্টি ইজ দি বেষ্ট পলিসি'– আট বছরের শিশু থেকে আশি বছরের বৃদ্ধতক্ গজনবীদের

সকলেরই এ ফরমুলা মুখস্ত। একতাই বল আর সততাই সুখের মূল, কোন এলেম না থাকলেও, সকলেই এঁরা এই এলেম নিষ্ঠার সাথে ইস্তেমাল করে আসছেন বংশ পরম্পরায়। ন্যায়নীতির সাথে ধর্মভীরু গজনবীদের মূলনীতি হলো– একতা ঈমান শৃঙ্খলা। এই মন্ত্রই এই পরিবারের অব্যর্থ রক্ষে কবজ। গায়ে এদের কাঁটার আঁচর কাটে কে?

কিন্তু করুণ হলেও সত্য যে, এই মূলমন্ত্র থেকে গজনবীদের বিচ্যুতি সুস্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছে ইদানিং। গজনবীদের অনেকেই দিন দিন সরে যাচ্ছেন স্বকীয়তা থেকে। এক্ষণে এ আলামত তুঙ্গে। মাছের মতো গজনবীদেরও মাথা থেকেই পচন শুরু হয়েছে।

আগের গজনবীদের চরিত্রের মধ্যে বরাবরই একটা সামঞ্জস্য বা মিল ছিল। একে অন্যের ফটোকপি না হলেও কাছাকাছি একটা কিছু ছিলেন। কিন্তু গজনবী পরিবারের বর্তমান মাথা মরুব্বী এই চার ভাইয়ের চরিত্র বৈচিত্র্যময়। কারো সাথে কারো বড় একটা মিল নেই। মিল যেটুকু তামামই তা আঁধারের ব্যাপার স্যাপার, আলোর দিকের নয়। বড় ভাই মাসুম মিয়া জাত মরুব্বী। ধীরস্থির, সরল-সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। মেঝো ভাই মারুফ মিয়ার চরিত্র তাঁর বিপরীত। তিনি ক্ষমতালোভী, স্বার্থপর ও কাঠ গোঁয়ার। সেজোভাই মাহমুদ মিয়া সাদাসিধে, আলাভোলা, মা-গোঁসাই মানুষ। কূটনীতিতে অপক্ক, দূরদৃষ্টি তাঁর সীমিত। কনিষ্ঠ ভাই মতলব মিয়া অনিষ্টের শিরোমণি। যেমনই মতলববাজ তেমনই খল। মেঝো ভাইয়ের বদগুণ তো সবই তাঁর ছিল, তার উপর ছিল তাঁর মুখভরা মধু, অন্তরে বিষ। এর চেয়েও বাজখাঁই ব্যাপার হলো, ঘরের বুদ্ধি রেখে উনি পরের বুদ্ধির পিল খাওয়া মানুষ। একতা, ঈমান ও শৃঙ্খলা আর টিকে থাকে কয়দিন।

তবুও কিছুদিন পারিবারিক ঐতিহ্য টিকে রইলো তাঁদের। পুরাতন প্রথামতে এবং সকলের সমর্থনে বয়োজ্যেষ্ঠ মাসুম মিয়ার হাতে আসে পরিবারের কর্তৃত্ব। নিষ্ঠার সাথে মাসুম মিয়া সে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ফালতু খাতে ব্যয় কমিয়ে পরিজনদের মোটামুটি দুধে-ভাতেই রাখেন। কোন সাতে পাঁচে থাকার সুযোগ না থাকায় একের সাথে অপরের সম্প্রীতি জোরদার হয়। দিন দিন বৃদ্ধি পায় পারিবারিক গৌরব।

কিন্তু গোহালে দুষ্ট এঁড়ে থাকলে, গোহালের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে কতক্ষণ? টিঁশে টিঁশি করে অশান্তি পয়দা করাই কাজ যাদের, অশান্তি পয়দা না হলে যাদের ফায়দা হাসিল হয় না, শান্তি তাদের সহ্য হবে কেন? মাসুম মিয়া প্রবর্তিত শান্তি ও শৃঙ্খলায় তেতে উঠলো আবহাওয়া। আঁতে বড় ঘা লাগলো স্বার্থলোভী মারুফ মিয়ার। বাড়া ভাতে ছাই পড়লো ঝি চাকর কর্মচারীদের। গুমরে গুমরে সারা হলো বৈরীমনা পড়শীরা।

কারণ সুস্পষ্ট। ঝি-চাকর কর্মচারী আর দ্বাররক্ষী প্রহরীর অধিকাংশ স্বভাবতই প্রাপ্তিলোভী পদার্থ। মাঝে মাঝেই উড়তি বাড়তি আর ঘুরতে ফিরতেই ঝরতি পড়তি

প্রাপ্তিযোগ না ঘটলে, এদের মনের ফুর্তিটা দুমড়ে বেঁকে বেরিয়ে আসে বিক্ষোভের আর্তি হয়ে। এ সব মাইনে করা মৌ-লোভীরা আগে একবার ডাইনে বাঁয়ে হর বক্ত কামিয়েছে। মাইনের সাথে উপরিটা আইনের স্যাংশানরূপে দিলে এদের প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এহেন পরিবেশে প্রাপ্তিযোগের পাইপলাইন কেটে দিয়ে কেউ যদি ফের ফাইন করতে চায় এদের তাহলে যে এরা গাইন বাইন ডেকে নিয়ে পালাবদলের পালা গাইতে বসবে, এ আর বিচিত্র কি?

পড়শীদের প্রসঙ্গ আরো পুষ্টিকর। পরের ভাল সইতে পারাটা পড়শীদের কাছে যে কি কষ্টকর ব্যাপার, এর স্পষ্টতর প্রত্যয় একটা পাগলেরও আছে। নিজের ইষ্ট নষ্ট করে পরের কষ্ট সৃষ্টি করা পড়শীদের পুরাতন অভ্যাস। নাককাটা শাস্তি সয়ে পরের যাত্রা নাস্তি করার সর্বনেশে প্র্যাকটিস প্রগতির পোষ্টাইও রদ করতে পারেনি। এর সাথে ফের যদি পরের সর্বনাশে নিজের পৌষ মাস আসার মতো ফাঁক কিছু থাকে, তাহলে আর পড়শীদের রুখে কে? রাখ-রাখ ঢাক-ঢাক যতই করুন না কেন, পাছার কাপড় মাথায় তুলে পড়শীরা বাঁধবেই।

গজনবীদের পড়শীরাও মোটেই এর ব্যতিক্রম কিছু নয়। বরং হিংসায় ও লিপ্সায় অনেক দুর্জনকেও অতিক্রম করা লোক। গজনবীরা ধনে জনে স্বাবলম্বী হয়ে গেলে তাদের প্রাধান্য থাকে কি? ঘাড়ের উপর ঠ্যাৎ তুলে দিয়ে মাতবরী করার মওকা পড়শীরা তাহলে আর কোত্থেকে পায়? গজনবীদের ঘর ভাঙ্গলে শুধুই তো কৌতুক দেখাই নয়, এর সাথে 'পেলে দুই বিঘে, প্রস্থে ও দীঘে...' ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারও পড়শীদের আছে।

এসব চিন্তায় গজনবীদের পড়শীরা উষ্ণ ছিল বরাবরই। সুযোগের অভাবে তারা খামুশ ছিল এতদিন। এক্ষণে গজনবীদের চরিত্রে ফাটল দেখা দেয়ায় পড়শীরা পরম পুলকে কাছা মেরে দাঁড়ালো। কিছু দাসদাসী সহকারে কয়েকজন গজনবীকে চড়ামূল্যে খরিদ করে নিয়ে চালু করলো গুটি।

ক্ষমতার অভাবে ক্ষমতালোভী মারুফ মিয়ার অন্তরে তুষের আগুন জ্বলছিল। কোন ইন্ধন না থাকায় সে আগুন এ যাবত একটা বন্ধনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পড়শীদের খরিদ করা পিরপিরানির কল্যাণে এবার তা জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। অপচয়ের কারণে মাসুম মিয়া এসে মারুফ মিয়াকে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে যেতেই কল্কে হাতে ঘরে ঢুকলো কসিমউদ্দীন। অন্দরে যোগান দেয়া ধুরন্ধর নওকর। এক্ষণে পড়শীদের পোষা পাখি। ফুর্শীর উপর কল্কে রেখে একমনে সে কল্কের আগুন উস্কে দিলো কিছুক্ষণ। এরপর ফুর্শীর নল বাড়িয়ে ধরে স্বগতোক্তি করলো– মুনিবদের ব্যাপার! কথা বলা ঠিক নয় আবার না বলেও পারিনে। রক্ত-মাংসের শরীরে আর কত সয়?

মারুফ মিয়া তখন থেকেই তড়পাচ্ছিলেন। অনুকূল গন্ধ পেয়ে তিনি এদিকে নজর ফেরালেন। নলটা হাতে নিয়ে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন– কি বলতে চাও বলে ফ্যালো না? বারণ করেছে কে? সবাই যদি বসে বসে রঙ্গ দেখো, তাহলে আর আছো কেন এ

বাড়িতে?

নেচে উঠলো কছিমউদ্দীন। বললো– খামাখা ক্যান ফায়ের পায়ে ত্যাল ঢালেন হুজুর? শক্তি বলেন, সামর্থ বলেন– এ সংসারে আপনারই তো সব। পরিবারের সবক'টা জোয়ান জোয়ান মানুষ আপনারই বেটা-পুত, নাতি-পুতি, ভাই-ভাস্তে। যে আঁটকুড়ে তার আবার ভাই-ভাস্তে কিসের আর তার পক্ষে আছেই বা কে? ঐ এক বড় মিয়া ছাড়া আপনার কথার বাইরে যাওয়ার লোক এই পরিবারে আর একজনও নেই। আপনিই হলেন সব শক্তির মালিক। হাজার লাঠি যার হাতে, একজন অসহায় অক্ষম এসে বার বার তার উপরই চোখ রাঙিয়ে যায়, একি অনাসৃষ্টি কা-! মাঠের একটা রাখালও তো এত হীনতা সইবে না!

কাজের মেয়ে মছিরন মেঝে মোছার অজুহাতে মারুফ মিয়ার ঘরে এলো। পড়শীদের সেবাদাসী। হাতের কাজের বদলে সে মুখের কাজে মন দিলো আগে। গজর গজর করতে করতে বললো– ঢাল নাই তরাল নাই, নিধিরাম সদ্দার! দিনে দিনে কতই আর দেখবো!

মারুফ মিয়া মুখ তুলে বললেন– মানে?

হুজুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরে মছিরনও নেচে উঠলো। মৃদুকণ্ঠে মূর্চ্ছনা পঞ্চমে তুলে দিয়ে মছিরন ফের বললো– যার ঘোড়া তার ঘোড়া নয়, তেরাগদারের ঘোড়া– এই কথারই হাল হলো হুজুর! বেটা নাই পুত নাই, মাতবর হলেন বড় মিয়া। যার নিজের কেউ নেই, অন্য অপর পাঁচজনের ভালমন্দ দেখার তার এমন কি গরজ থাকে, কন? কপাল কপাল! কপালের দোষ না হলে এরকম অবিচারও দেখতে হয় দুই চোখে!

পরিবেশ পক্ষে পেয়ে পড়শীরাও পাশে এসে বসলেন। বিপুল উৎসাহ দিয়ে বললেন– আরে এগিয়ে যান। জোর যার মুল্লুক তার! এত চিন্তার কি আছে? যে সংসারে বড় মিয়া নেই, সে সংসার কি চলে না? যুক্তি-বুদ্ধির দরকার হলে আমরা কি সব মরে গেছি?

ব্যস! টপকে গেলেন মারুফ মিয়া। পরের দিনই উল্টে গেল ব্যবস্থা আর পাল্টে গেল প্রেক্ষাপট। নথিপত্র সহকারে অর্থকড়ির সিন্দুক হাতাহাতি চলে এলো মারুফ মিয়ার ঘরে। রাতারাতি বদলে গেল পরিবারের কর্তাব্যক্তি। ব্যাপারটা আঁচ করা সত্ত্বেও পরিবারের পাঁচজন চেপে গেলেন চুপচাপ। মরুব্বীদের ব্যাপার নিয়ে চেঁচামেচি করলেন না।

কিন্তু মারুফ মিয়ার পক্ষের লোক আর ঝি-চাকর প্রহরীদের প্রতাপ তখন দেখে কে? তারা এবার মিটার গেজ ত্যাগ করে ব্রড গেজ ধরলো। ক্ষুদেদের ফাঁয় ফরমায়েশ অগ্রাহ্য করে ভেজ মওলা বলে শুধু মারুফ মিয়ার লেজমলায় মনোনিবেশ করলো। তেজ তাদের খাটো করে, সাধ্য কার? মাসুম মিয়ার কর্তৃত্ব সীজ হওয়ার ফলে লুটপাটের মার্কেটটা গোটাই তারা লীজ পেয়ে গেল। লেজ মরা প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে নিজ নিজ আখের তারা ফিজ ফাইন সহকারে গুছিয়ে তুলতে লাগলো।

আখের গুছানো কাজে মারুফ মিয়া নিজেও শাঁখের করাত। এ কাজে ডাকের উস্তাদ তিনি। লাখের মধ্যে এমন উস্তাদ দুটি পাওয়া দুষ্কর। স্বার্থের লোভে পাঁকের মধ্যে নামতে তাঁর অরুচি কিছু নেই। ফলে, কুৎসা নিন্দার তোয়াক্কা না রেখে সবার নাকের ডগার উপর দিয়ে তিনিও নিজের থলে পূর্ণ করতে লাগলেন।

ক্ষমতা হাতে নিয়েই সমতার মাথার উপর তিনি পয়জার তুলে দিলেন। পরিজনদের সুখ-দুঃখের পরোয়া না করে সংসারের সর্বস্বত্ব করায়ত্ব করার কাজে মত্ত হয়ে উঠলেন। গলা ভরা ধানগুলো চড়া দামে বেচে দিলেন। কারবারের আয়গুলো ব্যয়ের খাতে রেখে দিলেন। অন্যান্য উপস্বত্ব জাল দিয়ে ছেঁকে নিলেন এবং সব শেষে বিষয়-বিত্তের মালিকানা নিজ নামে লিখে নিয়ে জেঁকে জুঁকে বসার চেষ্টা পেলেন। উদ্দেশ্য, পরিবারের কর্তৃত্ব চিরকাল কুক্ষিগত করে রাখা। উদ্দেশ্য তার চরিতার্থ হোক আর না হোক, এতে করে প্রাচুর্যের উৎসমুখ শুষ্ক হয়ে গেল এবং নিদারুণ অনটনের ফলে গজনবী পরিবারে ঘন ঘন অঘটনের সূত্রপাত হলো।

বিপর্যয়ের ঘনঘটায় পরিবারের সৎ ব্যক্তিরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বিদ্রোহ ঘোষণা করে তারা লাঠি হাতে বেরিয়ে এলেন কর্তা ব্যক্তি বদলাতে। সৎ ব্যক্তিরা তখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। তাঁদের অগ্নিমূর্তির সামনে মারুফ মিয়ার সমর্থকরা পালিয়ে গিয়ে খিল দিল দুয়ারে। কোণঠাসা হয়ে পরিবারের কর্তৃত্বের সাথে বিষয়বিত্তের স্বত্বাদি ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন মারুফ মিয়া। অধিকাংশের সমর্থনে পরিবারের কর্তৃত্বে এবার মাহমুদ মিয়া এলেন।

আবার কেটে গেল কিছুদিন। কিন্তু পারিবারটির পচন ইতোমধ্যে অনেক গভীরে চলে গেছে। এর উপর আবার আলাভোলা মাহমুদ মিয়ার উদাসীনতার দরুন দুর্নীতি ও দুরভিসন্ধি দিনে দিনে আরো অধিক গভীরে চলে গেলো। দূরদর্শিতার অভাবে দুষ্টুদের দমনে তিনি শক্ত কোন পদক্ষেপ নিলেন না। দুষ্ট ব্যাধির বীজাণুরা স্বাধীনভাবে তাদের পথে এগিয়ে যেতে লাগলো। পরিণামে, কূটচক্রভেদে অসমর্থ হওয়ায় কর্তৃত্ব থেকে তাঁকেও ছিটকে গিয়ে দূরে পড়তে হলো। পরিবারের কর্তত্ব পিছলে চলে এলো মতলব মিয়ার হাতে।

কাছের জন দূরের জন এতদিন এই আশাতেই ছিল। মারুফ মিয়া ব্যর্থ হওয়ায় অব্যর্থ হাতিয়াররূপে মতলব মিয়ার উপরই তারা ব্যাংক্ করে বসেছিল। কর্তৃত্ব হাতে পাওয়ায় থ্যাংকস থ্যাংকস করতে করতে স্বপক্ষের পরিজন ও অপেক্ষমান পড়শীরা গ্যাং ধরে এসে মতলব মিয়ার ঠ্যাং ও হাত ধরে উপরে উঁচিয়ে তুললো এবং তাঁকে ঠ্যাংদোলা করে নাচাতে শুরু করলো।

মতলব মিয়াও দস্তরমতো মতলববাজ মানুষ। আখের গুছিয়ে নেয়ার সাথে ক্ষমতাটা চিরকাল কবজা করে রাখার মতলব মারুফ মিয়ার চেয়েও তার আরো অধিক দুর্বার। তাতে তার পরিবারটা জাহান্নামে যায় যদি যাক, তার ঠেকা কি! পড়শীরা থাকলেই তো ঢের। পরিবার নিয়ে তাই তার দেখার কিছু ছিল না। ক্ষমতা হাতে রেখে সাঙ্গপাঙ্গ সহকারে লারে লাপ্পা করে যদ্দিন চলে তদ্দিনই লাভ। তবে

পরিজনদের বিদ্রোহের ভয়টা দিলে তার সর্বদাই ঘাপটি মেরেছিল। দেখার দিক বলতে তার এই একটাই। তাই স্বপক্ষীয় পরিজন আর পড়শীদের পরামর্শে তিনি মতলবী পথ ধরলেন। কিছু হাড়কাঁটা ফিঁকে দিয়ে আরো কিছু চাঁইচেলা পাশে ডেকে নিলেন। এরপর তাদের কাঁধে জয়ঢাক তুলে দিয়ে জুড়ে দিলেন জনসেবার জয়গান। অর্থাৎ পরিজনদের কল্যাণে তাঁর প্রাণপাতের সংকীর্তন। কর্ণপাত তাতে কেউ করুক আর না করুক, তিনি সেই গান নিরলস পরিজনদের মাঝ অহোরাত্র গাওয়া শুরু করলেন এবং তার প্রতি সকলের অটল আস্থার কথা বস্তাবন্দি করে সবার ঘরে ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। আরো যা চটকদার তা হলো, তার বক্তব্যের সবটুকুই মিথ্যা বলে নিজেও যেমন জানেন অন্যেও তেমনি জানে। এটা জানা সত্ত্বেও সেই গীত স্বাড়ম্বরে গাইতে কণ্ঠ তার এতটুকু আড়ষ্ট হয়ে এলো না বা সকলের চোখের সামনে সমানে পুকুর চুরি চালিয়ে যেতে বিবেকে তার তিল পরিমাণ বিঁধলো না।

তার এই পিত্তহীন চিত্ত দেখে খুশিতে ডগমগ পড়শীরা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দানের আতিশয্যে তার পেছনে বাঁশ লাগিয়ে তারা সমস্বরে ঠেলতে লাগলো–

মারো ঠ্যালা– হেঁইও!

সরাসরি– হেঁইও!

জোরে জোরে– হেঁইও!

আরো জোরে– হেঁইও!

দিন বসে থাকে না। বসে থাকে না ঘটনাও। টাইম বোমের মতো কাল হরণ করে শুধু। সে কাল হরণ প্রক্রিয়াই চলতে লাগলো। কথায় বলে– 'গাঁ নষ্ট কানায়, পুকুর নষ্ট পানায়, মামা নষ্ট মামীতে, গৃহের প্রশান্তি নষ্ট ভ্রষ্ট গৃহস্বামীতে!'

গৃহস্বামীর এহেন চরিত্র সংক্রামক ব্যাধির মতো অন্যান্য পরিজনদের মধ্যেও দিন দিন সংক্রামিত হতে লাগলো। দুর্নীতির ভেলায় চড়ে নিজের ভাগ্য গড়ে তোলায় তারাও আত্মনিয়োগ করলেন। উস্তাদের পুকুর চুরিতে অবগাহন করে মতলব মিয়ার পুরাতন সাঙ্গাতেরা পুকুর চুরিই নয় শুধু, দরিয়া চুরির বিদ্যাও রপ্ত করতে লাগলো এবং কালক্রমে অনেকেই মারিং কাটিং সহকারে বেঈমানী ও বদবুদ্ধিতে উস্তাদেরও উস্তাদ বনে গেল।

আর কে কাকে ঠেকায়? এই সুপক্ক সাঙ্গাতদেরও নজর গেল পরিবারের কর্তৃত্বের উপর। তারাও গোপনে গুটি চালাতে লাগলো। পড়শীদের দুয়ারে তারাও গোপনে গিয়ে ধর্না দেয়া জুড়ে দিলো। শুরু হলো অন্তর্দ্বন্দ্ব। অপরপক্ষে তখনও যে কয়জন সৎ ব্যক্তি পরিবারে ছিলেন তাঁরাও মরিয়া হয়ে এই অনাচার ঠেকাতে দল বেঁধে এগিয়ে এলেন। ফলাফল সংঘাত এবং অতঃপর ফটাশ-দ্দুম্!

বোমার মতো ফেটে গিয়ে গজনবী পরিবারটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। পড়শীড়া এতদিনে তৃপ্তির হাসি হাসলেন।

শরাফত আলীর স্বাধীনতা

শরাফত আলী নাকি আরাফাতের মাঠে দাঁড়িয়েও ধারাপাত পড়ার মতো এন্তার হেঁকে যাবে– 'স্বাধীনতা জিনিসটা বড়ই মিঠা। উহারে ছাড়া আমি বাঁচুম না। যেখানেই থাকি, আমার স্বাধীনতা চাই।' অর্থাৎ আরাফাতের মাঠেও সে প্রতিষ্ঠা করে যেতে চায় স্বাধীনতার সুবাতাস।

শারাফাতের মতো লোক তা চাইতেই পারে। কারণ, শরীয়ত মেনে চলা তো দূরের কথা, আখেরাত জিনিসটা যে কি, সে সম্বন্ধে কোন বোধই শরাফতের নেই। তার বোধ এক বোধ– সে নিরপরাধ ও নির্দোষ। তার কথা এক কথা– স্বাধীনতা, স্বাধীনতা। স্বাধীনতা শব্দটি নাকি শরাফতের কলিজার মাঝে পারাবত সম সারা রাত বাকুম বাকুম করে।

কিন্তু তার ভাইয়ের কথা ভিন্ন কথা। তার বড়ভাই নিয়ামত আলীকে প্রশ্ন করলে সে কিয়ামত তক বলে যাবে– 'ঢপ্- ঢপ্, পুরোটাই দপ্। হুজুগে বুলি। স্বাধীনতা শব্দের প্রকৃত অর্থই সে বোঝে না। সে একটা গাঁড়োল, নাদান, স্ত্রেণ ও মূর্খ। নিজের কোনো বুদ্ধি নেই, পরবুদ্ধিতে চলে। আসলে যথা সময়ে শরাফতকে যথাযথ মেরামত করা হয়নি বলেই আজ তারা সপরিবার তার খেসারত দিচ্ছে।

যৌথ পরিবার। বাপের দুই ছেলে– নিয়ামত ও শরাফত। শরাফত আলী ছোট আর নিয়ামত আলী বড়। নিয়ামত আলীর হুঁশবুদ্ধি বেশ টনটনে। কিন্তু শরাফত আলীর হুঁশবুদ্ধি অনেকটাই কম। সেই সাথে সে আবার খানিকটা বেয়াড়াও। এ কারণে বাপ ভাইয়ের অবজ্ঞা আর সংসারের কাজ কাম অধিকাংশই এসে তার ঘাড়ে চাপে। দোষত্রুটির দায়ও প্রায় সবটুকু তাকেই বইতে হয়। তবে হুঁশবুদ্ধি কম বলেই হোক, আর যে কারণেই হোক, শরাফত আলী এ ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করে না। সে নীরবে সংসারে খাটে। বাপ-ভাইয়ের গালমন্দও গায়ে তেমন মাখে না।

কিন্তু শরাফত আলী গায়ে না মাখলে কি হবে, তার বউটা এটা এড়িয়ে যেতে নারাজ। বউয়ের জা, অর্থাৎ বড়মিয়া নিয়ামত আলীর বউ, শরাফত আলীর দৈন্যদশা দেখে খলবল করে হাসে আর বড় বড় কথা কয়– এটা ছোট বউয়ের অসহ্য। একই বাড়ির বউ হয়ে বড় বউ ছোট বউকে সমান মর্যাদা দেয় না– এটাও তার বরদাশতের বাইরে। এ সমস্ত কিছুর জন্যে তার মেরুদ-হীন স্বামীটাই দায়ী– ছোট বউয়ের এ ক্ষোভ দীর্ঘদিনের। কিভাবে এই বড় বউয়ের থোতা মুখ ভোঁতা করা যায়, এই পরিকল্পনা ছোট বউ দিন রাতই আঁটে।

বৈশাখের দুপুর। গড়ে গেছে বেলা। আকাশ থেকে আগুন ঝরে পড়ছে। এই সময়

বইঘর ও রিএরিডি

টলতে টলতে মাঠ থেকে ফিরে এলো শরাফত আলী। তার এক কাঁধে লাঙল-জোয়াল, আর এক কাঁধে মই আর হাতে বিছনের খালি ধামা। তার গা দিয়ে দরদর করে ঝরে পড়ছে ঘাম। সে এসে বাড়িতে পা দিতেই তেড়ে এলো তার ভাই। লাঠি হাতে তেড়ে এলো তার বাপ। তারা সগর্জনে বলে উঠলো– ওরে ওরে বেয়াকুফ, ওরে নাদান না নালায়েক! তুমি মাঠে থাকতে গাইয়ের দুধটা বাছুরে সবটুকুই খেয়ে নিলো কি করে? তার চেয়েও বড় কথা, অন্য গরুগুলো অন্যের ফসল খাওয়ার দায়ে খোয়াড়ে গেল কেন? এতটাই বেহুঁশ আর বেখেয়াল?

ভাই বললো– ওদিকে আবার এঁড়ে গরুটা ছুটে বাড়ির উপর এসে ঢুঁ মেরে কদম আলীর বউয়ের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। বার বার কদম আলী সে নালিশ নিয়ে আসছে। এঁড়েটাকে আটকাওনি কেন?

শরাফত আলী অসহায় কণ্ঠে বললো– কি করে আটকাবো? জমিতে বিছন দিয়েছি। চাষ তুলে তাড়াতাড়ি বিছনগুলো মইয়ের তলে দেবে না দিলে পক-পকালিতে তো খেয়ে নেবে বিছনগুলো। বেলা পড়ে গেছে, আমি জমিতে মই দেয়া নিয়ে ব্যস্ত। এতসব দেখবো কি করে?

শরাফত আলীর বাপ গর্জে উঠে বললো– দেখবো কি করে মানে? তুমি দেখবে না তো দেখবে কে?

শরাফত আলী দিনের পর দিন সহ্য করে গেছে। হক কথাটা কয়নি। আজ আর সে সহ্য করতে পারলো না। মরিয়া হয়ে বললো– কেন, তোমরা আছো কি করতে? ভাইজান তো আজকাল ঘর থেকেই বেরোয় না। সব দায় আমার উপর না দিয়ে কিছু কিছু দিক তোমরাও দেখলে তো পারো।

হুংকার দিয়ে সামনে এলো শরাফত আলীর বাপ। বললো– খবরদার! থাপ্পড় মেরে ফেলে দেবো সব দাঁত। বেয়াদব তেত্তমিজ! বুড়ো বয়সে বাপকে মাঠে কাজ করতে বলো? বেরোও, বেরোও আমার বাড়ি থেকে...

তেড়ে এসে শরাফত আলীর বাপ হাতের লাঠি শরাফত আলীর পিঠের উপর তুললো।

লাঙল মই নামিয়ে রেখে শরাফত আলী দুই হাতে ছাঁদতে লাগলো লাঠিটা। তা দেখে শরাফত আলীর ভাই ছুটে এসে সজোরে ধাক্কা মারলো শরাফতকে। শ্রান্ত ক্লান্ত শরাফত আলী সে ধাক্কা সামাল দিতে না পেরে শাটপাট হয়ে পড়ে গেল আঙ্গিনায়। শরাফত আলীর ভাবী (নিয়ামতের বউ) দেউটিতে দাঁড়িয়ে থেকে দাঁত পিষে বলতে লাগলো– মারো- মারো, আলসেটাকে মেরে তক্তা বানিয়ে দাও। তিনবেলা তিন শানকি গিলবে আর সংসারের কাজ কাম দেখবে না!

'মেরে ফেললো, লোকটারে মেরে ফেললো', বলতে বলতে ছুটে এলো শরাফত আলীর বউ। শরাফত আলীকে টানতে টানতে সে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। চৌকির উপর বসিয়ে কিছুক্ষণ পাখা দিয়ে বাতাস করার পর, সে তার স্বামীকে ক্ষোভের সাথে বললো– এ বাড়িতে একবিন্দু স্বাধীনতা আছে তোমার? আমার শ্বশুর

তোমাকে গোলাম বানিয়ে দিনরাত গরুর মতো খাটাচ্ছে। কই, বড়মিয়াকে তো এমন গরুর মতো খাটাচ্ছে না?

শরাফত আলী টেনে টেনে বললো– না মানে, ভাইজান হিসেব নিকেশ জানে তো! বাইরের ঝুট-ঝামেলা তাকে সামাল দিতে হয়।

হিসেব নিকেশ না ছাই। আসলে শক্ত মরদের দক্ষিণ দুয়ারী ঘর। মরদগুণে বড় বউয়ের কি দাপট এই সংসারে। অথচ তোমার জন্যে...

: কি করবে বলো? সংসার সামাল দেয়ার সাধ্য তো আমার নেই। ওটা আমার বাপ-ভাইয়েরই আছে।

: নেই বলেই কি তোমার স্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে না? এইভাবে গোলামী করবে তুমি?

: গোলামী! গোলামী করলাম কোথায়?

এই যে এখানে। আমার শ্বশুরের সংসারে। এত করে বলছি, চলো আমরা গিয়ে আমার বাপের বাড়িতে থাকি। সেখানে তুমি সামান্য কিছু খায়-খাটুনি করলেই তোমার শ্বশুর তোমাকে রাজার হালে রাখবে।

শরাফত আলী চিন্তিতকণ্ঠে বললো– ঠিক বলছো! তুমি কি ঠিক বলছো?

বউ বললো– ঠিক বলছি মানে কি? আমার শ্বশুরের সংসারে যে রকম গোলামী করছো তুমি, মানে আমার শ্বশুর তোমাকে যেভাবে গোলাম বানিয়ে রেখেছে, তোমার শ্বশুর তাই তোমাকে রাখবে নাকি? সেখানে গেলে তোমার অফুরন্ত স্বাধীনতা। হাজার হোক, তোমার নিজের শ্বশুর তো।

শরাফত আলী চাঙ্গা হয়ে উঠলো। শুধু চাঙ্গা হয়েই উঠলো না, সিদ্ধান্তে ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে গেল। বললো– তাই তো, তাই তো! আরে আমি কি বোকা! গোলামী করতে হয়, পাইট-মজুর খাটতে হয়, নিজের শ্বশুরবাড়িতে খাটবো। বউয়ের শ্বশুরবাড়িতে গোলামী করে কোন্ বেয়াকুফ! নাও, আজই কাপড় চোপড় গুছিয়ে নাও...

সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে তৈয়ার হয়ে গেল তারা। বাপ-ভাই পাড়া-প্রতিবেশী নিষেধ করে শরাফত আলীকে আটকাতে পারলো না। শরাফতের এক কথা– আমার কি ইজ্জত নেই? স্বাধীনতা বোধটাও কি বিকিয়ে খেয়েছি আমি? গোলামী করতে নিজের শ্বশুরবাড়িতে করবো, বউয়ের শ্বশুরবাড়িতে কেন? আমি কি স্ত্রৈণ? নিজের ছাড়া বউয়ের শ্বশুরের গোলামী করলে কি স্বাধীনতটা পুরোপুরি ভোগ করা যায়?

সে দিনই সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে বউসহ নিজের শ্বশুরবাড়িতে পার হলো শরাফত আলী।

পরিস্থিতিটা হয়তো দিনে দিনে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসতো। কিন্তু এই সময় হঠাৎ শরাফত আলীর বাপটা মারা যাওয়ায় পরিস্থিতিটা জটিল হয়ে উঠলো। সুযোগ পেলো শরাফত আলীর বউ। সে-ই পরিস্থিতিটা জটিল করে তুললো। ছোট বউয়ের

লক্ষ্য তো শরাফত আলীর স্বাধীনতা নয়, তার লক্ষ্য বড় বউকে টিট্ করা। তাই সে শরাফত আলীকে বললো– তুমি তোমার বাপের সব কিছুর অর্ধেকের মালিক। তোমার ঘরদোর-জোতভূঁই সবকিছু যদি তাদের অধীনেই থাকলো, তাহলে তুমি স্বাধীন হলে কি করে? ওগুলো সব এখানে পার করে আনো।

শরাফত আলী আমতা আমতা করে বললো– আনতে তো ইচ্ছে হয়ই। কিন্তু ভাইজানের কাছে গিয়ে কেমন করে সে সব...

শরাফত আলীর বউ বললো– তোমাকে কিছুই করতে হবে না। যা করার আমার বাপ-ভাইয়েরাই করবে। তুমি শুধু হুকুমটা দেবে– ব্যস্।

হুকুম দিলো শরাফত আলী। তার শ্বশুর ও শালা সম্বন্ধীরা গিয়ে ঘর-দুয়ারের অর্ধেকটা ভেঙ্গে (সব টিনের ঘর-দুয়ার) তাদের বাড়িতে পার করে নিলো আর তার অংশের জোতভূঁই সবটুকুই বিক্রি করে দিয়ে এলো। শরাফত আলীর কোন কিছুর দাগ-চিহ্নই আর তার পিত্রালয়ে রইলো না।

কয়েকটা দিন নিরূপদ্রবেই গেল। শরাফতের ঘর-দুয়ার আর জমি বেচা টাকা পয়সা সব কিছুই শরাফতের শালা-সম্বন্ধিরা অচিরেই আত্মসাৎ করে ফেললো।

এরপর শুরু হলো উপদ্রব। শরাফতকে তার শ্বশুর ও শালা সম্বন্ধিরা দিনরাত গরুর মতো খাটাতে লাগলো। একটা মুহূর্তও শ্বাস নেয়ার অবকাশ তার রইলো না। পিত্রালয়ে যে পরিমাণ খায়-খাটুনি আর গোলামী তাকে করতে হতো তার মাত্রা পঞ্চগুণে বেড়ে গেল এখানে এসে। খাটতে খাটতে তার নাভিশ্বাস শুরু হলো। স্বাধীনভাবে চলাফেরার কোন মওকাই তার রইলো না।

তা দেখে প্রতিবেশীরা শরাফত আলীর শালা-সম্বন্ধীদের প্রশ্ন করে– সে কি! লোকটা স্বাধীনতা ভোগ করবে– এই জন্যেই নাকি তাকে তোমরা এখানে এনেছো! কিন্তু এখন তো দেখছি ওখানে থাকতে তার চলাফেরার যেটুকু স্বাধীনতা ছিল, তোমরা তো এখন তাও রাখলে না।

শালা-সম্বন্ধীরা ভেংচি কেটে বলে– ইঃ! ঘরজামাইয়ের আবার স্বাধীনতা!

উঠতে বসতে সব সময় শালা-সম্বন্ধীদের বাধা নিষেধ মেনে চলতে চলতে শরাফত আলী নেতিয়ে পড়ে বলে– হাইরে বা! জনমভর শুইনা আইলাম, স্বাধীনতা জিনিসটা নাকি বড় মিঠা। কিন্তুক কই, তেমন মিঠা তো লাগে না!!

বেতনভুক্ত খাদক

মাশাআল্লাহ! আওয়াজটা আর একবার কাজে লাগলো। কাঁচা বয়সে রপ্ত করা চাঁছা আওয়াজ। বদ আওয়াজই বলেন কেউ কেউ। বলুন গে। আমি কি করবো? কোন কিছু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে আমার আর জ্ঞান থাকে না। অনেকটা অজ্ঞানেই আওয়াজ দিয়ে বসি– মার ছক্কা!

এই আবেগ বা আওয়াজটা বেয়াড়া। এটা পেয়েছিও এক বেয়াড়া পরিবেশে আর এক বেলোয়ারী বিবিজানের কাছে। তিনি যাত্রাদলের জনৈকা নর্তকী। কুৎসিৎ নৃত্যগীতের তালে তালে মাত্রাধিক মাতোয়ারা দর্শকদের উদ্দেশ্যে উনি পুনঃ পুনঃ হাঁকছিলেন– মার ছক্কা!

বয়সের দোষে সঙ্গদোষ আর সেই সময়ের শিক্ষা। অন্য কথায়, আমার এই আবেগদায়িণী ব্যক্তিটি যাত্রামঞ্চের উনিই। এর জন্যে উনার কাছে আমি অবশ্য কৃতজ্ঞ। বড় লাগসই আবেগ দান করেছেন ঐ লওকী বিবি। এটা এখন কাজে লাগে হরহামেশাই। এই পোক্ত বয়সে এসেই আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি এর প্রকৃত মাজেজা।

হালে এক নয়া চাকুরি নিয়েছি। খানদানী পদ। বেতটাও ভালই। একা হলে এই বেতনে 'তাই রে নাইরে না' করেই চলতো। তা নই বলেই 'এটা নাইরে ওটা নাইরে' করে এখন চলে। থাকি এক ফ্ল্যাটে। চার ফ্ল্যাটের বিল্ডিং। উপরে দুটো, নীচে দুটো। চার চারটে চাকরিজীবীর নাতিবৃহৎ বাসা। এই চার চাকুরের তিনজন ছিলাম এতদিন এই ফ্ল্যাটের তিন হকদার। পদে-বেতনে মানে-ওজনে মোটামুটি কাছাকাছি তিন ব্যক্তি।

চতুর্থজন পরে এলেন আমার ফ্ল্যাটের নীচেরটায়। তিনি একজন বেহকদার। বেতন ও পদমর্যাদায় তিনি অনেক খাটো। সরকারি চাকরি-বিধিতে তার প্রাপ্য এর চেয়ে অনেকখানি নিম্নমানের ও ছোট বাসা। আমার ফ্ল্যাটের নীচেরটা দীর্ঘদিন ফাঁকা পড়ে আছে। বেচারা বদলী হয়ে নতুন এসেছেন এখানে। আপাতত কোথাও কোনো সরকারি বাসা ফাঁকা নেই। উপজেলা পরিকল্পনা অল্পদিনের। অনেক বাসা এখনও তৈরি হয়নি। বালবাচ্চা নিয়ে বেচারা যাবেন কোথায়? তাই কর্তৃপক্ষের মৌখিক অনুমোদনে এখানে এসে উঠলেন তিনি। নিতান্তই অস্থায়ী ব্যবস্থা। হকদার কেউ এলেই তাকে গুটাতে হবে পাত্তাড়ি।

তার আসার খবর শুনেই আমার অপর দুই পড়শী পড়িমরি ছুটে এলেন আমার কাছে। আপত্তির ঝড় তুলে বললেন– বড়ভাই, এ অসম্ভব! এটা বরদাশত করা যায় না। পদে-বেতনে আপনিই আমাদের মুরুব্বী। এর বিহিত আপনাকেই করতে

হবে।

ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম– মানে?

মানে আপনি কর্তৃপক্ষকে বলুন, ওকে এখানে পাঠালে ঘোরতর আপত্তি আছে আমাদের। ওর ব্যবস্থা অন্য কোথাও করুক।

: আপত্তি! আপত্তি কেন?

: কেন মানে? বলেন কি! এটা একটা প্রথম শ্রেণীর অফিসারদের ফ্ল্যাট। একেবারেই এক নিম্নমানের কর্মচারীকে এখানে এনে ঢোকালে ডিসেন্সি থাকে এই ফ্ল্যাটের। ডেকোরাম বলে কি একটা কথা নেই?

: ডেকোরাম?

হ্যাঁ, ডেকোরাম। ডেকোরাম আর স্ট্যান্ডার্ড। এই ফ্ল্যাটে ছিঁড়েকাঁথা ঝুলুক, এটা আপনি চান?

অপরজন যোগ দিয়ে বললেন– পরিবেশ দূষিত হলে অবস্থাটা ভাবুন একবার। বাল-বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ বলে থাকবে কিছু?

প্রথমজন অস্থিরকণ্ঠে বললেন– একেবারেই অকল্পনীয় ব্যাপার বড়ভাই। যেভাবেই হোক, এটা আপনাকে রোধ করতেই হবে।

বুঝতে পরলাম পড়শীদের ব্যথা। এঁরা প্রত্যেকেই প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা। ফার্স্টক্লাস গেজেটেড্ অফিসার। এদের পোশাক-আশাক, আসবাবপত্র, খানাপিনা ও চালচলন অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ভারিক্কী ব্যাপার স্যাপার। পয়সা এদের হাতের ময়লা। ডু-ফুর্তি কারবার। বেতনের সাথে সংগতি খুঁজতে গেলে অবশ্যি আকাশ থেকে পড়তে হয়। ভিরমি খেয়ে ভাবতে হয়– এদের বাপদাদারা সবাই রাজা-বাদশাহ নাকি?

এদের পাশে আমি লোকটি একেবারেই বেমানান। শ্যাম্পেনের ড্রামের পাশে সেভেন-আপ্-এর শিশি। কেউটের পাশে কেঁচো। নিজের অযোগ্যতার দরুনই হয়তো বেশি বেতন পেয়েও সাদামাটার উপরে তুলতে পারিনি স্টান্ডার্ডটা। তাই মনে মনে বললাম– ভাইয়েরা আমার, সে প্রশ্ন তুলতে তো আমাকেই আগে ছাড়তে হয় এই ফ্ল্যাট।

মুখে বললাম– আরে এতে এত ঘাবড়ানোর কি আছে? এটা একটা পিওরলি টেম্পোরারি এ্যারেঞ্জমেন্ট। কেউ এলেই উনি চলে যাবেন। এ নিয়ে খামাকা হইচই করতে গেলে লোকে বলবে কি?

দু'জনের একজন বললেন– লোকে বলবে কি মানে?

বললাম– কাঙাল-গরীবের প্রতি আমাদের কোনো সহানুভূতি নেই বলে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে।

: তার অর্থ, আপনি এর বিহিত করতে পারবেন না?

আরে ভাই, ব্যাপারটা সেনসিটিভ। এছাড়া গরীব কর্মচারী বালবাচ্চা নিয়ে উনি

বইঘর.ও বিএবিডি
রাস্তায় পড়ে থাকলে, ব্যাপারটা কি দুঃখজনক হয় না? সামান্য কয়েকদিনের ব্যাপার। এর মধ্যে ব্যবস্থা একটা হবেই।

পড়শীদ্বয় ক্ষুণ্ন মনে উঠে গেলেন। আমি বসে খোশদিলে ভাবতে লাগলাম, মন্দ হবে না উনি এলে। কাঙালে কাঙালে জমবে ভাল।

হায় রে নসীব! উনি যখন মালামালসহ এলেন তখন আঁতকে উঠলাম সেদিকে নজর দিয়ে। এটা কেউটেও নয়, একেবারে অজগর। স্টান্ডার্ডওয়ালা ভাইদের চোখগুলো সব ছানাবড়া। দরিয়ার পাশে ডোবা বনে যাওয়ায় তারা শরমে মুখ লুকানোর ঠাঁই খুঁজতে লাগলেন। বড় লাটের না হোক, মোটামুটি একটা ছোট লাটের লটবহর নিয়ে হাজির হলেন ভদ্রলোক। জীবন যাত্রাকে বিলাসবহুল করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান যা এ যাবত আবিষ্কার করতে পেরেছে, তার প্রত্যেকটা তো আছেই, মনে হলো, তার চেয়েও আরো নতুন কিছু সঙ্গে এনেছেন উনি। সবগুলোই 'এ' ক্লাস ও একাধিক। চকচকে ও ঝকঝকে।

তার আসবাবপত্রের পাশে আমাদের এই ফার্স্ট ক্লাস অফিসারদের ফ্ল্যাটটাকে মনে হলো নেহায়েতই এক দরিদ্র কুটির। যেখানে একটা ছোট লাটের মালামাল ক'দিনের জন্যে কোনমতে রাখা হবে।

ভদ্রলোকের পরিবারটিও ছোট নয়। নারীপ্রধান পরিবার। গোটা তিনেক পত্নী ও গোটা চারেক পরিচারিকা। বয়সে সবাই কাঁচা। চতুর্থ পত্নীর বালবাচ্চাও আছে কয়টা। বয়সী পত্নীটাকে ছেড়ে দিয়েছেন। বর্ষিয়সী বেগম তার না-পছন্দ। উনি কাঁচাদের নিয়ে ঘর করেন।

ভদ্রলোকের বুদ্ধিবিক্রম সবই ভেতর দিয়ে। বাইরে তিনি মুখচোরা। মুখে তাঁর 'রা' শব্দ কদাচিৎ পাওয়া যায়। কিন্তু ভদ্রলোকের ছোট গিন্নিটি মারাত্মক। সাক্ষাৎ মামদো বেগম। স্বামীকে তো নয়ই, এ বিশ্বের কোন কাউকেই কিঞ্চিৎ পরোয়া তিনি করেন, এমনটি বিশ্বাস করার কোন ফাঁক নেই। কারণ, হায়া-লজ্জার বালাই নেই ভদ্রমহিলাটির মধ্যে। ক্যাম্পাসে এসে এই কাঁচা বয়সের স্থূলাঙ্গিনী ছোটি বেগম ক'দিনের মধ্যেই ক্যাম্পাসের 'দলনী বেগম' বনে গেলেন এবং পৈতৃক সম্পত্তিবৎ গোটা ক্যাম্পাসটি দলে মথে গরম করে তুললেন। চত্বরটির মাঠ ময়দান চরুষ করে চষার পর ভদ্রমহিলা প্রতিদিন প্রতি বাসায় ঝিলিক দিয়ে ফিরতে লাগলেন এবং ক্যাম্পাসের নবীন প্রবীণ রসিকদের মাঝে 'ঝিলিকজান' নাম খরিদ করলেন।

ভদ্রলোকের চাকুরিটি পীর সাহেব কিসিমের। অনেক তার মুরীদ। পদে যতই খাটো হোন না কেন, ইষ্টকামীদের ইষ্টপথের তিনিই প্রথম দ্বাররক্ষক। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অর্থাৎ, প্রোজেক্ট এমপ্লিমেন্টেশানের ব্যাপার-বৃত্তান্ত। অন্য কথায়, ইষ্ট বানানোর তন্তর-মন্তর ও সাধ্যি সাধনা। ইনি সেই সাধনা পথের পয়লা পীর। ইষ্টকামীদের সালাম কালাম এখান থেকেই শুরু। গতিপথ শুভ হোক এটি কে না চায়? এছাড়া পীর না ধরলে অভিষ্টপথের পথনির্দেশই বা পাচ্ছে তারা কোথায়? ফলে, সকাল-সন্ধ্যে তবাররকবাহী মুরিদবাহিনীর আনাগোনায় ক্যাম্পাসের এ দিকটা

মেছোবাজীর।

এর উপর আবার প্রতিদিনই ভাষণ আছে স্থূলাঙ্গিনীর। স্বামী-সতীনের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী ও জ্বালাময়ী ভাষণ। শুরু হলে বলতে থাকে অর্ধেক রাত। পরিবেশ নিয়ে পড়শীদের উৎকণ্ঠার কারণটা এবার বুঝলাম। www.boighar.com

ছুটির দিন। বসে আছি উপর তলার বারান্দায়। নীচের তলার সামনের মাঠে জাল্‌সা চলছে ছোটবিবির। আসছে যাচ্ছে আশপাশের পড়শীরা। আসছে যাচ্ছে ফেরীওয়ালী, চুড়িওয়ালী, শাড়ীওয়ালী। এতদিনে একটা মনের মতো ঘাঁটি খুঁজে পেয়েছে তারা। এক শাড়ীওয়ালীর শাড়ীর পোঁটলা উলট পালট করে দেখে এক পাশে ঠেলে দিলেন বিবিজান। মন উঠলো না বিবিজানের। সবগুলোই তার কাছে ফালতু। সবগুলোই তার না-পছন্দ। বিবিজানের মেজাজমর্জি নাখোশ হলো। তিনি গোমড়ামুখে বসে রইলেন।

শাড়ীওয়ালী বিদায় হতেই বিবিজানের নতুন এক গুণগ্রাহিনী পাশে এসে দাঁড়ালেন। বিবিজানের গোমড়ামুখ দেখে আস্তে আস্তে পাশে এসে বসলেন এবং সান্ত্বনার সুরে বললেন– কি হলো, মনটা যে খুব খারাপ দেখছি? ঐ শাড়ীওয়ালী খুব বেশি দাম হাঁকলে বুঝি!

বিবিজান উপেক্ষাভরে বললেন– বেশি দাম কি হাঁকবে? ঐ মিসকিনের ঝুলিতে একটু পছন্দ হোক এমন একটা শাড়ীও যদি থাকতো!

আগন্তুক মহিলাটি সাগ্রহে বললেন– ওমা তাই? তা ভাল শাড়ী নেবেন, সে কথা আগে বলবেন তো? কত ভাল ভাল শাড়ী কাল একজন এনেছিল! বেনারশী, জামদানী, কাতান...

বিবিসাহেবা আহতকণ্ঠে বললেন– সেকি! তাহলে তাকে পাঠাওনি কেন আমার কাছে? এই ফকিন্নী মার্কা জায়গায় এসে কি ছাই ভাল কিছু খুঁজে পাচ্ছি!

না, মানে অনেক দামী কাপড় তো। হাজার দু'হাজার এক একখানার দাম। আপনাদের এখন মাসের শেষ। ভাবলাম, বেতন না পেলে...

ফুঁসে উঠলেন বিবিজান। বললেন– বেতন! বেতনের সাথে কি সাথ? পাঁচ দশ হাজার কি যখন তখন আমাদের কাছে ঠেকা?

অবাক হলেন আগন্তুক মহিলাটি। ক্যাম্পাসের সাথেই লাগালাগি তাদের বাড়ি। তার স্বামী চাকুরিজীবী নন। দোকানদার। ক্যাম্পাসের পাশেই বড় দোকানটি তার স্বামীর। তিনি জানেন, চাকুরিজীবীরা মাস শেষে খুবই টানাটানিতে থাকেন। মহিলাটি তাই তাজ্জব হয়ে বললেন– যখন তখন?

হ্যাঁ, যখন তখন। বেতনের পরোয়া করি আমরা? সম্মানী যা পাই তা দিয়ে এমন পাঁচজনের বেতন আমরাই দিতে পারি।

আগন্তুক মহিলাটির আগ্রহ ও বিস্ময় বেড়ে গেল। তিনি আবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন– সম্মানী! কারা দেয়?

: যাদের কাজ থাকে তারা দেয় । যেমন তারা কামায়, তেমনি তারা দেয় ।

এই প্রাপ্তিটা একটা বাহাদুরীর ব্যাপার বোধে দুলতে লাগলেন বিবিজান । এটি জাহির করতে পারার আনন্দে ফুলতে লাগলেন বসে বসে ।

আগন্তুক মহিলাটি আনকোড়া । বয়স কম । অভিজ্ঞতাও কম । তিনি সবিস্ময়ে বললেন– ও, পয়সা নেন আপনারা?

বিবিজান এবার আকাশ থেকে পড়লেন । বললেন– নেবো না মানে? না নিলে আমাদের চলবে কিসে?

: কেন, মাইনে পান তো আপনারা?

পুনরায় ফুঁসে উঠলেন বিবিজান । অভিযোগের সুরে বললেন– মাইনে! কয় পয়সা মাইনে দেয় সরকার? যা মাইনে দেয় তা দিয়ে স্টান্ডার্ড বজায় রাখা যায়? প্রতি মাসে দশ বারো হাজার না হলে চলাই তো সম্ভব নয় । বেতন! বেতন আবার কোন একটা পয়সা নাকি আমাদের কাছে?

ক্ষোভ আর বিতৃষ্ণা ফুটে উঠলো বিবি সাহেবার চোখেমুখে । তা লক্ষ করে আমি বসে ভাবতে লাগলাম, আহা রে! তার স্বামীধনকে চাকরি দিয়ে কত বড় অপরাধই না করে ফেলেছে সরকার । এগার কোটির (তখনকার জনসংখ্যা) আট দশ কোটি অনাহারেই মরুক আর লক্ষ লক্ষ ডিগ্রিধারী বেকার একটা পয়সার অভাবে ট্রেনের তলেই মাথা দিক, লাট বাহাদুরের লট বহরসহ এই ব্যক্তিটির স্টান্ডার্ড রক্ষে না হলে যে রসাতলে যাবে এই ত্রিভুবনটা!

এমন নির্লজ্জ আকাঙ্ক্ষা আর বেহুদাপনা দেখে 'থ' মেরে গেলাম । এত বড় একটা দুর্নীতিকে ভাত মাছ করে নিয়ে এমন দরাজকণ্ঠে তা জাহির করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ নেই এদের । অথচ বিবিজানের স্বামীর যা যোগ্যতা, তাতে এমন একটি চাকরি যদি না জুটতো তাহলে তাকে পেটের দায়ে ফরমায়েশ খেটে ফিরতে হতো সেরেস্তায় সেরেস্তায় । বিবি সাহেবার বিনিয়ানাও লাটে উঠতো ছেঁড়া কাপড় সাতবার করে সেলাই করে পরতে ।

বিবিজানের এই উক্তি শুনে হাসবো না কাঁদবো ভাবতেই আবার তাকে বলতে শুনলাম– 'সরকার যা বেতন দেয়, তা দিয়ে আমাদের এই চাকরানীদের খরচটাই চলে না ।'

দিশেহারা হয়ে গেলাম । করণীয় স্থির করতে না পেরে দশদিক কাঁপিয়ে তুলে আওয়াজ দিলাম– মার ছক্কা!

দিঘলীতলার কান্না

গভীর রাত। ঘোর অন্ধকার। থম থম চারদিক। রমজান মাসের শেষ সময়া। দিন দুই তিন পরেই ঈদ। তাই চাঁদ-জ্যোৎস্না কিছুই নেই আকাশে। থাকবে কি করে? চাঁদ উঠলেই তো ঈদ হবে।

এমনই গভীর রাতে একটা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। একেবারেই এক কচি বাচ্চার কান্না। বাচ্চাটা ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। চিকন সুরে কিঁউ কিঁউ করে কেঁদেই চলেছে অবিরাম। ঐ চিকন কান্নাটা সুঁচের মতো কলিজায় এসে বিঁধছে।

চুপি চুপি তৈয়ব আহম্মদ ওরফে তৈয়ব আলীর দুয়ারে এসে ডাক দিলো তহির উদ্দীন তইর‍্যা। ভয়ে গলাটা তার কাঁপছে। সে চাপাকণ্ঠে ডাক দিয়ে বললো– তৈয়বরে, ওরে তৈয়ব আলী...

তৈয়ব আহমদ ওরফে তৈয়ব আলী জেগেই ছিল। শুয়ে থাকলেও ঘুম আসেনি। ধড়মড় করে ওঠে বসে তৈয়ব আলীও ভীতকণ্ঠে বললো– কে? কে ডাকে? তইর‍্যা ভাই নাকি!

তহির উদ্দীন তইর‍্যা বললো– হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। ঘুমায়ে গেছো নাকি?

তৈয়ব আহমদ তৈয়ব আলী বললো– না ভাই, না। চেতনই আছি।

: শুনতে পাচ্ছো কিছু?

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাচ্ছিই তো!

: দুয়ারডা খুলে দাও।

দুয়ার খুলে দিলে তইর‍্যা অতি দ্রুত ঘরে ঢুকেই বন্ধ করলো দুয়ার। এরপর তৈয়ব আলীর বিছানার পাশে আর একটা খালি চৌকিতে বসে কম্পিতকণ্ঠে বললো– গাঁওডা উজাড় হয়েই গেল রে ভাই।

তৈয়ব আলী বললো– তাই তো দেখছি। গতকালও চেহেরী খাওয়ার সময় অনেকক্ষণ ঐ কান্না শুনেছি। ভাবলাম, গাঙের মধ্যে নৌকায় কারো কচি বাচ্চা কাঁদছে।

নারে ভাই না, গাঙের মধ্যে নয়। কান্নাটা আসছে ঐ তাল গাছের মাথা থেকে। দিঘলীর আমের গাছের সাথে ঐ যে জোড়া লাগানো তাল গাছ, ঐ তাল গাছের মাথা থেকে। আজ খেয়াল করে দেখো, তাহলেই বুঝতে পারবে।

একটু খেয়াল করে দেখেই তৈয়ব আহমদ বললো– তাই তো রে ভাই, ঠিকই তো। ঐ তাল গাছের মাথা থেকেই তো। কাম্ সারা। এত কাছে? সত্যিই তো, আর

আমাদের রক্ষা নেই।

তৈয়ব আহমদের গলা থেকে নিদারুণ হতাশা ঝরে পড়লো। সে ঘন ঘন ঢোক চিপতে লাগলো। তহির উদ্দীন তইর‍্যা আক্ষেপ করে বললো– কি করে রক্ষে থাকবে? এত করে সবাইকে বললাম, ঐ সব শনিবাইর‍্যা মঙ্গলবাইর‍্যা আর উপরি-ফাপড়ির মরাগুলোকে মাটি দিও না এই দিঘলী তলায় এনে। পাড়ার এত কাছে না দিয়ে গাঁয়ের দক্ষিণ দিকটা তো ফউৎ পড়েই আছে, ওখানে নিয়ে গিয়ে মাটি দেও। কিন্তুক কেউ কি শুনলো আমার কথা? তুফানের পোয়াতি বউ শনিবারের ভর সাঁজে মরলো। তাকে, মরু সর্দ্দার আর পানিতে ডুবে মরা কালুকে– এদের সবাইকে এনে কবর দিলো দিঘলী তলায়। তা দিলে দাও। কিন্তুক গত পরশু এইডা আবার করলো কি? উপরি ব্যারামে কাঁকড়া চাচার ছাওয়াল-পোয়াতি এক সাথে মারা গেল, তাদেরও নিয়ে গিয়ে কবর দিলো ওখানে ঐ দিঘলী আমের গাছের তলে। এবার বুঝো, চারপাশের ভূত-পেত্নী বা কি আর ছেড়ে কথা বলবে? সবগুলো এসে কি জড়ো হবে না ওখানে? সব মরাগুলোকে কি ভূত না বানায়ে ছাড়বে ওরা, বলো?

মাথায় হাত দিয়ে তৈয়ব আহমদ ওরফে তৈয়ব আলী বললো– সাব্বাশ! তাহলে কাঁকড়া চাচার ঐ ছাওয়ালডাই ভূত হয়ে কাঁদছে নাকি? মানে, ঐ তালগাছের মাথায় বসে?

: হতেই পারে। অসম্ভব কি! এ ছাড়া ভূতেরা কখন কোন রূপ ধরে তারও তো ঠিক নাই। কাঁকড়া চাচার সদ্য প্রসব করা ঐ বউডাও হতে পারে? প্রসব করার বেদনায় কচি বাচ্চার মতো কুঁই কুঁই করে কাঁদছে। পেত্নী হয়ে গেলে কি হবে, বেদনাটা তো আর না করে যাবে না? গত পরশুর ব্যাপার। তা তুমি একা নাকি রে ভাই, ও বাড়ির তুফান মিয়া কই? তার তো কোন সাড়া শব্দ পাচ্ছিনে?

: তুফান ভাই বাড়িতে নাই। ঘরে তালা দিয়ে আজই কুটুম বাড়িতে চলে গেছে।

বলো কি! তুমি তাহলে একা আছো এখানে? তোমার বাড়িই তো দিঘলী তলার একদম সামনে। মাঝখানে আর কোন বাড়ি নেই। ভয় করছে না তোমার?

: তা কি আর করছে না? তবে আজ আমি একা নাই। আমার ভাই সৈয়দ আহমদ সৈয়দ ঈদের ছুটিতে বাড়িতে এসেছে আজ। ও আমার পাশেই এই জানালার কাছে শুয়ে আছে। ঘরটা আঁধার তো, তাই দেখতে পাচ্ছো না।

তাই না কি? তোমার ভাই বাড়িতে এসেছে? তবু রক্ষা। তা তোমার ভাই আবার যাবে কবে? মানে ওর মাদার্ চা খুলবে কবে?

এই তো ঈদের পরেই। ঈদের পরেই ওর মাদরাচাটা খুলবে আর ও-ও চলে যাবে।

সে কি! আবার তো তাহলে বাড়িতে তুমি যে একা সেই একা। বাপ-মা ভাই-বেরাদর সব তোমার মারা গেছে। আছে কেবল ঐ একমাত্র ভাইড্যা। ওকেও বাড়ি থেকে চলে যেতে দেবে?

তা আর কি করা যাবে বলো? ওর পড়াশোনা তো আর বন্ধ খরা যাবে না? তা তইর‍্যা ভাই, তুমি অতদূরে বসে রইলে কেন? আমার কাছে এসে বসো।

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে তহির উদ্দীন বললো– না, না, আর বসবো না। আমি যাই। সবাইকে ঘটনাটা ডাক দিয়ে শুনাই। ঐ ভূত-পেত্নীর হাতে আমরা জান দিবো নাকি? ঐ আপদটাকে কি গাঁও থেকে তাড়ানোর একটা ব্যবস্থা করা লাগবে না? তুমি থাকো। আমি সবাইকে ডেকে নিয়ে তোমার এখানেই আসছি– এই এখনই...

গাঁয়ের নাম আটবাড়ি। তেরবাড়ি হলেই এই নামের যথার্থতা আজ সকলের বোধগম্য হতো। কারণ সাকুল্যে তেরঘর লোক বাস করে এই গাঁয়ে। তের ঘর, অর্থাৎ তের বাড়ি মিলে লোকসংখ্যা তি তেরং ঊনচল্লিশের উপরে নয়। বাচ্চা এ গাঁয়ে বাঁচে না। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই তাদের নাকি ভূতে খায়। মানে, চোরাচুন্নি নামের ভূত–প্রেতেরা খেয়ে নেয়। আগে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ ঘর লোক বাস করতো এ গাঁয়ে। পর পর কয়েকটা ওলাউঠায় (কলেরায়) গাঁয়ের দক্ষিণ পাড়াটা উজাড় হয়ে গেছে। যারা বেঁচে ছিল তারা অধিকাংশই অন্য গাঁয়ে উঠে গেছে আর দুই চার ঘর এসে এই উত্তর পাড়ায় বাড়ি করেছে। এই উত্তর পাড়াই এখন আটবাড়ি গাঁ। তের ঘর লোকের বাস।

অল্পক্ষণ পরেই তইর‍্যার সাথে ভয়ে জড়সড় হয়ে চলে এলো পাড়ার মোটামুটি লোকজন। তৈয়ব আহমদ দুয়ার খুলে দিলে সবাই হুড়হুড় করে ঢুকে পড়লো ঘরে। আর ঢুকে পড়েই ঘরের দুয়ার বন্ধ করে দিলো।

রাত তখন বারোটা। পাড়া-গাঁয়ের লোকের কাছে এ রাত গভীর রাত। তখনও ঐ তাল গাছের মাথা থেকে কান্না ভেসে আসছে। নেতিয়ে পড়া ক্লান্তকণ্ঠের করুণ কান্না। চিকন সুরে ধুঁকে ধুঁকে কাঁদছে কোন্ এক ভূতের বাচ্চা কিংবা নাকি সুরে কাঁদছে কোন এক ভূতের বউ। কখনো বা থেমে থেমে কখনো বা একটানা। কান্নাটা খুব চাপা আর রেশটা খুব সুঁচালো। একটু খেয়াল করলেই সেই তীক্ষ্ণ রেশ কানের ভেতর দিয়ে কলিজায় এসে ঠেকে আর কাঁপিয়ে তুলে হৃৎপিণ্ড।

ঘরের দুয়ার বন্ধ করেই সবাই এসে একপাশে পেতে রাখা খালি চৌকিটাতে গুঁটিশুটি মেরে বসলো আর বলতে লাগলো– ওরে বাপরে বাপ্! আবার ডাইনি যুগ্নীর নজর পড়েছে গাঁয়ের উপর! সবাইকে খেয়ে তবে এবার ছাড়বে।

নবী সরদার গাঁয়ের এক অশিক্ষিত প্রধান। সে বললো– খাবে মানে কি, হাড়-মাংস চুষে চুষে খাবে। এটা নির্ঘাৎ ঐ ক্ষেন্দি পেত্নী। ঐ মাগীই আবার এসে নাকি সুরে কান্না জুড়ে দিয়েছে।

নবী সরদারের সাথে তৈয়ব সৈয়দের গ্রাম সম্পর্কের দাদা-নাতী সম্পর্ক। তৈয়ব আহমদ প্রশ্ন করলো– ক্ষেন্দি পেত্নী কে দাদা?

নবী সরদার বললো– চিনতে পারলে না? আর পারবেই বা কি করে? আমিই তখন

বইঘর ও বিএবিডি
খুব ছোট। ক্ষেন্দি হলো ঐ বোরেগী পাড়ার তিনু বোরেগীর বিটি। অমাবশ্যার রাতে ক্ষেন্দি গলায় দড়ি দিয়ে মারা যায় আর তিনু বোরেগীরা ক্ষেন্দিকে এনে আমাদের গাঁয়ের দক্ষিণে ঐ যে মরাঘাটি (শ্মশান), ঐ মরাঘাটিতে পুঁতে রেখে যায়। ব্যাস্, আর কথা কি? অমাবশ্যার রাতে অপঘাতে মরা তো, তাই ক্ষেন্দির সদগতি হয়নি। পুঁতে রেখে যাওয়ার সাথে সাথেই ঐ ক্ষেন্দিটা পেত্নী হয়ে যায় আর সে এসে আমাদের গাঁয়ের উপর ভর করে। আমার বাপের মুখে শোনা।

: বলো কি দাদা?

আর কি বলবো? গায়ের উপর ভর করে ক্ষেন্দি ঐভাবে নাকিসুরে কান্না জুড়ে দেয়, আর সাথে সাথে মড়ক লাগে গাঁয়ে। ঐ দক্ষিণ পাড়ার অদ্দেক লোক মরে যায় ওলাউঠায়।

তৈয়ব আহমদ বললো– কি সাংঘাতিক!

নবী সরদার বললো– এই বছর বিশেষ আগেও আবার ঐ দক্ষিণ পাড়ায় এসে ভর করে ক্ষেন্দি। ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে মড়ক লেগে যায় দক্ষিণ পাড়ায়। বারো আনা লোক মরে সাফ। বেঁচে যারা রইলো তারাও ওখান থেকে উঠে এদিক ওদিক চলে গেল। দক্ষিণ পাড়া এখন শুধুই বন-বাদার। কি গেদু মিয়া, ঠিক বলিনি?

গেদু মিয়া বললো– ঠিক ঠিক। ঐ মড়কে তো আমরাও ওপাড়া থেকে উঠে এই পাড়ায় চলে এসেছি।

সদু খাঁ বললো– না না বাবা, আর এ গাঁয়ে থাকবো না। কালই আমি অন্য গাঁয়ে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করবো।

সদু খাঁকে সমর্থন দিয়ে আরো কয়জন বলে উঠলো– আমরাও, আমরাও। আমরাও তাই করবো। বউ-বাচ্চা নিয়ে পেত্নীর পেটে যেতে আমরা চাইনে।

নবী সরদার বাধা দিয়ে বললো– আরে থামো, থামো। এত লোক এক সাথে গিয়ে জায়গা পাবে কোথায়? তার বদলে কিভাবে ঐ পেত্নীডারে গাঁও থেকে তাড়ানো যায়, সেই চিন্তা করো।

মাখনা শাহ বললো– কিভাবে তাড়াবে? পেত্নী তাড়ানো কি সহজ?

নবী সরদার বললো– সেজন্যে ফকির-ফাকার দেখতে হবে।

গেদু মিয়া বললো– ফকির ডাকলে আমাকে বলো, ডাকঢোরের করম আলী ফকিরকে ডেকে আনি আমি। জবরদস্ত ফকির।

তহির উদ্দীন তইর‍্যা বললো– না না, ফকিরের দরকার নাই। ডাকমণ্ডপের শাঁপলা গাইনকে ডেকে এনে দুই পালা মাদারের গান গাওয়াও। আমার বিশ্বাস, ওতেই কাজ হবে। মানে, মাদার পীরের নাম শুনলেই ভূত-পেত্নী সব বাপ্ বাপ্ করে গাঁও ছেড়ে পালাবে।

তইর‍্যার ভাই অইর‍্যা বললো– হবে না, হবে না, ওসবে হবে না। অমবশ্যার রাতে পেত্নী হয়েছে বোরেগীর বিটি। ওকে তাড়ানো এত সহজ নয়। বরং সান্যাল পাড়ার

বইঘর ও বিএবিডি
শচী সন্ন্যাসীকে ডেকে আনো। সে এসে কালী সাধন করলে তবেই হয়তো হতে পারে কিছু।

অনেকেই এক সাথে বিপুল শব্দে বলে উঠলো– ঠিক, ঠিক, এডাই ঠিক কথা।

এতক্ষণ চুপচাপ শুয়েছিল তৈয়বের ভাই সৈয়দ আহমদ সৈয়দ। এবার সে উঠে বসে বিরক্তির সাথে বললো– উঃ! এরা তো ঘুমাতে দিলো না। যত্তসব বেদাতী আর বেশরার দল! সবাই মিলে ফকির-সন্ন্যাসী ডাকছে!

নবী সরদার প্রতিবাদ করে বললো– ক্যান? ভুলডা হলো কী? গাঁয়ে ভূত ঢুকলে ডাকতে হবে না ওঝা কবরেজ?

সৈয়দ আহমদ সৈয়দ ঠেশ্ দিয়ে বললো– গাঁয়ে ভূত ঢুকেনি দাদা, ভূত ঢুকেছে তোমাদের মাথায়। নামাজ রোজা তো করবে না, কেবলই শেরেকী চিন্তা!

: নামাজ রোজা করিনে কেমন? ঈদের দিনে ঈদের নামাজ পড়ি, মাঝে মধ্যে জুম্মার নামাজও পড়ি। আর রোজা? একটা রোজাও তো কোন বছর বাদ দেই না এ গাঁয়ের আমরা কেউ? বালবাচ্চা বাদে গোটা পাড়ার সবাই আমরা রোজাদার। আর কি চাও?

তাহলে যাও দাদা, আর একটু পরেই চেহেরী খেতে হবে। চেহেরী খেয়ে নামাজ রোজায় মন দাও গে। কোন নামাজ বাদ দিও না। এসব ভূত-পেত্নী তাড়ানো নিয়ে ফালতু চিন্তা বাদ দাও। ভূত-পেত্নী বলে এ দুনিয়ায় কোন কিছু নেই।

: নেই মানে? জাজ্জিল্যমান ঐ কান্নাডা কি শুনতে পাচ্ছো না কিছুই?

পাচ্ছি। গলাটাও মানুষের বাচ্চার গলার মতোই মনে হচ্ছে। তবু ওটা ভূত-পেত্নী নয়। আমাদের কুরআন-হাদীসে ভূত-পেত্নীর কোন কথা নেই। ওসব অমুসলমানদের ধ্যান-ধারণা। মৃত্যুর পরে সদগতি না হওয়ায় ভূত-পেত্নী হওয়াটা ওদের ধর্মের কথা। আমাদের ধর্মে ওরকম কোন অশরীরী আত্মার অস্তিত্ব নেই।

নবী সরদার ভ্রূকুটি করে বললো– তুমি মাদরাচাতে পড়ছো ঠিকই, কিন্তুক শিখোনি কিছুই। জিন-ইনসান– এই দুইডাকে ছিষ্টি করেছে আল্লাহ– তাও জানো না?

: তাতে কি হয়েছে?

: দুষ্ট জিন মানুষের ক্ষতি করে, তাও কি শুনোনি?

: শুনেছি। কিন্তু জিন মানে ভূত-প্রেত নয়।

একশোবার ভূত-পেরেত। জিন্ও ভূতের মতো নানারূপ ধরে। ঐ যে তাল গাছে কানছে, তোমার কথা মতো ওটা যদি ভূত-পেত্নী না হয়, তাহলে নির্ঘাৎ ওটা দুষ্ট জিন। বড় জিন না হলেও ওটা দুষ্ট জিনের দুষ্ট বাচ্চা।

সৈয়দ আহমদ হেসে বললো– জিনের বাচ্চা! সে আবার কি?

নবী সরদার জোর দিয়ে বললো– ক্যান্? জিনের কি ওয়ান-বিয়ান নাই? ওদের কি পোলা-পাইন হয় না? ভূত-পেরেত্ নাই বলছো যখন, তখন নির্ঘাৎ ওটা জিনের বাচ্চা আর ঐ জিনের বাচ্চাই কানছে।

বইঘর.ও বিএবিডি
: তা তুমি ভাবতে পারো। তবে আমি হলপ করে বলতে পারি, ওটা ভূত-প্রেত নয়, জিনের বাচ্চাও নয়।

নবী সরদার এ কথায় ক্রোধভরে বললো– তাহলে ওটা কি? হাতী-ঘোড়ার শিং? যত্তসব আন্‌ল্যা (আনাড়ী) মুলবীর (মৌলভীর) কথা।

এরপর নবী সরদার সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো– এই চলো চলো, এসব ফালতু কথা শুনে কাজ নেই। আর মাত্তর দুই তিনটা রোজা বাকী। এখন আর রোজা ভাঙ্গা ঠিক হবে না। শিগগির চলো, ছেহেরীডা খেয়ে নিয়েই সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ি ফকির-সন্ন্যাসীর খোঁজে। জিনের বাচ্চা হলেও ও ব্যাটাকে তো তাড়াতে হবে গাঁও থেকে।

সবাইকে ডেকে নিয়ে রুষ্টভাবে বেরিয়ে গেল নবী সরদার। জানালাটা খুলে দিয়ে তাল গাছের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো সৈয়দ আহমদ। চেয়ে থেকে ভাবতে লাগলো, একদম মানুষের কচি বাচ্চার মতো গলা, রহস্যটা কি। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা বিকট শব্দ হলো তালগাছের মাথায়। হুড়মুড় দুড়মুড় শব্দ। ডাল পাতা সমেত বিপুল বেগে কেঁপে উঠলো তাল গাছের মাথাটা। সৈয়দ আহমদের মনে হলো এই বুঝি ভেঙ্গে পড়ে তাল গাছের মাথা। সেই সাথে সে লক্ষ্য করলো শিশুকণ্ঠের ঐ কান্নাটা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো।

তৈয়ব আহমদও বসে ছিল সৈয়দ আহমদের পাশে। তৈয়বও একজন অশিক্ষিত গাঁয়ের মানুষ। তালগাছের মাথঅয় ঐ হুড়মুড় দুড়মুড় শব্দে সে ভীষণ চমকে গেল। ভাইকে সে তৎক্ষণাৎ ভীতকণ্ঠে বললো– বন্ধ কর সৈয়দ, শিগগির জানালাডা বন্ধ কর। নইলে এখনই আমরা ঐ জিনের বাচ্চার নজরে পড়ে যাবো। ওরে বাপ রে! একি ভয়ানক ব্যাপার! শুধু বাচ্চাই নয়, আমার মনে হয় ঐ বাচ্চার সাথে বড় জিনডাও আছে।

জবাবে সৈয়দ আহমদ গম্ভীরকণ্ঠে বললো– আমারও তাই মনে হচ্ছে। তবে ফকির-ফাকার ডেকে কাজ নেই। আমিও তো দোয়া-কালাম জানি কিছু। আল্লাহ চাহে তো আগামীকাল সকালেই একটা বিহিত করবো ঐ জিনের বাচ্চার। গাঁয়ের সবাইকে আগামীকাল সকালে ঐ দিঘলীতলায় হাজির থাকতে বলবে।

দুর্ধর্ষ ছেলে সৈয়দ আহমদ। রাত পোহালেই সে ঐ দিঘলীতলায় এসে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক পরীক্ষা করে দেখলো। এরপর মালকোচা মেরে একটা লম্বা বাঁশ হাতে দিঘলীর আম গাছটায় তর তর করে উঠে গেল সৈয়দ আহমদ। উঠে গেল আমগাছের মগডালে। ইতিমধ্যেই গাঁয়ের লোকজন প্রায় সকলেই সেখানে এসে উঁকিঝুঁকি মারছিল। সৈয়দ আহমদকে আম গাছের মাথঅয় উঠতে দেখে হায় হায় করে উঠলো তারা। বলতে লাগলো, ভূত-প্রেতেরা এখনই ওকে আছাড় মেরে ফেলে দেবে মাটিতে। দম বন্ধ করে সেদিকে চেয়ে রইলো সবাই।

এদিকে সৈয়দ আহমদ আম গাছের মগডাল থেকে ডালপাতা ভেদ করে বাঁশটাকে উপরের দিকে তুললো। উপরের দিকে তুলেই তাল গাছের মাথায় সজোরে মারলো

বইঘর ও বিএবিডি

এক ঠেলা। সঙ্গে সঙ্গে বিরাট এক শকুন পাখার ঝাপটায় তালগাছ কাঁপিয়ে উড়ে গেল আকাশে আর বাঁশের গুঁতোয় শকুনের মস্তবড় বাসাটা বাচ্চা সমেত ধপাস্ করে মাটিতে এসে পড়লো। মাটিতে পড়ামাত্র শকুনের বাচ্চাটা তীব্রকণ্ঠে কান্নাজুড়ে দিলো। একদম মানুষের কচি বাচ্চার মতো কাঁদতে লাগলো গুমরে গুমরে।

সঙ্গে সঙ্গে লোকজন সবাই ছুটে এলো শকুনের বাচ্চাটার কাছে। গাছের উপর থেকেই সৈয়দ আহমদ সবাইকে ডাক দিয়ে বললো– দেখুন সবাই। জিনের বাচ্চাটা মাটিতে পড়ে কেমন কান্না জুড়ে দিয়েছে, দেখুন!

দেখে সকলেরই চোখ তখন ছানাবড়া। সবাই একসাথে বলে উঠলো– আরে একি! এতো শকুনের বাচ্চা আর ঐভাবেই কাঁদছে। শকুনের বাচ্চাও এমন মানুষের বাচ্চার মতো কাঁদে? তাজ্জব!

নবী সরদার আরো জোরে আওয়াজ দিয়ে বললো– সেরেফ তাজ্জব নয়, মহাতাজ্জব, মহাতাজ্জব! একেই আমরা ক্ষেন্দি পেত্নী, জিনের বাচ্চা– এসব ভেবে এতটা ভয় পেলাম? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কি অহম্মক আমরা!

গাছ থেকে নামতে নামতে সৈয়দ আহমদ বললো– শুধুই আহম্মক? এক নম্বর আহম্মক!

এর পর থেকে আর কেউ কোনদিন কোন কান্না শুনেনি ঐ দিঘলীতলার তালগাছের মাথায়।

মার ছক্কা

মা'শা আল্লাহ! আওয়াজটা আর একবার কাজে লাগলো। কাঁচা বয়সে রপ্তকরা চাঁছা আওয়াজ। বদ আওয়াজই বলেন কেউ কেউ। বলুন গে। আমি কি করবো? কোন কিছু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে আমার আর জ্ঞান থাকে না। অনেকটা অজ্ঞানেই আওয়াজ দিয়ে বসি– মার ছক্কা!

এই আবেগ বা আওয়াজটা বেয়াড়া। এটা পেয়েছিও এক বেয়াড়া পরিবেশে আর এক বেলায়ারী জানের কাছে। তিনি যাত্রা দলের জনৈকা নর্তকী। কুৎসিৎ নৃত্যগীতের তালে তালে মাত্রাধিক মাতোয়ারা দর্শকদের উদ্দেশ্যে উনি পুনঃ পুনঃ হাঁকছিলেন– মার ছক্কা!

বয়সের দোষে সঙ্গদোষ আর সেই সময়ের শিক্ষা। অন্য কথায় আমার এই আবেগদায়িনী ব্যক্তিটি যাত্রামঞ্চের উনিই। এর জন্যে উনার কাছে আমি অবশ্য কৃতজ্ঞ। বড় লাগসই আবেগ দান করেছেন ঐ লত্তকীবিবি। এটা এখন কাজে লাগে হরহামেশাই। এই পোক্ত বয়সে এসেই আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি এর প্রকৃত মাজেজা।

হালে এক লয়া চাকরি নিয়েছি। খানদানী পদ। বেতনটাও ভালই। একা হলে এই বেতনে 'তাইরে নাইরে না' করেই চলতো। তা নই বলেই এটা নাইরে করে এখন চলে। থাকি এক ফ্ল্যাটে। চার ফ্ল্যাটের বিল্ডিং। উপরে দুটো, নিচে দুটো। চার চারটে চাকরিজীবীর নাতিবৃহৎ বাসা। এই চার চাকুরের তিনজন ছিলাম এতদিন এই ফ্ল্যাটের তিন হকদার। পদে-বেতনে মানে-ওজনে মোটামুটি কাছাকাছি তিন ব্যক্তি।

চতুর্থজন পরে এলেন আমার ফ্ল্যাটের নিচেরটায়। তিনি একজন বেহকদার। বেতন ও পদমর্যাদায় তিনি অনেক খাটো। সরকারি চাকরিবিধিতে তাঁর প্রাপ্য এর চেয়ে অনেকখানি নিম্নমানেরও। আমার ফ্ল্যাটের নিচেরটা দীর্ঘদিন ফাঁকা পড়ে আছে। বেচারা বদলি হয়ে নতুন এসেছেন এখানে। আপাতত কোথাও কোন সরকারি বাসা ফাঁকা নেই। উপজেলা পরিকল্পনা অল্পদিনের। অনেক বাসা এখনও তৈরি হয়নি। বালবাচ্চা নিয়ে বেচারা যাবেন কোথায়? তাই কর্তৃপক্ষের মৌখিক অনুমোদনে এখানে এসে উঠলেন তিনি। নিতান্তই অস্থায়ী ব্যবস্থা। হকদার কেউ এলেই তাঁকে গুটাতে হবে পাততাড়ি।

তাঁর আসার খবর শুনেই আমার অপর দুই পড়শী পড়িমরি ছুটে এলেন আমার কাছে। আপত্তির ঝড় তুলে বললেন– বড় ভাই এ অসম্ভব! এটা বরদাশত করা যায় না। পদে-বেতনে আপনিই আমাদের মুরুব্বী। এর বিহিত আপনাকেই করতে হবে।

বইঘর ও বিএবিডি

ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম– মানে?

মানে আপনি কর্তৃপক্ষকে বলুন, ওকে এখানে পাঠালে ঘোরতর আপত্তি আছে আমাদের। ওর ব্যবস্থা অন্য কোথাও করুক।

: আপত্তি! আপত্তি কেন?

: কেন মানে? বলেন কি! এটা একটা প্রথম শ্রেণীর অফিসারদের ফ্ল্যাট। একেবারেই এক নিম্নমানের কর্মচারীকে এখানে এনে ঢোকালে ডিসেন্সি থাকে এই ফ্ল্যাটের? ডেকোরাম বলে কি একটা কথা নেই?

: ডেকোরাম?

হ্যাঁ, ডেকোরাম। ডেকোরাম আর স্টান্ডার্ড। এই ফ্ল্যাটে ছিঁড়ে কাঁথা ঝুলুক, এটা আপনি চান?

অপরজন যোগ দিয়ে বললেন– পরিবেশ দূষিত হলে অবস্থাটা ভাবুন একবার। বাল-বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ বলে থাকবে কিছু?

প্রথমজন অস্থিরকণ্ঠে বললেন– একেবারেই অকল্পনীয় ব্যাপার বড় ভাই। যেভাবেই হোক, এটা আপনাকে রোধ করতেই হবে।

বুঝতে পারলাম পড়শীদের ব্যথা। এঁরা প্রত্যেকেই প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা। ফার্স্টক্লাশ গেজেটেড অফিসার। এদের পোশাক-আশাক, আসবাবপত্র, খানাপিনা ও চালচলন অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ভারিক্কী ব্যাপার স্যাপার। পয়সা এদের হাতের ময়লা। ডু ফূর্তি কারবার। বেতনের সাথে সংগতি খুঁজতে গেলে অবশ্যি আকাশ থেকে পড়তে হয়। ভিরমি খেয়ে ভাবতে হয়– এদের বাপদাদারা সবাই রাজা-বাদশাহ নাকি?

এদের পাশে আমি লোকটি একেবারেই বেমানান। শ্যাম্পেনের ড্রামের পাশে সেভেন আপ-এর শিশি। কেউটের পাশে কেঁচো। নিজের অযোগ্যতার দরুনই হয়তো বেশি বেতন পেয়েও সাদামাটার উপরে তুলতে পারিনি স্ট্যান্ডার্ডটা। তাই মনে মনে বললাম– ভাইয়েরা আমার, সে প্রশ্ন তুললে তো আমাকেই আগে ছাড়তে হয় এই ফ্ল্যাট।

মুখে বললাম– আরে এতে এত ঘাবড়ানোর কি আছে? এটা একটা পিওরলি টেম্পোরারি এ্যারেঞ্জমেন্ট। কেউ এলেই উনি চলে যাবেন। এ নিয়ে খামাখা হৈ চৈ করতে গেলে লোকে বলবে কি?

দুইজনের একজন বললেন– লোকে বলবে কি মানে?

বললাম– কাঙাল-গরীবের প্রতি আমাদের কোন সহানুভূতি নেই বলে পাঁচজনে পাঁচকথা বলবে।

: তার অর্থ, আপনি এর বিহিত করতে পারবেন না?

: আরে ভাই, ব্যাপারটা সেনসিটিভ। এ ছাড়া গরীব কর্মচারী। বালবাচ্চা নিয়ে উনি রাস্তায় পড়ে থাকলে ব্যাপারটা কি দুঃখজনক হয় না? সামান্য কয়েক দিনের ব্যাপার। এর মধ্যে ব্যবস্থা একটা হবেই।

পড়শীদ্বয় ক্ষুণ্ন মনে উঠে গেলেন। আমি বসে খোশদিলে ভাবতে লাগলাম, মন্দ হবে না উনি এলে। কাঙালে কাঙালে জমবে ভাল।

হায়রে নসীব! উনি যখন মালামালসহ এলেন তখন আঁতকে উঠলাম, সেদিকে নজর দিয়ে। এটা কেউটেও নয়, একেবারে অজগর। স্ট্যান্ডার্ডওয়ালা ভাইদের চোখগুলো সব ছানাবড়া। দরিয়ার পাশে ডোবা বনে যাওয়ায় তাঁরা শরমে মুখ লুকানোর ঠাঁই খুঁজতে লাগলেন। বড় লাটের না হোক, মোটামুটি একটা ছোট লাটের লটবহর নিয়ে হাজির হলেন ভদ্রলোক। জীবনযাত্রাকে বিলাসবহুল করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান যা এ যাবৎ আবিষ্কার করতে পেরেছে, তার প্রত্যেকটা তো আছেই, মনে হলো, তার চেয়েও আরো নতুন কিছু সঙ্গেও এনেছেন উনি। সবগুলোই 'এ' ক্লাশ ও একাধিক। চকচকে ও ঝকঝকে।

তাঁর আসবাবপত্রের পাশে আমাদের এই ফার্স্টক্লাশ অফিসারদের ফ্ল্যাটটাকে মনে হলো নেহায়েতই এক দরিদ্র কুটির– যেখানে একটা ছোট লাটের মালামাল কয়দিনের জন্যে কোন মতে রাখা হবে।

ভদ্রলোকের পরিবারটিও ছোট নয়। নারী প্রধান পরিবার। গোটা তিনেক পত্নী ও গোটা চারেক পরিচারিকা। বয়সে সবাই কাঁচা। চতুর্থ পত্নীর বালবাচ্চাও আছে কয়টা। বয়সী পত্নীটাকে ছেড়ে দিয়েছেন। বর্ষিয়সী বেগম তাঁর না-পছন্দ। উনি কাঁচাদের নিয়ে ঘর করেন।

ভদ্রলোকের বুদ্ধি বিক্রম সবই ভেতর দিয়ে। বাইরে তিনি মুখ চোরা। মুখে তাঁর 'রা' শব্দ কদাচিৎ পাওয়া যায়। কিন্তু ভদ্রলোকের ছোট গিন্নীটি মারাত্মক। সাক্ষাৎ মামদো বেগম। স্বামীকে তো নয়ই, এ বিশ্বের কোন কাউকেই কিঞ্চিৎ পরোয়া তিনি করেন, এমনটি বিশ্বাস করার কোন ফাঁক নেই। কারণ হায়া লজ্জার বালাই নেই ভদ্রমহিলাটির মধ্যে। ক্যাম্পাসে এসে এই কাঁচা বয়সের স্থূলাঙ্গিনী ছোটি বেগম কয়দিনের মধ্যেই ক্যাম্পাসের 'দলনী বেগম' বনে গেলেন এবং পৈতৃক সম্পত্তিবৎ গোটা ক্যাম্পাসটি দলে মথে গরম করে তুললেন। চত্বরটির মাঠ ময়দান চরুষ করে চষার পর ভদ্রমহিলা প্রতিদিন প্রতিবাসায় ঝিলিক দিয়ে ফিরতে লাগলেন এবং ক্যাম্পাসের নবীন প্রবীণ রসিকদের মাঝে 'ঝিলিক জান' নাম খরিদ করলেন।

ভদ্রলোকের চাকরিটি পীর সাহেব কিসিমের। অনেক তাঁর মুরিদ। পদে যতই খাটো হোক না কেন, ইষ্টকামীদের ইষ্ট পথের তিনিই প্রথম দ্বাররক্ষক। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অর্থাৎ প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টশানের ব্যাপার-বৃত্তান্ত। অন্য কথায়, ইষ্ট বানানো তন্তর-মন্তর ও সাধ্যি সাধনা। ইনি সেই সাধনা পথের পয়লা পীর। ইষ্টকামীদের সালাম কালাম এখান থেকেই শুরু। গতিপথ শুভ হোক এটি চায় না কে? এ ছাড়া পীর না ধরলে অভিষ্টপথের পথনির্দেশই বা পাচ্ছে তারা কোথায়? ফলে, সকাল-সন্ধ্যে তবাররকবাহী মুরিদবাহিনীর আনাগোনায় ক্যাম্পাসের এ দিকটা মেছো বাজীর।

বইঘর ও বিএবিডি
এর উপর আবার প্রতিদিনই ভাষণ আছে স্থূলাঙ্গিনীর। স্বামী-সতীনের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী ও জ্বালাময়ী ভাষণ। শুরু হলে চলতে থাকে অর্ধেক রাত। পরিবেশ নিয়ে পড়শীদের উৎকণ্ঠার কারণটা এবার বুঝলাম।

www.boighar.com

ছুটির দিন। বসে আছি উপর তলার বারান্দায়। নিচের তলার সামনের মাঠে জলসা চলছে ছোট বিবির। আসছে যাচ্ছে আশপাশের পড়শীরা। আসছে যাচ্ছে ফেরীওয়ালী, চুড়িওয়ালী, শাড়ীওয়ালী। এতদিনে একটা মনের মতো ঘাঁটি খুঁজে পেয়েছে তারা। এক শাড়ীওয়ালীর শাড়ীর পোঁটলা উলট পালট করে দেখে এক পাশে ঠেলে দিলেন বিবিজান। মন উঠলো না বিবিজানের। সবগুলোই তাঁর কাছে ফালতু। সবগুলোই তাঁর না-পছন্দ। বিবিজানের মেজাজমর্জি নাখোশ হলো। তিনি গোমড়া মুখে বসে রইলেন।

শাড়ীওয়ালী বিদায় হতেই বিবিজানের নতুন এক গুণ-গ্রাহিনী পাশে এসে দাঁড়ালেন। বিবিজানের গোমড়া মুখ দেখে আস্তে আস্তে পাশে এসে বসলেন এবং সান্ত্বনার সুরে বললেন– কি হলো, মনটা য খুব খারাপ দেখছি? ঐ শাড়ীওয়ালী খুব বেশি দাম হাঁকলে বুঝি।

বিবিজান উপেক্ষা ভরে বললেন– বেশি দাম কি হাঁকবে? ঐ মিসকীনের ঝুলিতে একটু পছন্দ হোক এমন একটা শাড়ীও যদি থাকতো?

আগন্তুক মহিলাটি সাগ্রহে বললেন– ওমা তাই? তা ভাল শাড়ী নেবেন, সে কথা আগে বলবেন তো? কত ভাল ভাল শাড়ী কাপড় কাল একজন এনেছিল। বেনারশী, জামদানী, কাতান...

বিবি সাহেবা আহতকণ্ঠে বললেন– সেকি! তাহলে তাকে পাঠাও নি কেন আমার কাছে? এই ফকিন্নী মার্কা জায়গায় এসে কি ছাই ভাল কিছু খুঁজে পাচ্ছি!

না, মানে অনেক দামী কাপড় তো। হাজার দুই হাজার এক একখানার দাম। আপনাদের এখন মাসের শেষ। ভাবলাম, বেতন না পেলে...

ফুঁসে উঠলেন বিবিজান। বললেন– বেতন! বেতনের সাথে কি সাথ? পাঁচ দশ হাজার কি যখন তখন আমাদের কাছে ঠেকা?

অবাক হলেন আগন্তুক মহিলাটি। ক্যাম্পাসের সাথেই লাগালাগি তাঁদের বাড়ি। তাঁর স্বামী চাকরিজীবী নন। দোকানদার। ক্যাম্পাসের পাশেই বড় দোকানটি তাঁর স্বামীর। তিনি জানেন, চাকরিজীবীরা মাস শেষে খুবই টানাটানিতে থাকেন। মহিলাটি তাই তাজ্জব হয়ে বললেন– যখন তখন?

হ্যাঁ যখন তখন। বেতনের পরোয়া করি আমরা? সম্মানী যা পাই তা দিয়ে অমন পাঁচজনের বেতন আমরাই দিতে পারি।

আগন্তুক মহিলাটির আগ্রহ ও বিস্ময় বেড়ে গেল। তিনি আবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন– সম্মানী! কারা দেয়?

: যাদের কাজ থাকে তারা দেয়। যেমন তারা কামায়, তেমনি তারা দেয়।

এই প্রাপ্তিটা একটা বাহাদুরির ব্যপার বোধে দুলতে লাগলেন বিবিজান। এটি জাহির করতে পারার আনন্দে ফুলতে লাগলেন বসে বসে।

আগন্তুক মহিলাটি আনকোড়া। বয়স কম। অভিজ্ঞতাও কম। তিনি সবিস্ময়ে বললেন– ও পয়সা নেন আপনারা?

বিবিজান এবার আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন– নেবো না মানে? না নিলে আমাদের চলবে কিসে?

: কেন, মাইনে পান তো আপনারা।

পুনরায় ফুঁসে উঠলেন বিবিজান। অভিযোগের সুরে বললেন– মাইনে! কয় পয়সা মাইনে দেয় সরকার? যা মাইনে দেয় তা দিয়ে স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা যায়? প্রতি মাসে দশ বারো হাজার না হলে চলাই তো সম্ভব নয়। বেতন! বেতন আবার কোন একটা পয়সা নাকি আমাদের কাছে?

ক্ষোভ আর বিতৃষ্ণা ফুটে উঠলো বিবি সাহেবার চোখেমুখে। তা লক্ষ্য করে আমি বসে ভাবতে লাগলাম, আহারে! তাঁর স্বামী ধনকে চাকরি দিয়ে কত বড় অপরাধই না করে ফেলে সরকার! এগার কোটির (তখনকার জনসংখ্যা) আট দশ কোটি অনাহারেই মরুক আর লক্ষ লক্ষ ডিগ্রীধারী বেকারেরা একটা পয়সার অভাবে ট্রেনের তলে মাথা দিক, লাট বাহাদুরের লটবহরসহ এই ব্যক্তিটির স্ট্যান্ডার্ড রক্ষে না হলে যে রসাতলে যাবে এই ত্রিভুবনটা।

এমন নির্লজ্জ আকাঙ্ক্ষা আর বেহুদাপনা দেখে 'থ' মেরে গেলাম। এতবড় একটা দুর্নীতিকে ভাত-মাছ করে নিয়ে এমন দরাজকণ্ঠে তা জাহির করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ নেই এদের। অথচ বিবিজানের স্বামীর যা যোগ্যতা, তাতে এমন একটি চাকরি যদি না জুটতো তাহলে তাঁকে পেটের দায়ে ফরমায়েশ খেটে ফিরতে হতো সেরেস্তায় সেরেস্তায়। বিবি সাহেবার বিবিয়ানাও লাটে উঠতো ছেঁড়া কাপড় সাতবার সেলাই করে পরতে।

বিবিজানের এই উক্তি শুনে হাসবো না কাঁদবো ভাবতেই আবার তাকে বলতে শুনলাম– 'সরকার যা বেতন দেয়, তা দিয়ে আমাদের এই চাকরানীদের খরচটাই চলে না।'

দিশেহারা হয়ে গেলাম। করণীয় স্থির করতে না পেরে দশদিক কাঁপিয়ে তুলে আওয়াজ দিলাম– 'মারছক্কা!'

ত্যাগ

কোরবানীর সরল অর্থ ত্যাগ। পশু কোরবানীও কোরবানী, বড় কোন স্বার্থ ত্যাগও কোরবানী। এমনই এক স্বার্থ ত্যাগের প্রশ্ন জোরদার হয়ে উঠলো সেবারের কোরবানী ঈদে। শ্যাম রাখি না কুল রাখি করতে করতে অবশেষে কুলটাই রক্ষে করলো মুহম্মদ আলী। ড. মুহম্মদ আলী। পশু কোরবানীটা ছিল তার ফি বছরের করণীয়। সেই সাথে আরো একটা বড় স্বার্থ ত্যাগ করে সেবারের কোরবানীটা মহিমান্বিত করলো সে।

ইস্যুটা ছিল অনেকটা সু-অন্ন আর সু-ব্যঞ্জনের যোগাযোগের মতো একটা ডেলিকেট ইস্যু। প্রায়ই দেখা যায়, সুঅন্ন আর সুব্যঞ্জনের যোগাযোগ বড় একটা ঘটে না। অন্ন উৎকৃষ্ট হলে, ব্যঞ্জন হয় নিকৃষ্ট মানের। ব্যঞ্জন সুস্বাদু হলে, অন্ন হয় গাদ বা চাউল ভাজা। চাউলের মানও অন্নের মান নিম্নগামী করে। অন্ন ব্যঞ্জন দুটোই এক সাথে উপাদেয় হওয়াটা ভাগ্যের ব্যাপার। ভোজন বিলাসীর এমন ভাগ্য সব সময় হয় না।

মুহম্মদ আলী এমনই একটি ভাগ্য চায়। ভোজনের প্রশ্নে নয়, শাদির প্রশ্নে। সে চায় সর্বগুণে গুণান্বিতা নিখুঁত একটি স্ত্রী। কিন্তু সুঅন্ন আর সুব্যঞ্জনের মতো একজনের মধ্যে সর্বগুণের সমাবেশ কদাচিৎ ঘটে। নসীবটা যার পর নেই চোখা না হলে, এমন স্ত্রী কেউ কখনো পায় না। তার নসীব চোখা-ভোঁতা যা-ই হোক, মুহম্মদ আলী এমন স্ত্রীই চায়। এটা তার আবাল্যের সাধ।

মুহম্মদ আলী সদবংশের সুদর্শন ছেলে। কৃতিত্বের সাথে এম. এ. পাশ করেছে। সরকারি বৃত্তি নিয়ে বিলেত যাচ্ছে অল্পদিনের মধ্যেই। আত্মীয়-স্বজন আর অভিভাবকেরা চান, বিলেত যাওয়ার আগে শাদি করুক মুহম্মদ আলী। পশ্চিমা দেশগুলি ডাকিনী আর কুহকিনীদের ডেরা। পেছনে বাঁধন না থাকলে, সুন্দর এই ছেলেটা কুহাকিনীদের কুহকে পড়ে মিসমার হয়ে যাবে। কোন এক কুহকিনীকে শাদি করে ঘর বাঁধবে সেখানেই, আর দেশে ফিরে আসবে না। যদিও বা ফিরে আসে, ডিগ্রীর পরিবর্তে সাথে করে নিয়ে আসবে শেতাঙ্গ বিবি। কয়দিন পরেই দেশটাকে 'ডার্টিকান্ট্রি' অপবাদ দিয়ে বিবি সাহেবা পথ ধরলেন স্বদেশের। বিবির লেজ ধরে ছেলেটাও। পাড়ি দেবে পশ্চিমে, আর ফিরে আসবে না। এমনটি হর-হামেশাই ঘটছে এখন।

মুহম্মদ আলীর মানসিকতাও শাদি করার পক্ষে। ঘরে বউ রেখে গেলে মন তার অন্যদিকে যাবে না। তাড়াতাড়ি ডিগ্রী শেষ করে ঘরে ফেরার তাগিদ অনুভব করবে সে। এছাড়া স্কুলজীবনে দুটি বছর নষ্ট হওয়ায় এমএ পাশ করতেই তার বেশ বয়স

হয়েছে। এরপর বয়সটা বেড়ে যাবে আরো। বয়স বেশী হলে ভাল পাত্রী পাওয়া ভার। অতএব, শাদি করার এইটেই উপযুক্ত সময়।

মনস্থির করে মুহম্মদ আলী তার পরম বন্ধু নূর উদ্দীনের শরণাপন্ন হলো। এক বছর আগে এমএ পাশ করে নুরউদ্দীন এখন এক মহিলা কলেজে অধ্যাপনা করে। মুহম্মদ আলী নুরউদ্দীনকে বললো– দোস্ত, বিলেত যাওয়ার আগেই শাদি করতে চাই আমি। তুমি একটা মেয়ে খুঁজে দাও।

নূরউদ্দীন বললো– তা আমাকে কেন? সে কথা তোমার অভিভাবকদের বলো।

আরে দূর! তাঁরা সেকেলে মানুষ। আমি কি চাই, তাঁরা তার কি বুঝবে? তুমি এডুকেটেড ম্যারেড এবং মহিলা কলেজের অধ্যাপক। অনেক মেয়েই তোমার চেনাজানা! নিজের অভিজ্ঞতা আর পছন্দ কাজে লাগিয়ে ভাল একটা মেয়ে খুঁজে দাও তুমি।

: বটে! তা কেমন মেয়ে চাই তোমার?

: এ্যান্ এ্যাকোম্ প্লীশড লেডী অল্-রাউন্ডার– অল স্কয়ার!

: যা ব্বাবা! সেটা আবার কেমন?

আরে বুদ্ধু, আমি চাই একজন শিক্ষিতা, আধুনিকা, রূপবতী, চরিত্রবতী এবং সংযমী ও পর্দানশীন স্ত্রী। কোনদিকে কম হলে চলবে না।

কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে থাকার পর নূরুদ্দীন গম্ভীরকণ্ঠে বললো– পাবে না।

: পাবো না?

কখ্খনো না। এক সাথে তোমার এইসব চাহিদা পূরণ করার মতো কোন মেয়ে আজও নজরে আমার পড়েনি। একটাও না।

: বলো কি!

: ওরে গিদ্ধর, প্রথম কথা হলো, রূপবতী আর চরিত্রবতী একসাথে পাওয়া কঠিন। ঐ যে অনেকে বলে, দেহের জিওগ্রাফি ভাল হলে চরিত্রের হিষ্ট্রি অধিকক্ষেত্রেই ভাল হয় না। যদিও বা তা হয়, অল রাউন্ডার– অল স্কয়ার, অর্থাৎ টু দি পয়েন্ট আধুনিকা আর টু দি পয়েন্ট পর্দানশীন এক নদীর দুই তীর। দুই তীরের মিলন একসাথে ঘটে না।

: মানে?

আরে বাবা, উন্মুক্ত বিচরণ না থাকলে পুরুষ বন্ধু নিয়ে মাঠ-ময়দান পার্ক-উদ্যান সভা-ফাংশানে না ঘুরলে, সিনেমা-সার্কাসে না গেলে আর পিকনিক আউটিংস না করলে, সে আর আধুনিকা হলো কি? এর সাথে পর পুরুষের সমাবেশে 'কো-কো-কোজিনা' বলে দু'চার পাক নানা চলে আর না গাইলে, আধুনিকার পরিচয়টা পোক্ত হবে কি করে?

মুহম্মদ আলী সবিস্ময়ে বললো– সেকি! এসব করলে পর্দা থাকবে কেন?

সেই কথাই তো বলছি। পর্দা না ফাঁশালে তাকে আর আজকাল কেউ আধুনিকা বলে না। দেখছো না, আধুনিকা হওয়ার জন্যে আজকালকার মেয়েদের কেমন বলগাহীন দৌড় ঝাঁপ?

: সর্বনাশ! তাহলে তো চরিত্রও ঠিক থাকার কথা নয়?

: অধিক ক্ষেত্রেই থাকে না। উছলে পড়া যৌবনের ছেলেমেয়েদের ফ্রি মিক্সিং চরিত্র ঠিক রাখার আদৌ কোন উপাদান নয়। বরং চরিত্র নষ্ট হওয়ারই প্রকাশ্য হাতছানি। এতটার পরও যদি চরিত্র ঠিক থাকে, তাহলে তাদের সংখ্যা নখে গোনার অধিক নয়। কিছু তথাকথিত উচ্চ শিক্ষিতাদের ব্যাপারেও কথাটা অনেকটা খাটে। বিশেষ করে, আমাদের বর্তমান কলেজ ভার্সিটির যা অবস্থা।

: সালাম বাবা। আমার দরকার নেই ঐসব আধুনিকা আর তথাকথিত উচ্চ শিক্ষিতাদের।

: তাহলে কেমনটি চাই তোমার?

আমার যে স্ত্রী হবে তাকে অবশ্যই পর্দানশীন আর চরিত্রবতী হতে হবে। চরিত্রই যদি না থাকলো তাহলে আর থাকলো কি? ওদিকে আবার পর্দানশীন না হলে চরিত্র থাকে?

নূরউদ্দীন সায় দিয়ে বললো– সে তো অবশ্যই। তবে চরিত্রের প্রশ্নটা একটা জটিল প্রশ্ন। আধুনিকাদের মধ্যেও যেমন কিছু চরিত্রবতী থাকতে পারে। তেমনি পর্দানশীনদের মধ্যেও কিছু চরিত্রহীন থাকতে পারে। নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে যেটা নিশ্চিত করে বলা যায় তা হলো, পর্দানশীন মেয়েদের। সিংহভাগই চরিত্রবতী হয়।

মুহম্মদ আলী জোর দিয়ে বললো– দ্যাটস হোয়াট আই ওয়ান্ট। তেমনই একজন খুঁজে দাও দোস্ত।

তাহলে খোলাবাজারের দিকে না তাকিয়ে তুমি তোমার অভিভাবকদের শরণাপন্ন হও। এ ব্যাপারে তাঁরাই তোমাকে অধিক সাহায্য করতে পারবেন। গাঁ-গঞ্জের মেয়ে হলেই ভাল হবে।

অগত্যা তাই সই। কনে খোঁজার ভার এবার পুরোপুরি অভিভাবকদের উপরই ছেড়ে দিল মুহম্মদ আলী। এতে করে খোঁজাখুঁজি করতে অনেক সময় চলে গেল এবং বিলেত যাওয়ার সময় অত্যাসন্ন হলো। শেষ অবধি মাজেদা খাতুন নাম্নী অভিভাবকদের পছন্দ করা একটা মেয়েকে শাদি করে তড়িঘড়ি বিলেতে পাড়ি দিলো মুহম্মদ আলী।

বছর তিনেক পরে সে বিলেত থেকে ফিরে এলো ডকটরেট ডিগ্রী নিয়ে। ফিরে এসেই সে শিক্ষক হিসাবে যোগ দিলো স্থানীয় ভার্সিটিতে। অতঃপর বউ নিয়ে ইউনিভার্সিটির কোয়ার্টারসে এসে সংসার খুলে বসলো।

কিন্তু সকলই গরল ভেল। গ্রাম-গঞ্জের ও পর্দানশীন অন্যান্য মেয়েদের চেয়ে মুহম্মদ আলীর স্ত্রী মাজেদা খাতুন ছিল একেবারেই আলাদা এক চিজ। 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে' বলে যে একটা সত্য কথা আছে, মাজেদা খাতুনের মধ্যে সে গুণের শতকরা আশিভাগই ছিল না অবশ্য, মাজেদা খাতুন নিখুঁতভাবে চরিত্রবর্তী। এখানে কোন কালির দাগ নেই। নামাজী আর পর্দানশীন মেয়ে। স্বামীর প্রতি দরদও তার কম বলা যায় না। কিন্তু এইটুকুর বাইরে সে প্রায় একটা চতুষ্পদ জীব।

স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধি আর কমনসেন্স বলতে এক ফোঁটাও মাজেদার মধ্যে ছিল না। অপরদিকে ছিল পশুসুলভ যাবতীয় বদগুণ। সে যারপর নেই নোংরা, বসন-ব্যসনে প্রকটভাবে উদাসীন, সাজানো গুছানোর পরিবর্তে ছড়ানো ছিটানো চালচলন এবং জংলী জীবন ছাড়া ভদ্র জীবন যাপনে একেবারেই অনভ্যস্ত আর প্রচণ্ডভাবে অনাগ্রহী। এর সাথে বোঝার উপর শাকের আঁটি নয়, আস্ত একটা পর্বত। মাজেদা খাতুন একাধারে মুখরা, দজ্জাল, জেদি ও মাত্রাধিক অহংকারী। মুহম্মদ আলীর বংশ সৎবংশ বটে, তবে সম্পদশালী নয়। মুহম্মদ আলীদের চেয়ে মাজেদার বাপের জমিজমার পরিমাণ ও হাল লাঙ্গলের সংখ্যা কয়েকগুণে বেশি হওয়ায়, সেই দেমাকেই মাজেদার পা পড়ে না মাটিতে। জ্ঞানবিদ্যা আর লেখাপড়ার কদরও সে বুঝে না, শিক্ষিত জগৎ ও পরিবেশের কোন ধারও সে ধারে না। সব মিলে করুণ এক অবস্থা। মূর্খ অহংকারী হলে তাকে লাগাম লাগায় সাধ্য কার?

www.boighar.com

দীর্ঘদিন ধরে স্ত্রীর বদগুণ আর বদ স্বভাব শোধরানোর প্রাণপণ চেষ্টা করলো মুহম্মদ আলী। কিন্তু হিতে হলো বিপরীত। স্ত্রীকে যতই সে সদুপদেশ ও সৎপরামর্শ দিতে লাগলো, স্ত্রী তার ততই হিংস্র আর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগলো। ভাবখানা এই যে, সে সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী। সে যা বুঝে, এই পৃথিবীতে আর কেউ তার অধিক বুঝে না। এমন জনকে উপদেশ দেয়া মানে তাকে অপমান করা। এতে করে স্বামীর নির্দেশিত পথে আসার বদল গৃহাঙ্গণকে মাজেদা খাতুন রণাঙ্গনে পরিণত করলো। খিটিমিটি লেগেই রইলো অহর্নিশ। এর মধ্যে আবার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে এলো সংসারে তাদের। স্ত্রীর অমানবিক আচরণের সাথে অযত্ন ও অতদবিরগ্রস্ত সন্তানদের আর্তনাদ আর চিৎকারে মুহম্মদ আলীর গৃহবাস নরকবাসে রূপান্তরিত হলো। মাথায় হাত দিয়ে হাঁপাতে লাগলো মুহম্মদ আলী।

করুণ এই পরিস্থিতি দেখে আত্মীয় স্বজনেরা প্রথম থেকেই মুহম্মদ আলীকে স্ত্রীত্যাগ ও দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্যে জোর তাকিদ দিতে লাগলেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত স্থির করতে না পেরে মুহম্মদ আলী দিনের পর দিন ধুঁকতে লাগলো কেবলই।

অবশেষে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছার পক্ষে পরিবেশ একটা আকস্মিকভাবেই সৃষ্টি হয়ে গেল। মুহম্মদ আলীর ডিপার্টমেন্টে অধ্যাপিকা হিসাবে যোগ দিলো এক তরুণী। এ বছরই পাশ করে অধ্যাপনায় ঢুকলো সে। নাম লতিফা বেগম। লতিফা একজন সংযমী আর মোটামুটি আব্রু করা সৎ স্বভাবের মেয়ে। অল্পদিনের মধ্যেই তার সৎভাব গড়ে উঠলো সুদর্শন ও সদাচারী মুহম্মদ আলীর সাথে। মুহম্মদ আলীর

পারিবারিক জীবনের দুরবস্থা দেখে ব্যথিত হলো লতিফা। মুহম্মদ আলীর প্রতি তার দরদ, অনুকম্পা ও অনুরাগ বাড়তে লাগলো দিনে দিনে। স্ত্রীর অবর্তমানে লতিফা বেগম মাঝে মাঝেই এসে মুহম্মদ আলীর ঘর-সংসার এমন পরিপাটিভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে যেতে আর কাজের মেয়েটাকে এমন সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করে যেতে লাগলো যে, একটা স্বপ্নীল জীবনের সন্ধান পেল মুহম্মদ আলী। লতিফার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হলো সে। লতিফাও সাড়া দিলো সমভাবে।

অবশেষে প্রশ্ন উঠলো শাদির। একটি মাত্র শর্ত সাপেক্ষে লতিফাও সানন্দে রাজী হলো শাদিতে। শুভাকাঙ্ক্ষীরাও মুহম্মদ আলীকে উৎসাহ দিয়ে বললো– ছেলে মেয়ে দুটিকে মানুষ করে তুলতে হলে, লতিফার মতো মেয়ের হাতেই তাদের ন্যস্ত করা উচিত। নিজের মায়ের সাথে থাকলে তারা বখাটে আর বুনো হয়ে যাবে।

লতিফার একমাত্র অভিভাবক তার এক ভাই। তিনি এসে বললেন– যদিও লতিফার শাদির ব্যাপারটা অন্যত্র অনেকটা স্থির হয়ে আছে, তবু আপনার মতো লোকের এই দুরবস্থা চোখে দেখা যায় না। মানবিকতার খাতিরেই এ শাদিতে আমারও সম্মতি আছে। এছাড়া, আপনাকে আমার বোনেরও পছন্দ। আপনারা অবশ্যই সুখী হবেন।

লতিফা এ শাদিতে শর্ত আরোপ করে বললো, তোমার সন্তানদের মায়ের মতোই মানুষ করবো আমি, কিন্তু তোমার ঐ বুনো স্ত্রী ত্যাগ করতে হবে। যে আগুনে নিজে তুমি জ্বলে পুড়ে মরেছো, সেধে গিয়ে সে আগুনে পুড়ে মরতে চাইনে আমি।

লতিফার প্রেমে আওয়ারা মুহম্মদ আলী বললো তাই সই। সিদ্ধান্ত হলো, সামনের ঈদুল আজহার ছুটিতে বাড়িতে গিয়েই মুহম্মদ আলী স্ত্রী ত্যাগ করবে এবং ফিরে এসেই শাদি করবে লতিফাকে। এ সিদ্ধান্তে যার পর নেই খুশী হলো লতিফা।

খবর শুনেই ছুটে এলো মুহম্মদ আলীর বন্ধু নূরউদ্দীন। এসেই সে মুহম্মদ আলীকে বললো– সে কি! শেষে পর্দানশীন বাদ দিয়ে আধুনিকা?

জবাবে মুহম্মদ আলী বললো– আধুনিকা হলেও সে যথেষ্ট পর্দানশীন দোস্ত।

তা কি করে হবে? দুটোর কি একসাথে পুরোপুরি মিলন কখনও হয়? দুটোর সংমিশ্রণে যা সৃষ্টি হয় তা একটা নতুন বস্তু। কোনটাই অক্ষুণ্ন অক্ষত থাকে না।

দোস্ত।

শুনলাম, লতিফা বেগম সাহেবার অন্যত্র কিছুটা মন দেয়া নেয়া ছিল। শাদির কথাও ছিল সেখানে। এটা শেষে মেনে নিতে পারবে তো?

দোজখের আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে ওটুকু মেনে নেয়া এমন কিছু কঠিন নয়।

ছেলে মেয়ে দুটোর ভবিষ্যৎটাও ভাবছো না তাহলে? মায়ের চেয়ে সৎ মা কখনো অধিক আপন হয় না। সৎ মায়ের নিজের সন্তান জন্ম নিলে পরিবেশটা কিন্তু পাল্টে যায়।

: যাক! নিজে আমি বাঁচতে চাই।

মুহম্মদ আলী তার সিদ্ধান্তে অটল অনড় দেখে ক্ষুণ্ন মনে ফিরে গেল নুরউদ্দীন।

চলে এলো ঈদের ছুটি। বউবাচ্চাকে কায়দা করে আগেই বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে এবার নিজে বাড়িতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলো মুহম্মদ আলী। লতিফা বেগম আবেগ ভরে বললো– কাজ শেষ করেই জলদি জলদি ফিরে আসবে কিন্তু। অধীর আগ্রহে তোমার পথ চেয়ে থাকবো আমি।

মুহম্মদ আলীও আবেগভরে বললো অবশ্যই- অবশ্যই। তোমাকে কাছে পাওয়ার অদম্য আগ্রহ আমিও আর চেপে রাখতে পারছিনে। যথাসময়ে বাড়িতে এসে হাজির হলো মুহম্মদ আলী। সবার সাথে আলাপ আলোচনা করে স্ত্রী ত্যাগের আয়োজন সম্পন্ন করে ফেললো সে। খবর পেয়ে পুত্র মেহেরুল্লাহকে সাথে নিয়ে মুহম্মদ আলীর শ্বশুরও এসে হাজির হলেন। মেয়ের আচরণের ব্যাপারটা তিনিও অনেকখানি জানতেন। তবুও এসে তিনি প্রথমে কিছুক্ষণ সমঝালেন। কিন্তু মেয়ে-জামাইয়ের মধ্যে বনিবনা আর কিছুতেই সম্ভব নয় দেখে, ভারাক্রান্ত মনে মেয়েকে ছাড়িয়ে নিতে তিনিও রাজী হলেন।

পরের দিনই কোরবানীর ঈদ। বাড়িতে এসেই দুটি বড় বড় খাসী কিনেছে মুহম্মদ আলী। তালাকের ঝামেলাটা আজই মিটিয়ে ফেলে আগামীকাল সে নিশ্চিন্ত মনে ঈদ করতে চায়। সে মোতাবেক কাজীকে আগেই বাড়িতে আনা হয়েছিল। মুহম্মদ আলীকে সামনে বসিয়ে তালাকনামা লিখতে লাগলেন কাজী সাহেব।

মুহম্মদ আলীর ছেলে মেয়েরা বয়সে তখনও ছোট। এসব কিছুই বোঝে না। ছেলে আর মেয়েটি ছাগল দুটির একটিকে এই সময় কাজীর সামনে উপবিষ্ট মুহম্মদ আলীর কাছে টানতে টানতে এনে বললো– আব্বু, এটা কিছুই খাচ্ছে না। নতুন কিছু পাতা কেটে দিতে হবে, এসো।

শুনে তাদের নানাজান ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন– ইহ্ঃ, পাতা কেটে দেবে! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ঐ ছাগল। বাড়ি ছেড়ে এখনই যাদের চলে যেতে হবে, তারা ছাগলটাকে পাতা কেটে দেবে! আহম্মক কাঁহাকার।

মেয়ের চেয়ে ছেলেটা একটু বড়। সে অবাক হয়ে বললো– কেন, বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে কেন?

কেন আবার! তোমার আম্মাকে আর রাখছে না তোমার আব্বা। চিরদিনের মতো এ বাড়ি থেকে বিদায় করে দিচ্ছে।

ছেলেটি ফের প্রশ্ন করলো– বিদায় করে দিচ্ছে মানে?

মানে তাড়িয়ে দিচ্ছে। তোমাদের সবাইকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। এখনই এই বাড়ি ছেড়ে আমার বাড়িতে যেতে হবে তোমাদের। চলে এসো...

প্রবল আপত্তি তুলে ছেলেটি বললো– না না, কাল ঈদ। আমি যাবো না।

যাবে না মানে? তোমার আম্মাকে তাড়িয়ে দিলে তোমরা থাকবে কার কাছে? আম্মাকে তাড়িয়ে দেয়া মানে তো তোমাদেরও তাড়িয়ে দেয়া। চলে এসো জলদি জলদি... ...

ছেলেটি এবার মুহম্মদ আলীকে প্রশ্ন করলো– তাই নাকি আব্বু? আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছো তুমি? আমাদের তাড়িয়ে দিয়ে একাই তুমি ঈদ করবে এখানে?

ছেলেটি চোখ দুটি ছলছল করতে লাগলো। মুহম্মদ আলী ছেলের দিকে চেয়ে রইলো একদৃষ্টে। মুখে কিছু বললো না।

এই সময় মেহেরুল্লাহকে একা একা অন্দর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে তার আব্বা তথা মুহম্মদ আলীর শ্বশুর বিরক্তির সুরে বললেন– কি হলো? একা একা বেরিয়ে এলি যে? মাজেদা কই?

মেহেরুল্লাহ বললো মাজেদা কেবলই বসে বসে কাঁদছে। ঘর থেকে কিছুতেই বেরুচ্ছে না।

: বেরুচ্ছে না মানে?

: বলছে, জান গেলেও ঐ ঘর ছেড়ে সে যাবে না।

মুহম্মদ আলীর শ্বশুর ফের তিক্তকণ্ঠে বললে– এ্যাহ! ঘর! এখনই যে ঘর তার জন্যে হারাম হয়ে যাচ্ছে, সেই ঘর ছেড়ে যাবে না! যা, ডানা ধরে টেনে বের করে নিয়ে আয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই রঙ্গো আর কতক্ষণ দেখবো?

মেহেরুল্লাহ ফের অন্দরে চলে গেল। তালাকনামা লেখা ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কাজী সাহেব এবার রেজিষ্ট্রি বুক মেলে ধরে মুহম্মদ আলীকে বললেন– নিন, তালাকনামায় সই দিন। এই যে এখানে আর এখানে।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে মুহম্মদ আলী বললো– এ্যাঁ, সই দেবো?

কাজী সাহেব বললেন– হ্যাঁ। আপনি সই না দিলে তো এর কোন মূল্য নেই। বিবি তালাক হবে না।

মুহম্মদ আলীকে তবুও গড়িমসি করতে দেখে তার এক আত্মীয় এগিয়ে এসে বললেন– দাও দাও, সই দিয়ে জলদি জলদি আপদ বিদায় করে দাও...

মুহম্মদ আলী নিষ্প্রভকণ্ঠে বললো– বিদায় করে দেবো?

আত্মীয়টি উৎসাহ দিয়ে বললেন– দেবে না? সামনে তোমার যারপর নেই সুখের দিন। আনন্দঘন জীবন। সুন্দরী আর শিক্ষিতা স্ত্রী নিয়ে পরম শান্তির সংসার। এই নরকে আর পচে মরবে কতদিন?

: কিন্তু...

: ফের কিন্তু! একদিকে পরম শান্তি আর একদিকে চরম অশান্তি আর দুর্ভোগ। পরম শান্তি রেখে চরম অশান্তি আঁকড়ে ধরে থাকে কোন বেয়াকুফ।

মুহম্মদ আলী এবার সোজা হয়ে বসে স্পষ্টকণ্ঠে বললো– তাই আমি আঁকড়ে ধরে থাকবো। আগামীকাল পশু কোরবানীর আগে ঐ পরম শান্তিকে আজই আমি কোরবানী করে দিলাম।

: তার মানে?

: মানে, বউবাচ্চা কাউকেই আমি বিদায় করতে পারবো না। কাজী সাহেব বিস্মিতকণ্ঠে বললেন– সে কি! তাহলে সই করবেন না তালাকনামায়?

মুহম্মদ আলী অবিচলকণ্ঠে বললো– না। আপনার যা পাওনা তার চেয়ে কিছু বেশিই দিয়ে দিচ্ছি কাজী সাহেব। খাতাপত্র নিয়ে মেহেরবানী করে বিদায় নিন আপনি।

www.boighar.com

বইঘর ও বিএবিডি

www.boighar.com

অপরিণামদর্শী

এই... এই, করিস কি... করিস কি? আর কয়েক কদম এগুলেই খেয়াঘাট। এখানে খামাখা...

: আরে দুর! হাতের কাছে নাও থাকতে ঐ কয়েক কদমই বা হাঁটতে যাবো কেন?

: কিন্তু এটা তো খুঁটির সাথে তালা দেয়া নাও। গরীব শরাফতের ভাঙ্গাচুরা নৌকা। খুঁটির সাতে তাই তালা দিয়ে রেখেছে।

: রাখুন আপনার খুঁটি আর তালা! এসব খুঁটি তালার কোন পরোয়া করে নাকি এই সাজ্জাদ আলী তলবদার। বাঘা বাপের বাঘা বেটা, বুঝলেন?

বলতে বলতে নরম মাটিতে পোঁতা খুটিটা টেনেটুনে তুলে ফেললো সাজ্জাদ আলী। তালা-সমেত খুঁটিটা নৌকার উপর সশব্দে ফেলে দিয়ে সঙ্গীটিকে বললো– নিন, উঠুন নায়ে।

সঙ্গীটি একজন মাঝ বয়সী লোক। লেখাপড়া জানা মানুষ। তিনি আপত্তি তুলে বললেন– লগি-বৈঠা কিছুই নেই। নদীতে ভীষণ স্রোত। নৌকাটা ঠেলবি কি দিয়ে?

: করছি করছি, সে ব্যবস্থাও করছি...

বলেই সামনের একটা লাউয়ের মাচার দিকে দৌড় দিলো সাজ্জাদ। মাচা ভর্তি লকলকে লাউয়ের গাছ। কচি লাউও দেখা দিয়েছে কিছু কিছু। সেই মাচাটা মূল যে বাঁশের উপর খাড়া ছিল, সেই বাঁশটিই অর্থাৎ মূল পাহাড়টিই সর সর করে টেনে নিলো সাজ্জাদ। তলে থেকে পাহাড়টি সরে যাওয়ার সাথে সাথে গোটা মাচাটা সশব্দে পড়ে গেল মাটিতে। কচি লাউ সমেত গোটা মাচার লাউগাছ ছিঁড়ে ছুটে মাটিতে পড়ে তছনছ হয়ে গেল।

মাথায় হাত দিয়ে সঙ্গী মুরুব্বী বললেন– হায় হায়, করলি কিরে? কোন অভাগার এই সর্বনাশ করলি তুই?

বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত না হয়ে সাজ্জাদ আলী পরম পুলকে হাসতে হাসতে বললো– হিঃ হিঃ হিঃ, লাউগাছের দফা একদম রফা! সবগুলোকে বিলকুল ঠাণ্ডা করে দিয়েছি। হিঃ হিঃ হিঃ! খা শালা, লাউ খা!

: সাজ্জাদ!

: নিন, তাড়াতাড়ি, উঠুন নায়ে। ভয় করিনে কোন শালাকে, তবু কেউ দেখে ফেললে ঝামেলা হবে।

বইঘর ও বিএবিডি
সঙ্গীটি সহকারে সাজ্জাদ ঐ বাঁশ দিয়ে নাও বেয়ে নদীর এ পাড়ে চলে এলো । নাও থেকে আগে নামলেন তার সঙ্গী মুরুব্বী । তারপর সাজ্জাদ নাও থেকে নেমেই সজোরে এক ঠেলা মেরে নাওটাকে একদম মাঝ নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে সোল্লাসে বলে উঠলো– চলে যা বর্ধমান...

মাঝ নদীতে পৌঁছেই নাওটি প্রবল স্রোতে পাক খেয়ে খেয়ে ভেসে চললো ভাটির দিকে । তা দেখে ফের চমকে উঠলেন সঙ্গী মুরুব্বী । আফসোস করে বললেন– আরে আরে, সর্বনাশ! এ আবার তুই কি করলি? নাওটা তো হারিয়ে যেতে পারে । তাছাড়া, নায়ের ফাটাফুটো দিয়ে পানি উঠছে অবিরাম । মাঝ দরিয়ায় ওটা ডুবেও যেতে পারে । হায় হায়, গরীব শরাফত নাওটা হয়তো আর খুঁজেই পাবে না ।

সাজ্জাদ আলী একইভাবে উল্লাসভরে বললো– ওর বাপের সাধ্যি নাই যে আর পায়! ওটা এখন চলে যাচ্ছে সোজা বর্ধমান, হিঃ হিঃ হিঃ!

হাসতে হাসতে হাতের বাঁশটাও সে ফিঁকে দিলো মাঝ দরিয়ায় । ফিঁকে দিয়েই ফের বিপুল আহ্লাদে হেসে উঠে বললো– যা, মা যেখানে, ছাও সেখানে চলে যা... হেঃ হেঃ হেঃ!

সাজ্জাদের আক্কেল আচরণ দেখে সঙ্গীটি তার একদম লা-জবাব!

অন্য একদিন এমনই লা-জবাব হলো সাজ্জাদ আলীর অন্য একজন সঙ্গী । ঠিক সঙ্গী নয়, এ লোক সাজ্জাদের বন্ধু । তবে মানসিকতায় অনেকখানি মিল থাকলেও সাজ্জাদের এই বন্ধুটি সাজ্জাদের মতো এতটা অমানুষ আর উচ্ছৃঙ্খল নয় । কিছুটা মনুষত্ব তখনও তার মধ্যে আছে ।

পথ বেয়ে দুই বন্ধু হাঁটছে । আগে সাজ্জাদ, পেছনে বন্ধু । সাজ্জাদের হাতে ধারালো এক দা । কিছুদূর আসতেই সাজ্জাদের সামনে পড়লো তার প্রতিবেশীর ফজলি আমের এক কচি কলম গাছ । বছর দুয়েক বয়স ঐ গাছটার । সবে ডালে পাতায় গাছটা তেজবান হয়ে উঠেছে । গাছটা চোখে পড়তেই সাজ্জাদ ধারালো দা দিয়ে গোড়ায় কোপ মারলো সজোরে । সঙ্গে সঙ্গে ডালপালা সমেত মাটিতে লুটিয়ে পড়লো গাছটি । তা দেখে বন্ধুটি তার হকচকিয়ে গেল । সবিস্ময়ে বললো– এ তুই কি করলি? অন্যের এমন একটা বাড়ন্ত গাছ অকারণেই কেটে ফেললি তুই? তোর কি পাপপুণ্যের একটুও ভয় নেই?

সাজ্জাদ আলী অবহেলে বললো– দূর দূর! রেখে দে তোর পাপপুণ্য । শালারা আম খাবে আর আমরা চেয়ে চেয়ে দেখবো? সুখ করে ফজলি আম খাবি শালারা? সে গুড়ে এখন বালি! পুরো একবস্তা বালি ঢেলে দিলাম– হাঃ হাঃ হাঃ । আর একদিন সন্ধ্যায় খুব মুডের সাথে ঘরে ফিরলো সাজ্জাদ আলী । যেন কি একটা জয় করে ফিরে এলো সে । সেদিন তার এক সম্বন্ধী তার বাড়িতে ছিল । তার ভাব দেখে সম্বন্ধী প্রশ্ন করলো– কি ব্যাপার! ভাব দেখে মনে হচ্ছে, কোন রাজ্যটাজ্য জয় করে এলে?

সাজ্জাদ আলী বীরদর্পে বললো– জয় নয়, একদম সাবাড় করে দিয়ে এলাম ।

: সাবাড়! কি সাবাড় করে দিয়ে এলে?

: নদীর ওপাড়ের ঐ মেহেরে তরমুজ। শালা আমাদের মাঠে এসে তরমুজের আবাদ করেছে। সুখ করে তরমুজ খাবে। আমার সামনে পড়ে গেল, আর যায় কই? শালার তরমুজের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে এলাম। একটা তরমুজও তো দেয় না কোন দিন!

: বারোটা বাজিয়ে এলে মানে?

মানে, প্রচুর কচি কচি জালি পড়েছে। তরমুজের ছোট বাদাবি লেবুর মতো এক একটার সাইজ। লাথি মেরে মেরে সবগুলো ফাটিয়ে দিয়ে এলাম। ওহঃ! কচি তরমুজ লাথি মেরে ফাটাতে যে কি সুখ, তা আর বলে বোঝাতে পারবো না। দশ কাঠা জমির তরমুজ ফাটাতে আমার দশটা মিনিটও লাগলো না। শালা তরমুজ খা– হিঃ হি হিঃ!

: সেকি! এতবড় সর্বনাশটা করে এলে?

: আরে সর্বনাশটাতো আমার নয়। ওপারের ঐ মেহেরের। আমি পায়ের সুখটা করে নিলাম– হেঃ হেঃ হেঃ।

তার সম্বন্ধীটা নাখোশকণ্ঠে বললো– একি তোমার স্বভাব! সেদিনও ঐ পাটকোল থেকে আসারকালে এক লোকের কলা বাগানের অতগুলো লকলকে কলাগাছ তুমি হাঁসুয়া দিয়ে সাবাড় করে দিলে। ওটা কি উচিত তোমার?

জবাবে সাজ্জাদ বললো– কি করবো বলো? হাতে হাঁসুয়া আর সামনে কচি কচি কলাগাছ। আর কি চুপ থাকা য়ায়? হিঃ হিঃ হিঃ।

: তাই কচু কাটা করলে! বিড়ি ধরিয়ে আগুন ফেলে আর একদিন একজনের খড়ের ভুঁই পুড়িয়ে দিলে অর্ধেকটা। এ সব কেউ টের পেলে কি হতো?

সাজ্জাদ আলী দম্ভভরে বললো– কি হতো? কোন শালাকে কি পরোয়া করে এই বাঘা বাপের বাঘা বেটা সাজ্জাদ আলী তলবদার?

পরের অনিষ্ট করার এমন হাজারটা ঘটনা আছে সাজ্জাদ আলীর জীবনে। নেই শুধু সেজন্যে তার বিন্দুমাত্র অনুতাপ।

এ দুনিয়ায় কিছু লোক জন্মগ্রহণ করে শুধুই ভোগ আর ধ্বংস করার জন্যে। ত্যাগ, সৃষ্টি ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়াগুলি আদ্যঅন্তই অনুপস্থিত তাদের মধ্যে। ভোগ ছাড়া ত্যাগ, অর্থাৎ কোরবানের প্রবণতা একান্তই স্বভাববিরুদ্ধ তাদের। অন্যের ক্ষতি করা তাদের কাছে কেবলই একটি খেলা ও উপভোগ্য বিষয়। বরাবরই এরা অবিবেচক, কর্মবিমুখ ও দায়িত্বহীন মানুষ। চিরটাকাল পরের খেয়েই বেঁচে থাকতে চায় এরা। শুধুই ভোগ করতে চায়। ফলে, চুরি চামারি আর ছল-চাতুরিই শেষ পর্যন্ত তাদের প্রধান জীবিকা হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমের প্রশ্নটি হয় গৌণ ও অবাঞ্ছিত।

এমনই একজন দায়িত্বহীন ও কর্মবিমুখ পরগাছা এই সাজ্জাদ আলী তলবদার। এই 'গ্র্যাসহোপার' সাজ্জাদ আলীর বাপটা কায়দা কৌশল করে আর এতিম গরীব মেরে বেশ কিছুটা ভূ-সম্পত্তি করেছিল। সেই সাথে পাঁচ গাঁয়ের অনেকটা স্বঘোষিত

একজন অন্যতম মোড়লও সেজে ছিল। সেই গরমেই সাজ্জাদ আলীর পা পড়ে না মাটিতে। ধনী আর মানী বাপের বেটা সে। তার কি পরিশ্রম করা সাজে, না তা তার মানায়? তাই সে জীবনের শুরু থেকেই ড্যাম কেয়ার ভাব নিয়ে ডু-ফূর্তি জীবন যাপন করতে থাকে আর যা খুশি তাই করে যায়।

কিন্তু ঐ যে কথায় আছে 'হাসির পর আছে কান্না' ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত সেই রকমই হলো। অনেকগুলো ভাইবোনের মধ্যে ভাগ হওয়ার ফলে সাজ্জাদ আলীর অংশে যে ভূ-সম্পত্তি পড়েছিল তা এমন কিছু বেশি নয়। দশ বারো বিঘে হবে বড় জোর। বসে খেলে রাজভাণ্ডার ফুরায়, বেচে খেলে দশ বারো বিঘে ভূঁই ফুরাতে কয়দিন? তর তর করে ফুরিয়ে যেতে লাগলো তার জমি। তা দেখে তার বউ বললো– আয় উপায়ের পথ কিছু দেখো। এরপর তো অনাহার।

কিঞ্চিৎ হুঁশ হলো সাজ্জাদের। কিন্তু আয় উপায়ের পথ বলতে মানুষের বাড়িতে মজুর খাটা ছাড়া আর কোন যোগ্যতা বা পথ তার ছিল না। কিন্তু মানী বাপের ছেলে সে। তার সেটা চলে না। তাই আবার জমি বেচেই সে মোষ গাড়ী করলো এবং মানুষের মাঠের ধান বাড়িতে বয়ে দিয়ে ধান আদায় করতে লাগলো। কিন্তু এতেও অনেক খাটুনি। এ খাটুনি তাকে মানায় না আর তার ধাতেও সয় না। বেচে দিলো মহিষগাড়ি আর বসে খেয়ে সে টাকা ফুরিয়ে দিলো অল্প দিনেই। এরপর আবার জমি বেচে সে কয়েকটা নানা রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করলো। কিন্তু দায়িত্বহীনতার জন্যে কয়েকদিনের মধ্যেই লাটে উঠলো সব রকমের ব্যবসা। এছাড়া এসব ক্ষুদ্র ব্যবসাতে আয় কম, খাটুনি বেশি, আর আড্ডা মারার সময়টা আরো কম। এতটা বরদাশত করতে পারে না বাঘা বাপের বাঘা বেটা। সব বাদ ছাদ দিয়ে সে আড্ডায় এসে বসলো আর অবশিষ্ট জমিটুকু বেচে খেতে লাগলো।

ছয় মাসেই ফুরিয়ে গেল সব জমি। অবশিষ্ট রইলো বসত বাড়িটুকু। বসতবাড়িটা তার এক ভাইয়ের সাথে রেওয়াজ বদল করে সে এক বিঘে জমি পেলো উর্ব্বর। সবাই বললো আর বেচে না খেয়ে ঐ জমিতে আবাদ করে খাও। কিন্তু সাজ্জাদের দর্শন আলাদা। প্রাপ্ত ঐ জমির ইতিমধ্যেই দাম উঠেছে চল্লিশ হাজার টাকা। ঐ টাকায় ধান কিনলে দুইশো টাকা মণ দরে সে দুইশো মণ ধান কিনতে পারে এখনই। অথচ আবাদ করে খেতে গেলে বছরে সে ধান পাবে বড়জোর পঁচিশ মণ। দুইশো মণ ধান পেতে তার আট বছর লাগবে। এর সাথে আছে আবাদ করার খাটুনি আর সার পানির খরচ। এত ঝামেলা কি সহ্য হয় মানী লোকের মানী ছেলের? বেচে দিলো জমি আর সে টাকা ধূম করে খেয়ে ফুরিয়ে দিলো বছর দেড়েকের মধ্যেই।

কাঠা দেড়েক মাটি অবশ্য তখনও তার গ্রামের এক প্রান্তে অবশিষ্ট ছিল এবং সেখানেই চালা তুলে দেড় বছর কাটালো। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। এরপর হাত পড়লো সেই মাটিতে। ওটা বেচার পর তার আর দাঁড়ানোর ঠাঁইটাও রইলো না। ভাইয়েরাও কেউ ঠাঁই দিলো না তাকে। উল্লেখ্য যে, তার দুই দুইটি ছেলে

বইঘর ও বিএবিডি
আবাল্যের চোর। চুরি করে তারা এখন পলাতক। তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিশ আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। সাজ্জাদ আলী এখন বউ নিয়ে যায় কার কাছে আর মাথা গোঁজে কোথায়?

ভাগ্যের লিখন! এই আপদ এসে পড়লো শেষে নিরীহ মানুষ জনাব আব্দুল মতিনের ঘাড়ে। মস্ত বড় বিদ্বান মানুষ আব্দুল মতিন সাহেব। মস্তবড় চাকরি করেন শহরে আর বালবাচ্চা নিয়ে শহরেই থাকেন। তাঁর গায়ের খালি বাড়িটা তাঁর এক আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে ছিল। ধান চালসহ মূল্যবান জিনিসপত্র সব দক্ষিণ দুয়ারী ঘরে ছিল তালাবদ্ধ অবস্থায়। প্রায় খালি পড়েছিল তাঁর খান দুয়েক ঘর। সাজ্জাদ আলী এসে শেষে এই মতিন সাহেবের কাছে গড় হয়ে পড়লো। মাথা গোঁজার একটুখানি স্থান ভিক্ষে করলো দুই হাত জোড় করে। কিছুদিনের ঠাঁই।

দয়া হলো মতিন সাহেবের। গাঁয়ের বাড়ির একখানা খালি ঘর তাকে ছেড়ে দিলেন তিনি। সাজ্জাদ আলী সপরিবার খোশদিলে সেই ঘরে এসে উঠলো আর এর পরে পরেই শুরু হলো মতিন সাহেবের পস্তানোর পালা। ব্যস্ত মানুষ তিনি। কর্মস্থল থেকে গাঁয়ের বাড়িতে আসার তাঁর মোটেই সময় ছিল না। তাই কর্মস্থলে বসে তিনি নিত্য নতুন খবর পেতে লাগলেন।

প্রথম খবর তাঁর বাঁশঝাড়ের অনেক বাঁশ কেটে বেচে খেয়েছে সাজ্জাদ আলী। কয়েকদিন পরে আবার খবর– দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের তালা ভেঙ্গে অনেক জিনিস চুরি করে সে বেচে দিয়েছে হাটে। অবশ্য সাজ্জাদ আলীর জবাব, চোর সে নয় অন্য গাঁয়ের চোর এসে চুরি করেছে রাতে। ঘুমিয়ে থাকার কারণে টের পায়নি তারা।

তৃতীয় বার খবর এলো– ঘরের চাতালে রাখা ধান চাতালের তালা ভেঙ্গে আর বাক্সের মধ্যে রাখা মূল্যবান জিনিসপত্র বাক্সের তালা ভেঙ্গে চুরি করার সময় সাজ্জাদকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছে গ্রামবাসী।

এবার আর মতিন সাহেব চুপ থাকতে পারলেন না। লোক দিয়ে সাজ্জাদকে বলে পাঠালেন তিনদিনের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে না গেলে পুলিশ পাঠাবেন তিনি। এর আর অন্যথা হবে না।

চোরের বড় পুলিশের ভয়। তিন দিনের মধ্যেই সে মতিন সাহেবের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। গেল বটে, তবে খালি হাতে গেল না। তার নিজের সামান্য জিনিসপত্রের সাথে যে ঘরে থাকতো সে ঘরের চাতালে রাখা মতিন সাহেবের তামাম বাঁশ কাঠ দিজের দাবি করে সাজ্জাদ তার ভাইয়ের বাড়িতে পার করে নিয়ে গেল। শুধু তাই নয়, গোটা গোটা বাঁশের বিরাট বেড়া ছিল মতিন সাহেবের বাড়ির চৌহদ্দি ঘিরে। সুযোগ মতো তারও প্রায় সবটুকুই ভেঙ্গেচুরে নিয়ে গেল সাজ্জাদ আলী। উদ্দেশ্য এই বাঁশকাঠ দিয়েই ঘর বানিয়ে সে বাস করবে ভাইদের বাড়িতে।

আপদ বিদেয় হয়েছে– এই শুনেই খুশি হলেন মতিন সাহেব। ঐ ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আর মাথা ঘামাতে গেলেন না। সে সময়ও তাঁর ছিল না। কিন্তু খবর পেতে লাগলেন তিনি আগের মতোই। আগের মতোই পরপর আরো তিনটি খবর পেলেন

বইঘর ডট বিডি

তিনি। এক নম্বর খবর– ভাইয়েরা তাকে স্থান দেয়নি বাড়িতে। নিয়ে যাওয়া বাঁশ কাঠও সে পায়নি। তার ভাবীরা সেগুলো লাকড়ি নিয়ে ধুম করে পুড়িয়েছে। দুই নম্বর খবর– বউ নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েও সুবিধে হয়নি তার। গরীব শালা সম্বন্ধিরা তাকে খাদ্য আশ্রয় কিছুই দিতে পারেনি। সে এখন সে গাঁয়ের এক লোকের এক পতিত চালার নিচে বাস করে আর মজুর খেটে খায়। অন্ন বস্ত্রের অভাবে আর নিদারুণ শীতে হাঁড়গিলের চেয়েও করুণ চেহারা হয়েছে তার এখন।

সর্বশেষ খবর– খড়ের বোঝা টানার মজুর খাটতে গিয়ে বোঝা মাথায় তোলার সময় হার্টফেল করে মারা গেছে বাঘা বাপের বাঘা বেটা সাজ্জাদ আলী তলবদার।

www.boighar.com

পথের ছেলে

কোর্টের কাজ শেষ করে হাকিম সাহেব এজলাস থেকে নামলেন। নামতে গিয়েই হঠাৎ তিনি থামলেন কোর্টের গেটে গোলমাল শুনে। কয়েকজন লোক একটা বিক্ষত নারীদেহ কোর্টের একদম সামনের রাস্তা থেকে তুলে কোর্টের মধ্যে আনলেন এবং হাকিমকে নামতে দেখে বাধা নিষেধ ঠেলে হাকিমের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দেহটির দিকে চেয়েই যারপর নেই চমকে উঠলেন হাকিম সাহেব। আওয়াজ দিলেন আহ! একি!!

থমকে গেলে আগন্তুকেরা। একজন সাহস করে বললেন– মহিলাটি আপনার কাছেই আসছিলেন হুজুর। হাতে দরখাস্ত নিয়ে এই রাস্তাটা পার হতেই একটা ট্রাক এসে এঁকে আস্ত লাশ বানিয়ে রেখে গেল। জানটা এখনো আছে হুজুর! হাসপাতালে তাড়াতাড়ি–

: গাড়ি, আমার গাড়ি আনো জলদি...

আর্ডালিকে হুকুম দিয়েই হাকিম সাহেব ছুটে এসে হাত লাগালেন ঐ বিক্ষত দেহে। আর দেহটা গাড়িতে তুলে নিয়েই তৎক্ষণাৎ ছুটলেন হাসপাতালের উদ্দেশে।

ধন্য ধন্য রব উঠলো এজলাসে। অনেকেই বললেন অন্য কোন হাকিম হলে মোটেই গণ্য করতেন না এসব। বিপন্নের দিকে চোখ তুলেও তাকাতেন না এক লহমার জন্যে। এ হাকিম বরাবরই মহৎ চরিত্রের মানুষ। হৃদয়বান ও সদাশয়। এমন কাজ এমন জনকেই সাজে।

একটু পরেই এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে এজলাসের দোরগড়ায় দাঁড়াতেই পড়ে গেলেন আর পড়ে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন– কোথায়, মেয়েটা কোথায়? গাড়ি এসে যাকে চাপা দিয়ে গেল সেই মেয়েটা...!

একজন সৎ প্রকৃতির উকিল তখনই তাকে তুলে একটা চেয়ারে বসালেন এবং বললেন– সে এখন হাসপাতালে। কিন্তু আপনি?

আগন্তুক ভদ্রলোকটি বললেন– আমার নাম আলম মাষ্টার। আমি একজন স্কুল শিক্ষক আর ঐ মহিলাটির প্রতিবেশী। আমিই ওর সাথে এসেছিলাম। গাড়ি এসে ধাক্কা দিলে আমি ছিটকে গিয়ে রাস্তার ধারে পড়লাম আর মেয়েটা পড়লো গাড়ির নিচে।

– বলেই আলম মাষ্টার ব্যস্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন– ওকি বেঁচে আছে?

উকিল সাহেব বললেন– এখনো আছে, আর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এরপর দেখা যাক কি হয়!

কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে আলম মাষ্টার বললেন– আলহামদুলিল্লাহ। পায়ে আমার চোট লেগেছে ভীষণ। পড়ে যাওয়ার পরে পরেই উঠে দাঁড়াতে পারিনি। এখন আমি কি যে করি।

: কিছুই করার নেই আপনার। আমাদের খোদ হাকিম সাহেব তাকে গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। এক্ষুণি ফিরে আসবেন তিনি। কোথায়, কোন হাসপাতালে আর কত নম্বর কক্ষে রাখা হয়েছে তাকে– এসব জেনে নিয়ে তবে যাবেন সেখানে।

: জি আচ্ছা, তাই করি।

বসে থেকে মৃদু মৃদু ধুঁকতে লাগলেন আলম মাষ্টার। উকিল সাহেব প্রশ্ন করলেন ঘটনা কি, বলুন তো? মেয়েটা এভাবে...

শ্বাস নিয়ে আলম মাষ্টার বললেন– সব দোষ ঐ মেয়েটার বাপের। আর বাপেরই বা বলি কেন? দোষটা মূলত আমাদের এই সমাজের জনাব।

: আমাদের সমাজের?

: পক্ষান্তরে তাই। বিপরীত মূল্যবোধের।

: অর্থাৎ...!

একটু দম নিয়ে আলম মাষ্টার বললেন– জনাব সেরেফ ভেজাল আর গোঁজামিলের উপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের আজকের এই সমাজটা। মুষ্টিমেয়রা আজ মজা করে ঘি ভাত খাচ্ছে আর অধিকাংশ সোজা কবরের পথ ধরেছে অনাহারে আমশি হয়ে। স্পষ্ট কথা হলো, সমাজটা আমাদের একদম নষ্ট হয়ে গেছে। কষ্ট করে এটাকে সুষ্ঠু করার চেষ্টা করা কেষ্টো ঠাকুরের স্বভাবটা শিষ্টাচারের আওতার মধ্যে আনার চেয়েও কঠিন কাজ। কারণ, বদলে গেছে আমাদের অতীত মূল্যবোধের ধারাটি। অনিয়মের গর্তে পড়ে পাল্টে গেছে সে মূল্যবোধের অর্থ আর স্থানীয় মান। 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী'– এ কথাটা ঠিক আছে। ব্যবসা বাণিজ্য মানেই ফটকা মারার মটকা সরেস খেলা। কিন্তু 'তদার্ধনাং কৃষি কাজে' এটা বিলকুল বেঠিক। 'তদার্ধনাং রাজ সেবায়'– একদম পাগলের প্রলাপ। 'ভিক্ষায় নৈবচঃ নৈবচঃ' এ উক্তিটিও আজ যুক্তিহীন। প্রবাদটি এখন যা দাঁড়িয়েছে তাহলো 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী তদার্ধনাং রাজ সেবায়, তদার্ধনাং ভিক্ষায়, আর কৃষি কাজে নৈবচঃ নৈবচঃ।' এখন বাণিজ্যের পরেই আসে রাজসেবা। মোটা মাইনে উপরি পাওনা আর মারিং কাটিং-এর বদৌলতে রাজসেবায় অর্থাৎ সরকারি চাকরিতে এখন বিস্তর পয়সা। এ কারণেই লোকে বলে– 'যৎতৎ চাকুরী, ঘি ভাত।' সৎ থেকে রাজসেবা করলেও ঘি ভাত না হোক, মাছ ভাত আজ লাঠির আগায় বাঁধা। রাজ সেবার পরেই আসে ভিক্ষাবৃত্তি। ভিক্ষে করেও

আজকাল কেউ কেউ জমি কিনছে, দালান দিচ্ছে। এতে করে কৃষি কাজেই আজ নৈবচঃ নৈবচঃ। প্রকৃতির খেয়ালে আর দালাল ও দুর্জনদের গেঁড়াকলে পড়ে এ দেশের কৃষককুল আজ সর্বশান্ত। উচ্চ ফলনশীল ফসল ফলিয়ে নখে গোনা কয়েকজন কলাগাছ হলেও গোটা কৃষককুলের অবস্থা আজ তথৈবচঃ। এর সাথে অধিকাংশ কৃষকই অশিক্ষিত আর অবিবেচক। অনেকেই আবার আলসে আর অপরিণামদর্শী। সব মিলে কৃষককুলের দুরবস্থা আজ সকল দুরবস্থার উপরে। তাই ভিক্ষেয় নয়, কৃষিকাজেই আজ নৈবচঃ নৈবচঃ।

অধৈর্য হয়ে হাত তুললেন উকিল সাহেব। বললেন থামুন। এসব কথার দ্বারা আপনি কি বোঝতে চাচ্ছেন?

আলম মাষ্টার বললেন, মেয়েটার ঐ করুণ পরিণতির কথা। মেয়েটার মূর্খ বাপ প্রাচীন পরিস্থিতির এই পরিবর্তন বুঝতে না পেরে প্রাচীনকালেই হিসেব নিকেশ আঁকড়ে ধরে রইলেন আর মেয়েটাকে সাগরে ডুবিয়ে দিলেন। অর্থাৎ বাণিজ্যের পরেই কৃষিকাজকে স্থান দেয়ার কারণেই মেয়েটার আজ এই হাল হয়েছে। সেরেফ বাপের জেদেই মেয়েটার আজ এই অবস্থা।

: কি রকম, কি রকম?

মেয়েটার নাম সালেহা খাতুন। সে ভালবাসলো বিষয়বিত্ত। জোত ভূঁই আর চাল চুলাহীন আবদুল হামিদ নামের এক ছেলেকে। পুরো নাম আবদুল হামিদ আকন্দ। আগে অবস্থা ভালই ছিল। কিন্তু পরে সে একদম পথের ছেলে বনে যায়। সালেহা এই পথের ছেলেকে ভালবাসলো ছেলেটার সুন্দর স্বভাব আর লেখাপড়ায় সে ভাল দেখে। স্কুলে সে প্রতিবছরই ভাল রেজাল্ট করে।

: তারপর?

তারপর আর কি? লেখাপড়া মানেই তো চাকরি অর্থাৎ রাজসেবা। কৃষিকাজের অর্ধেক যার আয় উপায়। একজন পাকাপোক্ত কৃষক মছির উদ্দীন মণ্ডল কি রাজসেবাকে পাত্তা দেয়। আবদুল হামিদের সাথে সালেহার শাদির কথা উঠতেই গর্জে উঠছলেন মেয়ের বাপ মছির উদ্দীন মণ্ডল। বললেন– কভভি নেহি, এমনটি কভভি নেহি হোগা। ঐ একটা পথের ছেলের সাথে শাদি দেবো আমার মেয়ের? কখ্খনো নয়।

কথাটা শুনে আমি নিজে গেলাম সুপারিশ করতে। বললাম– এটা কি করছেন মণ্ডল সাহেব? আবদুল হামিদ লেখাপড়ায় খুবই ভাল। তার উপর সে অত্যন্ত সৎ স্বভাবের ছেলে। এমন ছেলের সাথে শাদি দেবেন না মেয়ের?

মণ্ডল সাহেব রেগে গিয়ে বললেন– খাওয়াবে কি? শাদি করে আবদুল হামিদ বউকে খাওয়াবে কি? রাখবে কোথায় বউ? ওর না আছে ঘরদোর, না আছে জোতভূঁই।

নিজেই খেয়ে বেড়ায় পরের বাড়ি। তার সাথে শাদি দেবো মেয়ের? শাদি দিয়ে মেয়ে জামাই দু'জনকেই ভাত দিয়ে পালবো?

বললাম– আপাতত কিছুদিন পালন করতে হবে ঠিকই। কিন্তু যেরকম মেধাবী ছেলে, আইএ বিএ পাশ করে বেরুলেই...

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মণ্ডল সাহেব বললেন– রাজ সেবায় লেগে যাবে। তাতে সে কয় পয়সা পাবে? চাকরি করে যা উপায় করবে তাতে কি দুইবেলা ভাত জুটবে দু'জনের? বাচ্চা কাচ্চা হলে তো গোষ্ঠী-সমেত অনাহার। এই ছেলের সাথে শাদি দেবো মেয়ের?

বললাম– তাহলে কোথায় শাদি দেবেন মেয়ের?

বললেন– তয়জুদ্দীনের ছেলে ময়জুদ্দীনের সাথে আগে থেকেই কথাবার্তা পাকা করা আছে। বারো মাস ধান থাকে ওদের গোলায়, গরু আছে গোয়াল ভরা, মাঠে ওদের লাঙল চলে তিন চার খানা। ঐ ময়জুদ্দীনের সাথে শাদি দিলে মেয়ে আমার কখনো না খেয়ে থাকবে না।

বললাম– বলেন কি! ঐ ময়জুদ্দীনটাতো বেজায় উচ্ছৃঙ্খল আর বদচরিত্রের ছেলে। অশিক্ষিত আর অপরিণামদর্শী। ও আপনার মেয়েকে সুখ দেবে কি? তাছাড়া ঐ তয়জুদ্দীনের ছেলে আছে আরো চার চারটে। মাঠে জমি তাদের মোটেই ত্রিশ পয়ঁত্রিশ বিঘে। ছেলেরা পৃথক হয়ে গেলে ঐ ময়জুদ্দীনের ভাগে জমি পড়বে মোটে ছয় সাত বিঘে। তখন ওর গোলাভরা ধান আসবে কোত্থেকে?

মণ্ডল সাহেব তবু জিদ ধরে বললেন– ঐ জমির সাথে বাবুদের জমি বর্গা চষলে তার ধানের অভাব হবে না। ভাতেরও অভাব হবে না মেয়ে জামাইয়ের। বাপু হে কৃষিকাজ বলে কথা। এ কি ঐ রাজসেবা। স্কুলে পড়া ঐ হামদুটার কি বিদ্যা হবে আর চাকরি করে কয় পয়সা উপায় করবে সে? কৃষিকাজের অর্ধেকটার বেশি এক পয়সাও তো নয়। শাস্ত্রের বাণী তুমি অস্বীকার করবে কি করে?

একটু থেমে আলম মাষ্টার ফের উকিল সাহেবকে বললেন– জিদ ধরে ঐ ময়জুদ্দীনের সাথেই মেয়ের শাদি দিলেন মণ্ডল সাহেব। ফলাফল যা হবার তাই হলো। বাপের মৃত্যুর পরে যে ছয় সাত বিঘে জমি ঐ অশিক্ষিত আর অপরিণামদর্শী ময়জুদ্দীন পেলো, কয়েক বছরের মধ্যেই সব জমি বেচে খেয়ে সে নিঃস্ব হয়ে গেল। অতঃপর ঐ সালেহাকে ফেলে রেখে অন্যত্র গিয়ে আর একটা শাদি করলো ময়জুদ্দীন আর ওখানেই থাকতে লাগলো।

উকিল সাহেব ফের প্রশ্ন করলেন– তারপর?

আলম মাষ্টার বললেন– তার পরের কথাই এখনকার কথা। বাপের কাছে পাওয়া বিঘে দেড়েক জমি অবলম্বন করে সালেহা খাতুন দুঃখে কষ্টে কালাতিপাত করছিলো। দুষ্টু স্বামী ময়জুদ্দীন ইদানিং ঐ জমিটুকুও বেঁচে খাওয়ার জন্যে মাঝে

মাঝেই এসে সালেহাকে বেদম মারধোর করতো। আজ সে লোকজন নিয়ে সালেহার ঐ জমিটুকুর পাকা ধান জোর করেই কেটে নিতে এসেছে।

: আচ্ছা!

এই হাকিম এক্ষণে এই কোর্টে এসেছেন শুনে ময়জুদ্দীনের বিরুদ্ধে দরখাস্ত নিয়ে সালেহা এই হাকিমেরই শরণাপন্ন হতে আসছিলো।

এই সময় খবর এলো হাসপাতালে পৌঁছেই মারা গেছে সালেহা। ডাক্তারদের দেখানোর সুযোগ হয়নি।

খবর শুনে আলম মাষ্টার আর্তনাদ করে উঠলেন। নিদারুণ আফসোসের সাথে বললেন– আহারে! পথের ছেলের অপবাদে সেদিনও সালেহা তার ভালবাসার মানুষকে পায়নি, শেষ চেষ্টা করে আজও পেলো না।

উৎকর্ণ হয়ে উঠে উকিল সাহেব প্রশ্ন করলেন– কে সেই পথের ছেলে?

আলম মাষ্টার বললেন– আপনাদের এই হাকিম এ এইচ আকন্দ।

বাহাদুর

'আমি আল্লাহ নামের বীজ বুনিয়াছি,
আমার মন মাঠে,
ফলবে ফসল, বেচবো সে সব কিয়ামতের হাটে।'

: কে আসে? গান গাইতে গাইতে কে আসে? আমাদের আবদুল্লাহ নয়?

: জি হ্যাঁ চাচা, আমিই!

: সে কি, এই রাতে কোত্থেকে আসছো?

: হাট থেকে চাচা, মধুগঞ্জের হাট থেকে।

ওরে বাপরে। কও কি? এতরাতে মধুগঞ্জের হাট থেকে আসছো। আজব কথা! সাথে কেউ আছে, না একা একাই?

: একা একাই চাচা, সাথে কেউ নেই।

: সর্বনাশ! একি কথা কও? সেই বনজঙ্গল, শ্মশান-মশান আর ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে পথ! তোমার ভয় ডর নেই? বাঘ-ভাল্লুক, চোর-ডাকাত– এদের ভয় নেই! একা একা আসতে পথে কোন মুসিবত হলে?

তাতে কি চাচা? যে মুস্কিল দেবে, আসানও সেই দেবে। একা হলেও একদম একা নই চাচা, সাথে আল্লাহ তায়ালা তো আছে।

: আল্লাহ তায়ালা?

: হ্যাঁ চাচা। তাঁকে সাথে না নিয়ে আমি কি কখনো ঘর থেকে বেরোই?

: কও কি? এ যে এক আচানক কথা।

: আমি যাই চাচা, সেই দুপুরের আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। (গুন গুন করে গান ধরে)– আমি আল্লাহ নামের বীজ বুনিয়াছি...

: (ব্যস্তকণ্ঠে) আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, যাও কই?

: বাড়িতে চাচা, যাবো আর কোথায়?

না না, এখন বাড়িতে যাওয়া চলবে না। আগে মাতবরের বাড়িতে যেতে হবে। আমি সেই জন্যেই তোমার খোঁজে এই রাস্তা অবধি এসে দাঁড়িয়ে আছি। মাতবরের বাড়িতে চলো।

: মাতবরের বাড়িতে! কেন চাচা?

ওখানে পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। কে একজন এই ইয়া ব্বড়ো এক গোমা (গোখরা) সাপ মেরে ঐ কালীবাড়ির রাস্তায় ফেলে রেখেছে। ই-য়া মোটা আর কমছে কম সাত আট হাত লম্বা। এতবড় গোমা সাপ এ জীবনে অনেকেই আমরা দেখিনি।

: তাই নাকি?

: হ্যাঁরে বাপজান। বেশ কিছুদিন হলো ঐ সাপটা নাকি কালী বাড়ির ঐ রাস্তায় খুবই উৎপাত করছিল। রাস্তায় কখনো বা বেঁড়ে পাকিয়ে, কখনো বা টান হয়ে পড়ে থাকতো আর মানুষ দেখলেই ফণা মেলে তেড়ে আসতো কামড়াতে। এই গরমের দিনেই নাকি ওটা উৎপাত করতো বেশি।

: আচ্ছা!

: আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবও নাকি কয়েকদিন তাড়া খেয়েছে সাপটার। সাপটা মারা পড়ায় উনি খুব খুশি। সে জন্যেই এই বাহাদুরীর পুরস্কার দিতে আসছেন উনি।

: সাপ মারার পুরস্কার? জব্বোর কথা তো!

: হ্যাঁ বাপজান, কথাটা জব্বোরই। ঐ কাদের মোল্লার বেটা আতর আলী, মানে ইতু মিয়া সারা গাঁ জানান দিয়ে বেড়াচ্ছে, ঐ সাপটা সেই মেরেছে। মানে এই বাহাদুরীর কাজটা সেই করেছে।

: বলো কি চাচা, ঐ ইতু, মানে ভীতু মিয়া এই কাজ করেছে?

: তাইতো ওরা বলছে আর চেয়ারম্যান সাহেব তাকেই পুরস্কার দিতে আসছেন।

: তাজ্জব!

কাদের মোল্লা তাই তোড়জোড়ে আমাদের মাতবরের বাড়িতে এই পুরস্কারের আসর বসিয়েছে। পুরস্কার দেয়া এতক্ষণ হয়েই যেতো। চেয়ারম্যান সাহেব আসতে দেরি করছেন বলে পুরস্কার দিতে দেরি হচ্ছে।

আচ্ছা। তা আতর আলী ইতুর, মানে ঐ ভীতুটার একটা পুরস্কার নেয়ার সখ হয়েছে যখন, নিক গে সে পুরস্কার, আমি আর ওখানে যাই কেন?

: যাই কেন মানে? জিয়াদ আলীরা যে বলছে– ঐ সাপটা তুমি মেরেছো! তারা দূর থেকে সরাসরি এ ঘটনা দেখেছে!

: (স্মিতহাস্যে) দেখেছে নাকি?

স্পষ্ট দেখেছে। একটা মোটা বাঁশ হাতে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে তুমি সাপটাকে বাড়ি মেরেছো আর সাপটাও নাকি ফণা তুলে তেড়ে তেড়ে তোমার দিকে এসেছে। এ ঘটনা ওরা দূর থেকে স্পষ্ট দেখেছে।

: ও, ওরা তাহলে দেখেছে? তখন তো আশপাশে কোন লোক ছিল না।

ওরা ছিল। জিয়াদ আলী আর আবদুল আজিজ, ওরা নাকি তখন অল্প একটু দূরে একটা জাম গাছে চড়ে পাকা জাম নামাচ্ছিলো। দিনের বেলার ঘটনা। পান্তার বেলা হবে নাকি তখন!

: ও আচ্ছা।

: আচ্ছা নয়। ঘটনাটা ঠিক কি না, তাই কও!

: তাই বলবো?

: হ্যাঁ, সেইটাই তো শুনতে চাচ্ছি আমি। ওরা নাকি স্বচক্ষে ঘটনাটা দেখেছে। ওরা কি মিথ্যা বলছে, বলো?

: না চাচা, ওরা খুব সৎ আর সত্যবাদী ছেলে। ওরা কোন মিথ্যা কথা বা বানানো কথা বলে না।

সাব্বাস! সাপটা তাহলে তুমিই মেরেছো, বলো?

জি চাচা। আজকেই পান্তার বেলা আমি ঐ সাপটার পাল্লায় পড়েছিলাম। মানে, সাপটা আমাকে তাড়া করে আসছিল। হাতের কাছে একটা মজবুত বাঁশের খুঁটি পেয়ে গেলাম। তাই না পালিয়ে সাপের সাথে লড়াই জুড়ে দিলাম। বাপরে! সাপটার ফেকাম, মানে তেজ! ইয়া ব্বড়ো ফণা তুলে সে বাঘের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে আমার দিকে আসতে লাগলো। এমনিতেই সাপটা বিশাল। তার উপর ভয়ংকর ফণা মেলে সে যখন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগলো, তখন তাকে দেখে ভয় পায় না কে?

: বাপজান!

কিন্তু ভয় পাওয়ার অবকাশ আমার তখন ছিল না। কারণ, একটু বেসামাল বা বেতাল হলেই যে সাপটার ছোবল খেলে আমাকে মরতে হবে– আমার মধ্যে সে জ্ঞান তখন টনটনে। তাছাড়া আমিও ছাড়ার বান্দা নই। আল্লাহর নাম স্মরণ করে মরিয়া হয়ে উঠলাম। হয় মারবো, নয় মরবো এই পণ করে গিটওয়ালা ঐ বাঁশের খুঁটিটা দিয়ে সাপের মাথায় ঘায়ের পর ঘা মারতে লাগলাম। কয়েকটা ঘা সাপটার মাথায় ঠিক মতো লাগায় তেজ তার কমে গেল। তখন বাড়ির পর বাড়ি মেরে সাপটার মাথা থেতলে দিলাম। সাপটা এবার নিস্তেজ হয়ে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে থাকলে বাঁশের খুঁটিটা দিয়ে গুতিয়ে গুতিয়ে ওটাকে মেরে ফেললাম। তখনই সাপটাকে পুড়িয়ে ফেলতে পারতাম। কিন্তু লোকজন এই বিশাল অজগরটাকে দেখুক– এই মর্মে ঐ রাস্তাতেই ওটাকে ফেলে রেখে চলে এলাম।

চাচা নামক এই লোকটির নাম আহমদুল্লাহ শাহ। গ্রাম সম্পর্কের চাচা হলেও সৎ গুণ আর সৎ স্বভাবের জন্যে আবদুল্লাহকে খুব ভালবাসেন আহমদুল্লাহ শাহ সাহেব। তিনি এবার নেচে উঠে বললেন– সোবহান আল্লাহ! সোবহান আল্লাহ! আর তাহলে শুনছে কে? চলো চলো, চলো শিগগির!

: কোথায়?

: মাতবরের বা।ড়তে, আবার কোথায়? চলো চলো...
আবদুল্লাহকে ঠেলে নিয়েই রওনা হলেন শাহ সাহেব।

নদীটা পূর্ব দিকে আসতে আসতে হঠাৎ করেই একটা মোচড় খেয়ে দক্ষিণ দিকে ঘুরে গেছে। আর এতে করে এখানে একটা বাঁকের সৃষ্টি হয়েছে। ছোট্ট বাঁক। এই বাঁকের দুই দিকে দুই গাঁ। উত্তর দিকের গ্রামটির নাম ডাকমণ্ডপ। হিন্দু মুসলিম সম্বলিত গ্রাম। দক্ষিণ দিকের গ্রামটির নাম হামিরঘোষ। হামিরঘোষ নাম হলেও কোন ঘোষ বা গোয়াল বাস করে না এ গাঁয়ে। আবদুল্লাহদের বাড়ি ডাকমণ্ডপে। পুরস্কারের আসরটিও বসেছে ডাকমণ্ডপের মাতবরের বাড়িতে। এখানে আসছেন স্থানীয় চেয়ারম্যান সাহেব। চেয়ারম্যানের বাড়ি হামিরঘোষে।

নদীটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেই বাঁকটার ঠিক মাথার উপরই ঐ উল্লিখিত কালীবাড়ি। বাঁকের উপর নদীর তীরে একটা বড় বটগাছ ও তার দুইপাশে কিছু ছোট বড় আগাছা। এই গাছ গাছড়ার পূর্বপাশে এ গাঁ থেকে ও গাঁয়ে যাওয়ার পথ। ঐ পথের পরেই পূর্ব দিকে কালীবাড়ি। অর্থাৎ কালী মণ্ডপ। আর মণ্ডপের সামনে আটচালা একটা মস্তবড় টিনের ঘর। কালীপূজার সময় গান বাজনা হয় এই আট চালায়। এই আটচালা আর নদীর পাড়ের ঐ বটগাছ ও গাছগাছড়ার মাঝখানে ঐ চলাচলের পথ। সেই পথ যেখানে সাপটাকে মেলে ফেলে রাখা হয়েছিল।

আবদুল্লাহকে নিয়ে আহমদুল্লাহ শাহ সাহেব যখন মাতবরের বাড়িতে এসে পৌঁছলেন, তখন মাতবরের বাড়ির ভেতরের আঙ্গিনা ও বারান্দাগুলো লোকে লোকারণ্য। চেয়ারম্যান সাহেবের পুরস্কার দেয়া অনুষ্ঠান দেখতে সবাই এসেছে। সবার মুখেই আতর আলী ওরফে ইতু মিয়ার বাহাদুরীর এন্তার তারিফ। মানে, ভূয়সী প্রশংসা। তসরী বিবি নামের মাঝ বয়সী এক মহিলা একাই তখন চিৎকার করে মাথায় তুলেছে বাড়িটা। সে গলা ছেড়ে বলছে– ও মাও... মাও... মা! একি বুকের পাটা গো! ঐ আজরাইল বরাবর সাপটাকে একাই পিটিয়ে মেরে ফেললো আমাদের ইতু মিয়া! ধন্যি বাপের বেটা বাপু! এমন বাহাদুর আর কোন বাপের বেটা আছে নাকি এই দশ বিশটা গাঁয়ে? ওরে বাপরে বাপ! আছে কেউ? তোমরা কেউ দেখেছো নাকি এমন বাহাদুর কোথাও!

কাদের মোল্লা দম্ভ ভরে বললো– নেই নেই! থাকলে তো দেখবে? দশ বিশ গাঁ কি বলছো, পঞ্চাশ ষাটটা গাঁয়ের মধ্যেও এমন বাহাদুর আর কেউ নেই। আমার আতর আলী সেরেফ এটা মানুষ নয়, বুঝলে? সে একদম বাঘের বাচ্চা বাঘ।

এই সময় লাফ দিয়ে খাড়া হলো আতর আলী ইতু। এক বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে সে রুষ্টকণ্ঠে প্রশ্ন করলো– কি কাঁকড়া চাচা, বাপজানের কথাটা তোমার পছন্দ হলো না বুঝি?

গাঁয়ের মুখ্যু-শুক্কু মানুষ বৃদ্ধ কাঁকড়া প্রামাণিক। থতমত করে বললো– কেন বাবা?

বইঘর ও.বিএবিডি
ইতু বললো– বাপজানের কথা শুনে তুমি তোমার চোখ দুটো কপালে তুললে যে?

কাঁকড়া প্রামাণিক সাদাসিধে মানুষ। কোন ঘোরপ্যাঁচ না রেখে সে সরাসরি বললো– তা কথা হচ্ছে যে, ঐ অতবড় একটা অজগর মারা কি কম সাহসের কথা? তোমার বুকে এত সাহস আছে, তা কখনো ভাবিনি কি না, তাই...

আতর আলী বললো– তাই বিশ্বাস করতে পারছো না?

কাঁকড়া প্রামাণিক বললো– হ্যাঁ বাবা, তাই।

ইতু এবার বুকটান করে দাঁড়ালো এবং বুকে দুটো থাবা মেরে বীরদর্পে বললো– কেন সাহস থাকবে না? দেখছো বুকের ছাতি? বিরাশি ইঞ্চি। এই বুকে সাহস থাকবে না মানে?

: তাহলে বোধ হয় তাই। আগে আমি বুঝতে পারিনি সেটা।

: এখন বুঝতে পেরেছো?

: হ্যাঁ হ্যাঁ, পারছি। পারছিই তো। সাপটা জাজ্জিল্যমান মরে আছে যখন, তখন আর না পেরে করবো কি?

করার কিছুই নেই। যেভাবে বসে আছো, ঐ ভাবেই চুপচাপ বসে থাকো। উল্টা পাল্টা করলে খবর আছে, বুঝেছো?

: হ্যাঁ বাবা বুঝেছি। বেটা-পুত কেউ নাই, আমার খবর করবে সবাই– এ আর এমন কি কঠিন কাজ!

কাঁকড়া প্রামাণিক মাথা নিচু করে বসে রইলো। ইতু এবার অদূরে বসে থাকা তাদের এক পেটুয়াকে উদ্দেশ্য করে উচ্চকণ্ঠে বললো– আরে এই ফটকে, হা করে বসে আছিস যে বড়? এতবড় একটা অনুষ্ঠান, বাদ্যি-বাজনার ব্যবস্থা একটু করলিনে?

ফটিক চাঁদ ফটকে গদগদকণ্ঠে বললো– করেছি ইতু ভাই, করেছি। বাদ্যিকারেরা সকলেই রেডি। পুরস্কার দেয়া হয়ে গেলেই তোমাকে নিয়ে মিছিলে বেরুবো আমরা। আজ সারারাত মিছিল করে বেড়াবো।

আতর আলী খুশি হয়ে বললো– এ্যাঁ! মিছিল করে বেড়াবে? জব্বোর কথা! একদম মিছিল?

সঙ্গে সঙ্গে তসরী বিবি খল খলিয়ে উঠলো। বললো– ও মাও... মাও-মা! মিছিল করতে হবে না? এতবড় একজন বাহাদুর তুমি, বাহাদুরীর কাজ করে চেয়ারম্যান সাহেবের পুরস্কার পেলে– এ কথাটা সবাইকে জানান দিতে হবে না? সেই সাথে দুশমন শত্তুরের মুখগুলো চূর্ণ করতে হবে না? তোমার মতো এতবড় বাহাদুর এ তল্লাটে আর কে আছে শুনি? কোন মুখপোড়ার এমন সাহস আছে যে, আজ এই আসরে এসে বলে– তোমার চেয়ে সে বড় বাহাদুর?

আতর আলী বললো– তা যা বলেছো চাচী। আমার সাথে পাল্লা দেবে এমন বাহাদুর এই পঞ্চাশ গাঁয়ে একজনও নেই। ইচ্ছে করলে, ঐ যে তাল গাছটা দেখছো, এক লাফে আমি ওর মাথায় উঠতে পারি।

: ও মাও... মাও-মা। তাও তুমি পারো?

পারি মানে কি? রাত না হয়ে দিন হলে এখনই তোমাকে সেটা দেখিয়ে দিতাম। কি বলবো যে এখন রাত? শালা রাতটা একটু পরে আসতো যদি! ঠিক আছে চাচী, পরোয়া নেই। কাল সকালেই আমি তোমাকে দেখাবো সেটা।

: দেখাবে?

: দেখাবো দেখাবো, একশো বার দেখাবো।

আতর আলী ইতু লম্ফ করতে লাগলো। তা দেখে তার বাপ কাদের মোল্লা উঠে এসে আতর আলীর কানে কানে বললো– ওরে থাম থাম। স্থির হয়ে বসে থাক ইতু। বেশি লাফালাফি করিসনে। তোর যে মৃগীর বেরামটা আছে বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠলে সেটা আবার জেগে উঠতে পারে। বস বস, চুপ করে বসে থাক।

সরে গিয়ে বসতে বসতে আতর আলী এবার তসরী বিবিকে লক্ষ্য করে বললো– তা চাচী, আমার বাহাদুরীর তারিফটাই করলে শুধু, একটু পান শরবত কিছুই খাওলে না?

উদ্বেলিত কণ্ঠে তসরী বিবি বললো– খাওয়াবো বাছা, লিগ্‌ঘাত খাওয়াবো! শিকেয় আমার হাঁড়িভরা ললেল গুড় আছে, পানের ডাবরিতে লকলকে সাঁচী পান আছে। সব মজুত, চেয়ারম্যান সাহেব এখনই এসে পড়বে। পুরস্কার দেয়াটা দেখবো না? পুরস্কার দেয়া হয়ে গেলেই পান শরবত তৈয়ার করে এনে তোমায় খাওয়াবো। বাপরে বাপরে বাপ! এত বড় অজগরটা মারলে তুমি, আরে তোমাকে পান শরবত খাওয়াবো না?

মাতবর সাহেবের ভেতর বাড়িতে ইতিমধ্যে এসে জুটে গেছে আরো অনেক লোক। বসার আর ঠাঁই নেই বললেই চলে। আতর আলী এবার এসে যেখানে বসলো আবদুল্লাহকে সাথে নিয়ে এসে সেখানেই বসেছিলেন আহমদুল্লাহ শাহ সাহেব। জিয়াদ আলী, আবদুল আজিজ এরাও সেখানেই ছিল। আতর আলীকে একদম কাছে পেয়ে আবদুল্লাহ এবার আদলকণ্ঠে প্রশ্ন করলো– তা ইতু ভাই, অজগরটা তুমিই মারলে?

পাশেই আবদুল্লাহকে বসে থাকতে দেখে আতর আলী অনেকটা হকচকিয়ে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে একটু পরে সে অভিমান ভরে বললো– মারলাম কি মারলাম না, তা ঐ রাস্তায় গিয়ে দেখে এসো। দেখো গিয়ে কেমন শাটপাট হয়ে পড়ে আছে সাপটা।

: হ্যাঁ, তা দেখেছি। সেইজন্যেই তো বলছি, তুমিই তাহলে মারলে সাপটা?

: মানে?

: মানে, ওটা তুমিই মারলে? মানে ঠিক ঠিক তুমিই?

এই একই প্রশ্ন বার বার করায় আতর আলী স্বাভাবিকভাবেই ঘাবড়ে গেল। ঘাবড়ে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেললো সে। থতমত করে বললো– হ্যাঁ মারলামই তো। আমিই তো মারলাম!

তা কেমন করে মারলে বাবা? সাপটার দুই গালে চার চড় মেরে মারলে, না এক ধমকে সাপটার পিলে চমকে দিয়ে মারলে?

: হ্যাঁ, চমকে দিয়েই তো! ওটার পিলে চমকে দিয়েই তো মেরেছি।

: বলো কি! তোমার ধমক খেয়েই মরে গেল সাপটা?

: এ্যাঁ, না না, তা মরবে কেন? আমি ওটাকে বাঁশ দিয়ে মেরেছি।

: বাঁশ দিয়ে?

: বাঁশের এক গিটওয়ালা খুটি দিয়ে। ওখানে দেখো গিয়ে বাঁশটা ঐ সাপের পাশেই পড়ে আছে।

: সাব্বাশ! তাহলে তো সত্যিই তুমি একজন বাহাদুর রে ইতু মিয়া। অতবড় একটা সাপ মারা কি চারটি খানি কথা?

সেটা তুমিই এবার বুঝে দেখো। আমার যে কিছু সাহস শক্তি আছে, সেটা তো তোমরা বিশ্বাস করতেই চাও না। এবার বিশ্বাস হচ্ছে তো?

: হচ্ছে হচ্ছে। এবার কি আর বিশ্বাস না হয়ে যায়?

: তবে?

: তা বলছিলাম কি, সাপটাকে যখন তুমি মারো, তখন কি কেউ তোমার আশপাশে ছিল? মানে কেউ কি সেটা দেখেছে?

: তা কথা হলো, দেখেছেই তো। ঐ আক্কাস মিয়া দেখেছে। দেখোনি আক্কাস মিয়া?

আক্কাস মিয়া জড়িয়ে পেঁচিয়ে বললো– তা মানে, আমি তখন আমার খালার বাড়িতে গিয়েছিলাম যে! মানে, ওখানেই ঐ খালার বাড়িতেই ছিলাম।

ইতিমধ্যেই দর্শকবৃন্দ সকলেই এদের আলোচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং এদের সওয়াল জবাব উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল। থলের বিড়াল বেরিয়ে যায় দেখে ইতুর বাপ কাদের মোল্লা আক্কাস আলীকে ধমক দিয়ে বললো– খালার বাড়িতে গিয়েছিলে তো কি হয়েছে? সেখান থেকে কি আর জীবনেও বাড়িতে ফিরে আসোনি? বলো ঠিক ঠিক!

ধমক খেয়ে আক্কাস আলী চমকে গিয়ে বললো– এসেছি এসেছি। ঐ দিনই ফিরে এসেছি।

: তো ঐ ফিরে আসার সময় কি দেখোনি ঘটনাটা?

: দেখেছি দেখেছি। ইতু মিয়া ঐ সময় সাপটা মারলো তা দেখেছি।

: তবে? দেখবেই তো। এ কি বানানো কথা যে দেখবে না?

অতঃপর কাদের মোল্লা কলিমুদ্দীন নামক আর এক যুবককে লক্ষ্য করে বললো– কলিমুদ্দীন, তুমিও তো দেখেছো, না কি, বলো?

কলিমুদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে বললো– দেখেছি চাচা, দেখেছি। আমি তখন বিলের ধারে জমি চাষ করছিলাম। ঐ বিলের ধার থেকেই দেখলাম, ইতু ভাইয়ের হাতের বাঁশটা একবার আসমানের দিকে উঠছে, একবার জমিনের দিকে নামছে; একবার নামছে, আবার উঠছে... আমি আমার নিজের চোখে দেখলাম।

কাদের মোল্লা ব্যস্তকণ্ঠে বললো– আরে না না, ওভাবে দেখলে তো হবে না। কাছে এসে দেখতে হবে। কাছে এসে দেখোনি?

হুঁশে এসে কলিমুদ্দীন বললো– হ্যাঁ হ্যাঁ, হুশে কাছে এসে দেখেছি। হাল-লাঙ্গল রেখে ঐ কালীবাড়িতে ছুটে এসে দেখেছি। একদম কাছে থেকে।

কাদের মোল্লা বললো– হ্যাঁ, সেইভাবে দেখতে হবে সবাইকে। চেয়ারম্যান সাহেব এসে জিজ্ঞাসা করলে সেইভাবে বলতে হবে। উল্টাপাল্টা বললে উনি বিশ্বাস করবেন কেন?

: চাচা!

আমার আতর আলীকেই পুরস্কার দেয়ার জন্যে উনি আসছেন। তোমরা উল্টাপাল্টা বললে তা চেয়ারম্যানের মনে সন্দেহ দেখা দেবে। আমার আতর আলী পেয়ে ধন হারাবে।

এই সময় 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমতুল্লাহ' বলতে বলতে সেখানে এসে হাজির হলেন চেয়ারম্যান সাহেব। অধিকাংশেরাই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে সালামের জবাব দিলেন এবং সকলেই একসাথে বললেন– আসুন চেয়ারম্যান সাহেব, আসুন আসুন। বসুন ঐ চেয়ারে।

উঠোনের মাঝখানে একটা চেয়ার ও টেবিল পাতা ছিল। সকলে সেইদিকে ইংগিত করলে চেয়ারম্যান সাহেব সেই চেয়ারে গিয়ে বসলেন। তার সাথে আসা বডিগার্ড অহিরুল্লাহ বারান্দায় উঠে গিয়ে বসলো। আসন গ্রহণ করতে করতে চেয়ারম্যান সাহেব বললেন– আমি দুঃখিত। আমার হাতে অনেক কাজ কি না, তাই আসতে দেরী হয়ে গেল।

দর্শকদের কয়েকজন বললো– তবু যে আসতে পেরেছেন, এই-ই শুকুর আল-হামদুলিল্লাহ!

কাদের মোল্লা বললো– আমি ভাবলাম, আপনি বুঝি আর এলেন না। আমাদের এত আয়োজন সব বিফলে গেল!

চেয়ারম্যান সাহেব বললেন– আরে কও কি! তোমার আতর আলী এতবড় একটা কাজ করলো আর আমি আসবো না? তাকে পুরস্কৃত করবো না? যত রাতই হোক, আমি অবশ্যই আসতাম।

বইঘর ও বিএবিডি

কয়েকজন ফের বললো– আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব খুবই বড় দিলের মানুষ। ভাল কাজের উনি বরাবর কদর দেন।

চেয়ারম্যান সাহেব বললেন– আরে সেরেফ ভাল কাজ মানে, এটা কি কও তোমরা? আতর আলী যা করেছে, সেটা একটা মহান কাজ। মস্ত বড় পুণ্যের কাজ।

ডাকমণ্ডপ গাঁয়ে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকের বাস। কিছু হিন্দুও এসেছিল এই অনুষ্ঠানে। চেয়ারম্যান সাহেবের এ কথায় বিরু ঠাকুর নামের এক বামন ঠাকুর বড়ই নাখোশকণ্ঠে বললো– না চেয়ারম্যান সাহেব, মহান কাজ নয়। পুণ্যোর কাজ নয়। মস্ত বড় পাপের কাজ। ভয়ংকর বিপর্যয় ডেকে আনার কাজ এটা।

চেয়ারম্যান বিস্মিতকণ্ঠে বললেন– বিপর্যয়! কেন কেন?

বিরু ঠাকুর বললেন– ঐ সাপটা মারার জন্যে। কারণ ঐ সাপটা তো সেরেফ একটা সাপ নয়, মহাপ্রভু ভোলানাথের মাথার অলংকার ওটা। দেবাদি দেব শিব ঠাকুরের গলার মালা।

: মালা!

ঐ মণ্ডপ ঘরে কি দেখেননি, কালী মাতার পায়ের তলে পড়ে থাকা শিব ঠাকুরের মাথাটা জড়িয়ে নিয়ে সাপটা কেমন ফণা তুলে আছে? গলার মালা হয়ে কেমন শিব ঠাকুরের বুকে পিঠে ঝুলে আছে? দেখেননি এ দৃশ্য?

: হ্যাঁ দখেছি। তাতে কি হয়েছে?

বিরু ঠাকুর সতেজে বললো– ওতেই তো হয়েছে সব। ওতেই মহাবিপর্যয়ের সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এমনিতেই তো আমাদের কালীমাতা এবার মহারুষ্ট আছে। পাঠা বলীটা এবার ঠিক মতো হয়নি। এক কোপে পাঠাটা কাটতে পারেনি গোবরল কামার। বলীটা আটকে গেছে। এতে করে কালী মাতা আমাদের জব্বোর খাপ্পা আছেন। তার উপর শিব ঠাকুরের মাথার মুকুট ঐ সাপটাকে এভাবে পিটিয়ে মারা হলো।

চেয়ারম্যান সাহেব বিব্রতকণ্ঠে বললেন– হবেই তো। তোমাদের শিব ঠাকুরের মাথার মুকুট মাথা ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে কেন?

বিরু ঠাকুর একজন কমবয়সী বামুন। সে ক্ষুণ্নকণ্ঠে বললো– একি কথা বলছেন চেয়ারম্যান সাহেব। দেবাদি দেব মহাদেব একজন জাগ্রত দেবতা। তাঁর সাথে সাপ, বাঘ, মৃগাল, পেঁচা, নন্দী, ভিরিঙ্গী– যা কিছু আছে সবই জাগ্রত জীব। ঐশ্বরিক প্রাণী। সবার নজর এড়িয়ে এর কে কখন কোন দিকে বেড়াতে যায় তার কি কিছু ঠিক আছে।

এ কথায় জিয়াদ আলী আবদুল্লাহকে একটা মৃদু ঠেলা দিয়ে বললো– মাটি দিয়ে বানানো মূর্তিগুলো আবার বেড়াতে যায়! কি যে বলে!

বইঘর ও ব্লিএবিডি
কথাটা কানে গেল বিরু ঠাকুরের। গলাটা আরো বাড়িয়ে দিয়ে বিরু ঠাকুর বললো– ঠাট্টা করো না ঠাট্টা করো না। মহাবিপর্যয়ের নমুনা শুরু হয়ে গেছে। আর দুই একদিন অপেক্ষা করো, তাহলেই টের পাবে।

চেয়ারম্যান সাহেব বললেন– নমুনা! কি নমুনা শুরু হয়ে গেছে?

বিরু ঠাকুর বললো– কালী বাড়ির ঐ রাস্তায় হাতীর আবির্ভাব ঘটেছে। এই দুইরাত্রি হলো, কেউ কেউ দেখেছে ঐ রাস্তায় বিশাল একটা হাতী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। রাত্রিকালে ওদিক দিয়ে যায়, সাধ্য কার? হুঁ হুঁ বাবা, দেবদেবীর আক্রোশ বলে কথা!

চেয়ারম্যান সাহেব ক্রোধভরে বললো– তুমি থামো ঠাকুর! আমাকে কাজ করতে দাও। যত্তসব আষাঢ়ে গল্প!

অতঃপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চেয়ারম্যান সাহেব কাদের মোল্লাকে বললেন– তারপর কাদের মিয়া, ছেলের এতবড় বাহাদুরীর নিদর্শনটা এখানে আনো নি কেন? এতবড় অজগর তো অনেকেই দেখেনি। এখানে আনলে সবাই দেখতো।

ইতু মিয়া চমকে উঠে বললো– এখানে? ঐ সাপটাকে এখানে আনার কথা বলছেন? ওরে বাপরে বাপ! সাপ হলো আসলেই একটা হিংস্র জীব! ওটাকে কি মানুষের মধ্যে আনতে আছে?

www.boighar.com

চেয়ারম্যান সাহেব বললেন– আরে হিংস্র হোক আর যা-ই হোক, মরা সাপ এখানে আনলে ভয় কিসের?

www.boighar.com

ইতু মিয়া বেখেয়ালেই বললো–এ্যাঁ! মরা?

চেয়ারম্যান সাবের বেজায় রাগ হলো। তিনি ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন– মরা কি না, তুমি তা জানো না? তুমি নিজে মেরে রাখলে সাপটা আর তুমি জিজ্ঞাসা করছো– মরা কি না?

জিয়াদ আলী উঠে দাঁড়িয়ে বললো– বলবেই তো! সাপটা তো আর ঐ ইতু মিয়া মারেনি; মেরেছে অন্যজন। সে কি করে জানবে, মরা না তাজা?

চেয়ারম্যান সাহেব বিস্মিতকণ্ঠে বললেন– সেকি! ইতু মিয়া মারে নি মানে? তাহলে কে মেরেছে?

আবদুল্লাহর প্রতি ইংগিত করে জিয়াদ আলী বললো– মেরেছ এই আবদুল্লাহ! আমরা স্বচক্ষে তা দেখেছি।

চমকিত হয়ে চেয়ারম্যান সাহেব বললেন– এ্যাঁ, আবদুল্লাহ! বলো কি? অবশ্য এমন বাহাদুরীর কাজটা তার মতো নির্ভীক নওজোয়ানদেরই মানায়। মানে, তাদের দ্বারাই সম্ভব। আতর আলী ইতুটা এতবড় বাহাদুর, তা কখনো শুনিনি। এখন দেখছি...

দেখার কিছু নেই চেয়ারম্যান সাহেব। অতবড় ঐ অজগরটা ইতুর মতো ভীতু লোকের মারা কখনো সম্ভবও নয়, আর সে তা মারেও নি। সে বাহাদুর হবে কি করে?

: তাই! আবদুল্লাহ তাহলে মেরেছে?

তো আর বলছি কি? আমি আর আবদুল আজিজ, আমরা তো সরাসরি দেখেছিই, খোঁজ নিলে দেখা যাবে আরো অনেক লোকই তা দেখেছে। প্রকাশ্য দিবালোকের ঘটনা। এটাকে কি হেরফের করা সহজ?

চেয়ারম্যান সাহেব এবার কাদের মোল্লাকে প্রশ্ন করলেন– কি কাদের মিয়া, এরা এসব বলে কি?

উত্তেজিত হয়ে উঠে কাদের মোল্লা বললো– মিথ্যে বলছে ওরা, হুবহু মিথ্যা বলছে। সাপটা আমার ছেলেই মেরেছে।

: সাক্ষী আছে? তোমার ছেলে যে ঐ সাপটা মেরেছে এটা কেউ কি দেখেছে? মানে, তোমার দেখা সাক্ষী আছে?

আছেই তো, একশো বার আছে। এই যে এই আক্কাস আলী আর এই কলিমুদ্দীন– এরা কাছে থেকে দেখেছে। স্বচক্ষে দেখেছে।

: তাই? তাহলে শুনি এদের মুখে।

চেয়ারম্যান সাহেব এবার আক্কাস আলী ও কলিমুদ্দীনকে কাছে ডেকে বললেন– কও তো দেখি, তোমরা কে কোথায় কিভাবে দেখলে? ঠিক ঠিক বলবে কিন্তু...

ঢোক চিপে কলিমুদ্দীন ও আক্কাস আলী তাদের দেখার যে বর্ণনা দিলো, তা যেমনই উল্টাপাল্টা ও সঙ্গতিহীন, তেমনই আজগুবি ও হাস্যকর। এদের বর্ণনা শুনে উপস্থিত লোকদের একজনেরও বিশ্বাস হলো না যে, এরা আদৌ সাপ মারাটা দেখেছে। চেয়ারম্যান সাহেব কাদের মোল্লাকে উদ্দেশ্য করে বললেন– তাজ্জব! এই তোমার সাক্ষী? এরা যা বললো তা শুনলে কি একটা পাগলেও বিশ্বাস করবে– এরা ঘটনাটা সত্যি সত্যি দেখেছে? আর কোন সাক্ষী আছে তোমার?

কাদের মোল্লা গাঁইগুঁই করে বললো– তা মানে, কথা হচ্ছে... এরা ছাড়া আর সাক্ষী...

চেয়ারম্যান বললেন– বুঝেছি, আর কোন দেখা সাক্ষী নেই তোমার। বিষয়টা দেখছি খুবই জটিল হয়ে উঠলো। ভাল করে খোঁজ না নিয়ে বাহাদুরীর পুরস্কারটা তো যাকে তাকে দেয়া যায় না। আপনারা কি বলেন?

উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করলে তারা একবাক্যে বললো– ঠিক বলেছেন চেয়ারম্যান সাহেব, আপনি ঠিক বলেছেন।

চেয়ারম্যান সাহেব ফের বললেন– বুঝতে পেরেছি, আগামীকাল দিনে আমাকে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে আসলেই কে মেরেছে সাপটা।

জনতা ফের বললো– তাই করুন চেয়ারম্যান সাহেব। আমরাও খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানাবো। সত্যি বলেছেন, একটা বাহাদুরীর পুরস্কার যাকে তাকে দেয়া যায় না।

চেয়ারম্যান সাহেব বললেন– তাহলে আজ চলি। আকাশে মেঘ হয়েছে, জোরে জোরে বাতাস বইছে, এখানে বসে থেকে খামাখা আর রাত করে লাভ নেই। এসো অহিরুল্লাহ...!

চেয়ারম্যান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। দর্শকদের কিছু লোক বললো– চলুন চলুন, আমরা আপনাদের রাস্তা তক এগিয়ে দিই...

চেয়ারম্যান ও অহিরুল্লাহর সাথে কিছু লোক বেরিয়ে গেল। দু'চারজন লোক ছাড়া সবাই তখনই আসর ছেড়ে গেল না। যেমন বসেছিল, সবাই তেমনই বসে থেকে আক্কাস আলীদের এই উদ্ভট সাক্ষ্যের সমালোচনা করতে লাগলো।

কিছু সময় এইভাবে কাটলো। এরপরেই যে লোকগুলো চেয়ারম্যান সাহেবদের এগিয়ে দিতে গিয়েছিল, সেই লোকগুলো পড়ি মরি মাতবরের ঐ আঙ্গিনায় চিৎকার দিতে দিতে আতংকিত অবস্থায় ফিরে এলো এবং কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগলো– হায় হায় হায়। মারা গেল। চেয়ারম্যান সাহেবেরা জানে প্রাণে মারা গেল। হায় হায়, কি গুজব।

শুনে সবাই চমকে উঠে প্রশ্ন করলো– মারা গেল মানে? কে তাদের মারলো?

লোকগুলো পুনরায় কাঁপতে কাঁপতে বললো– হাতী! আলীশান এক হাতী। আমরা দূরে দাঁড়িয়ে থেকে দেখলাম, চেয়ারম্যান সাহেবেরা রাস্তা বেয়ে কালীবাড়ির কাছাকাছি যেতেই আলীশান এক হাতী আকাশে শূঁড় তুলে ছুটে এলো চেয়ারম্যানদের দিকে। সেটা দেখতে পেয়েই চেয়ারম্যান সাহেবেরা 'ওরে বাবারে! মরেছিরে! বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার দিয়ে মাঠের দিকে দৌড় দিলো। হয়তো মাঠের মধ্যেই হার্টফেল করে মারা গেল তারা।

এ কথায় সবাই হতবাক হয়ে গেল। এবার আহমদুল্লাহ শাহ সাহেব প্রশ্ন করলেন– কি আজগুবি কথা বলছো তোমরা! হাতী চেয়ারম্যান সাহেবদের তাড়া করলো মানে?

লোকগুলো জবাবে বললো– এর আবার মানে কি শাহ সাহেব। আকাশ একটু মেঘলা হলেও জ্যোৎস্নার আলোতে আমরা স্পষ্ট দেখলাম, হাতীটা শূঁড় তুলে তাঁদের তাড়া করলো আর তারা 'মরেছিরে' বলে মাঠের দিকে দৌড় দিলো আর ঐ মাঠের মধ্যে দিয়ে বাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা করলো।

: বলো কি!

হার্টফেল করে না মরুক আর একটা হাতী গিয়ে তাদের ঐ মাঠের মধ্যেই আছড়িয়ে মারলো কি না, কে জানে?

: আর একটা হাতী! এত হাতী এলো কোত্থেকে? খোয়াব দেখছো?

বিরু ঠাকুর তখনও বসেছিল ওখানে। সে এবার গলা ছেড়ে দিয়ে বললো– খোয়াব নয়, খোয়াব নয়। বাস্তব ঘটনা। তখন বললাম না, গত দুই রাত্রি ধরে অনেকে হাতী দেখেছে ঐ রাস্তায়? এই সেই ঘটনা।

: দুই রাত থেকে হাতী? হাতীটা তাহলে কোথা থেকে আসে?

ঐ শিবঠাকুরের নিকট থেকে। একটা কেন, একাধিক হাতী ওখান থেকে আসবে, এ আর আজব কথা কি?

কি আজগুবি কথা বলছো? তোমাদের ঐ শিবঠাকুরের কাছে একাধিক হাতী আছে? জীবন্ত হাতী?

: আছেই তো। আসলে তো ওগুলো জীবন্ত হাতী নয়, ওগুলো সবই ভূত। আমাদের মহাদেবের নাম ভূতেশ্বর। দুনিয়ার সমুদয় ভূতের ঈশ্বর তিনি। সব ভূত তার হুকুমে চলে। যে ভূতকে তিনি যে মূর্তি ধরতে বলেন, সেই মূর্তি ধরে তারা। ঐ শিব ঠাকুরের হুকুমেই একটা ভূত কালীবাড়ির ঐ রাস্তায় হাতীর মূর্তি ধরে কয়েক রাত্রি যাবত ঘোরাফেরা করছে।

এবার ক্ষেপে গেল আবদুল্লাহ। সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো– আরে থামুন ঠাকুর মশাই! গাঁজিলের মতো কথা বলবেন না বারবার। ভূত বলে এ দুনিয়ায় কোন কিছু নেই। যারা গাঁজা ভাং খায়, তারাই এমন কথা বলে।

বিরু ঠাকুর প্রতিবাদ করে বললো– তারাই এ কথা বলে? জাজ্বিল্যমান ভূতটা হাতী হয়ে রাস্তা আগলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তুমি বলছো, ভূত বলে কিছু নেই?

: না, নেই।

তাহলে যাও না দেখি কেমন মরদ তুমি? যাও দেখি, কালী বাড়ির রাস্তায় ঐ হাতীর কাছে?

যাবো তো! এসব আজগুবি কথা শুনে আমাকে যেতেই হবে ওখানে। আর এখনই... দাও তো জিয়াদ তোমার লাঠিখানা।

জিয়াদের হাত থেকে তার লাঠিখানা নিয়ে আবদুল্লাহ তখনই হন হন করে কালীবাড়ির রাস্তার দিকে রওনা হলো। জিয়াদ আলীরাসহ আসরের প্রায় অর্ধেক লোক ভীতকণ্ঠে বলে উঠলো– আরে করো কি, করো কি। এত লোক হাতীটা দেখেছে, এটা তো মিথ্যা নয়? ওখানে গেলে হাতীটা তো তোমাকে আছড়িয়ে মারবে।

আবদুল্লাহ বললো– হাতীটা আমাকে আছড়িয়ে মারে না হাতীটার আমি গুষ্ঠি সাফ করি, সাহস থাকলে রাস্তায় নেমে এসে সবাই দেখুন সেটা। ভূত হাতীর রূপ ধারণ করে এসেছে! যত্তসব আজগুবি গপ্পো! লাঠির আগায় ভূত পালায় তা জানেন? সাহস থাকলে ঐ রাস্তায় নেমে এসে দেখুন, ভূতটাকে কেমন আমি লাঠিপেটা করি।

বলতে বলতে আবদুল্লাহ দুরন্ত বেগে ছুটলো। তা দেখে জিয়াদ আলীদের সাথে অনেক লোকই ভয়ে ভয়ে রাস্তায় নেমে এসে দূরে দাঁড়ালো। ছেলে আতর আলী ইতুসহ কাদের মোল্লাও রাস্তায় নেমে এলো হাতীটা আবদুল্লাহকে কেমন আছড়িয়ে মারে সে দৃশ্য দেখার জন্যে।

কালীবাড়ি থেকে অনেকটা দূরে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো সবাই। ভাল করে লক্ষ্য করতেই জ্যোৎস্নার ভাঙ্গা ভাঙ্গা আলোতে সবাই চমকে উঠে দেখলো– ঘটনা ঠিক। ঠিকই মস্তবড় একটা হাতী রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে শূঁড় দোলাচ্ছে। কখনো কখনো শূঁড়টা আকাশের দিকে তুলছে।

সেই সাথে সবাই দেখলো আবদুল্লাহ ইতিমধ্যেই একদম হাতীটার কাছে পৌঁছে গেছে এবং হাতীটা শূঁড় উঁচিয়ে তাকে ধরে ফেলছে। দেখে সবাই আর্তনাদ করে উঠলো– 'মেরে ফেললো, মেরে ফেললো! হায় হায় হায়! হাতীটা আবদুল্লাহকে আছড়িয়ে মেরে ফেললো! কেন যে তুমি সাধ করে হাতীটার কাছ গেলে রে বাবা!'

সবাই এক সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠার সাথে সাথে আতর আলী ইতু মিয়া ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠলো এবং জ্ঞান হারিয়ে শাটপাট পড়ে গেল রাস্তার উপর। মরার উপর খাঁড়ার ঘা। পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠলো আতর আলীর সেই পুরানো মৃগীর ব্যারামটা। এতে করে আতর আলী সমানে হাত পা ছুঁড়তে লাগলো আর দাঁত মুখ খিঁচুতে লাগলো। তা দেখে কাদের মোল্লা 'ওরে মারা গেল, আমার আতর আলী মারা গেল' বলে এস্তার চিৎকার করার সাথে বিলাপ জুড়ে দিলো– 'ওরে আমার আতর আলী রে!'

এতে করে কেউ কেউ তাকে ধমক দিয়ে বললো– আরে থামো! মৃগীর ব্যারাম জেগেছে, একটু পরেই আপছে আপ সেরে যাবে। এ নিয়ে খামাখা এ সময় চিল্লাচ্ছো কেন?

সবার নজর তখন আবদুল্লাহর দিকে। হাতীর শূঁড়টা, মানে হাতীর শূঁড়ের মতো জিনিসটা দুইহাতে জড়িয়ে ধরে আবদুল্লাহ তখন সবাইকে ডাক দিয়ে বলছে– এসো, এসো সবাই, এসে দেখে যাও, তোমাদের এই হাতীর শূঁড়টা আমি কেমন করে ছিঁড়ে ফেলছি।

জিয়াদ আলীরা চিৎকার করে বলে উঠলো– সে কি আবদুল্লাহ ভাই! তুমি হাতীর শূঁড়টা ছিঁড়ে ফেলছো?

আবদুল্লাহ বললো– আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, ভয় নেই, আসল ঘটনাটা এসে দেখে যাও।

জিয়াদ আলী আবদুল আজিজকে বললো– আরে এই, চল চল, দেখি গিয়ে, চল শিগগির...

জিয়াদ আলীরা ছুটলো। তাদের সাহসে সাহস পেয়ে রাস্তায় দাঁড়ানো অন্যান্য লোকজনও ছুটে এলো হাতীর কাছে। তারা এসে দেখলো, হায় আল্লাহ, হাতী কোথায়? এটা তো একটা বড়ই, মানে কুলগাছ!

ঘটনা : রাস্তাটার একদম কোল ঘেঁষে একটা ছোট কুল গাছ ছিল। দিনে দিনে সেই কুলগাছের মাথাটা আলোক লতায় ছেয়ে ফেলেছিল। আলোক লতার ভারে কুল গাছটার মাথা রাস্তার দিকে হেলে এসেছিল। এতে করে জ্যোৎস্নার আধো আলো আধো আঁধারে কুল গাছের মাথাটাকে হাতীর পিঠের মতো দেখাচ্ছিল। সেই সাথে,

কুল গাছের বর্ধিত আগাডোগাগুলো জড়াজড়ি করে মাটির দিকে ঝুলে পড়েছিল। এটাকেই হাতীর শূঁড় বলে সকলের ভ্রম হয়েছিল। আলোকলতার এই আগাডগাগুলো প্রবল বাতাসে জড়াজড়ি করে একবার আকাশের দিকে উঠছিলো, আবার নিচে নেমে এসে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দুলছিল। আধো আলো আঁধারে দেখে এটাকেই হাতীর শূঁড় বলে সকলের দৃঢ় ধারণার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। যারা দেখেছিল, তারা সবাই এই কুল গাছটাকে হাতী ভেবে ভয়ংকর আতংকিত হয়ে উঠেছিল।

সকলেই কাছে এলে আবদুল্লাহ বললো– এই দেখুন সবাই বিরু ঠাকুরের হাতীটা। এই যে হাতীর শূঁড় এখন আমার হাতে আর আমি সেই শূঁড়টাকে কেমন করে টেনে ছিঁড়ে ফেলি দেখুন।

বলেই হাতের মধ্যে জড়িয়ে ধরা আলোক লতার আগাডগাগুলি আবদুল্লাহ পট পট করে ছিঁড়ে ফেললো। উপস্থিত সকলেই তখন উল্লাসভরে আওয়াজ দিয়ে উঠলো– সাব্বাশ আবদুল্লাহ সাব্বাশ! সত্যি সত্যিই একটা বাহাদুর ছেলে। প্রচণ্ড সাহসী আর দুর্দান্ত নির্ভীক ছিলে তুমি বাবা! সাব্বাশ সাব্বাশ, তোমার মতো এ রকম বাহাদুর ছেলে আর আমরা এ জীবনে দেখিনি। তুমি এগিয়ে না এলে আর কতদিন যে আমরা এই মিথ্যা ভয়ের মধ্যে থাকতাম, কে জানে। আল্লাহ তায়ালা তোমার সার্বিক কল্যাণ করুন।

রাস্তার ওপ্রান্ত থেকে তখনো মাঝে মাঝে কাদের মোল্লার ক্ষীণকণ্ঠের বিলাপ ভেসে আসছিলো– 'ওরে আমার আতর আলী রে!'

ভদ্রতা

একটানা খিস্তিপনায় অস্থির হলাম। বাদ ইফতার একটু সুস্থির হওয়ার পর কিছু ইয়ারদের আস্তানায় গেলাম দুঃখের কথা বয়ান করে দিলের ভার লাঘব করতে। বিহিত তো আল্লাহ ছাড়া এ দুনিয়ায় চাইতে যাওয়া বাতুলতা, তাই ইয়ারদের কাছে এলাম কিছু প্রলেপ পাওয়ার উম্মিদে। ইয়ারেরা সবাই মানিগুণী লোক হলেও আমার মতো কেউ মেনিমুখো নন, মস্তানিতেও কিছু কিছু এলেম আছে তাঁদের। কিন্তু দুঃখের কথা পেশ করে যা পেলাম, তা আবার পস্তানোরই নামান্তর। শুরুতেই বন্ধুরা বলেন, সংক্ষেপ করো, বেশি শোনার সময় নেই। আরে বাবা! একেবারে মাংসপেশী পিষে ফেলার ব্যাপার স্যাপার, তবু কিসে বেশি হয় দিশে করতে পারিনে।

বাহ্যিকভাবে বিষয়টা সামান্যই। জার্নি বাই বাস। বাসে চড়ে ঢাকায় এলাম, আছি এবং দিন কয়েক থাকবো। নো প্রবলেম। কিন্তু আগাগোড়া ব্যাপারটা আর সামান্য নয়, ফাটা পায়ে হাঁটার মতোই অসামান্য। রওনা হলেম নাইটকোচে। জনৈক হিতাকাঙ্ক্ষী রীতিমতো ফাইট দিয়ে টিকিট কিনে দিলেন। কিন্তু বাসে উঠতে গিয়ে দেখি মাইট ইজ রাইট, আর সবই রং। টাকায় কেনা টিকিটটা মোটেই কোন সাহায্যকারী শক্তি নয়। আমি একজন ভদ্রলোক। জেন্টলম্যান। কাইট কাইট ফাইট ফাইট প্রক্রিয়ায় শরীক হওয়া আমার পক্ষে শোভন নয়। এ ছাড়া মোষমার্কা সামর্থেরও অভাব আমার অনেক। আমার এখন গতি কি?

হঠাৎ এক পশুপতি গেটে আসায় উৎরে গেলাম এ যাত্রা। খাস বাংলায় গরুর দালাল। মোষ পেটানো লাঠিখানা গেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে উনি একটা চাঁড় মারলেন আড়াআড়ি। আট দশজন হুমড়ি খেয়ে সরাসরি গড়িয়ে গেল গেটের নিচে। এক পলকে চিচিম্ ফাঁক। পশু বাবার অনুকরণে লাফ দিয়ে গেটে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে পেছনে আবার চাপ পড়লো ভীষণ। তুমড়ি ফাটা চাপ। এস্কেলেটারে উঠার মতো আমি আপছে আপ চলে এলাম বাসখানার অভ্যন্তরে। একদম শূন্যে শূন্যে। বাসের পাটাতন আমার পুণ্যপদের স্পর্শটাও পেলো না।

হাঁফ ছেড়ে ঘাম মুছে রাইট সিট খুঁজে নিয়ে টাইট হয়ে বসার পরই বুঝলাম, দশাও আমার টাইট। ইফতারীর লাইট নাশতা উদর থেকে উঠাও। ক্ষুধা নামক পদার্থ আমার পাকস্থলী বাইট করছে ঝাঁক খানেক বিষ-পিঁপড়ার মতো। কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল। বাস-চালকের এলান : ফার্স্ট ফেরীর গাড়ী এটা। দেরী নেই এক লহমা। আহারাদি সেহেরি সব কিছু ফেরীতে। রোড ব্লকে দেরী হলে সেখানেও হতে পারে।

ওভি আচ্ছা। যা দুর্নিবার তা সইতেই হবে। তড়িঘড়ি ছুটতে লাগলো গাড়ী। অনেকক্ষণ ছুটার পর নগরবাড়ি ধরি ধরি করারকালে গাড়ীখানা থামিয়ে দিয়ে বাস চালক নেমে গেলেন অলক্ষ্যে। দীর্ঘকাল আর লক্ষ্যের মধ্যে এলেন না। একটা হোটেল ছিল নিকটেই। সামনে কোথাও রোডব্লক বিবেচনায় আগাম দামে খাবার কিনে টেবিলে গিয়ে বসলাম। হাতের গ্রাস মুখের কাছে আনতেই আর একখানা খালি গাড়ি ফার্স্টফেরী ধরবে বলে হাঁক দিলো পেছন থেকে। পলাতক বাস চালক হাঁক শুনেই ছুটে এসে তৎক্ষণাৎ চালু করলো বাসখানা। মুখের খানা ফেলে রেখে তালকানা অবস্থায় দৌড়ে এসে লাফিয়ে উঠলাম বাসে। ছুটলো আবার গাড়ী। একটানা ছুটে এসে ফেরীঘাট বাঁয়ে ফেলে ডানপাশের মাঠের মধ্যে বাসখানা ঢুকিয়ে দিয়ে চালক সাহেব বন্ধ করলেন ইঞ্জিন। ফার্স্ট ফেরীর সারি থেকে পঞ্চাশ গজ ফারাগে।

ব্যাপার কি খবর করে অবশেষে জানা গেল, আমরা সবাই জিম্মি। ফার্স্ট ফেরীর নয়, চান্স ফেরীর গাড়ী এটা। কোন ফেরীতে যাবে তা জঙ্গনামা এস্তেমাল না করে কেউ আন্দাজ করতে পারবে না। অল্পায়াসে অধিক প্যাসেঞ্জার ধরার এবং ধৃত প্যাসেঞ্জার হাতছাড়া না করার মতলবেই এবম্প্রকার তানশানী তাদের।

ধসে পড়ে সাঁকোর মতো মুখাকৃতি করে আমার মতো ভদ্রলোকের সন্তানেরা মাথায় হাত দিলেন। কিন্তু সাধারণের সন্তানেরা এ খবরে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। প্রিয়তমা পত্নীর সহোদর সম্বোধনে তাঁরা সবলে চেপে ধরলেন বাস চালকের কলার এবং প্রচণ্ড গুতোগুতির মাধ্যমে বাসভাড়া আদায় করে নিয়ে ফার্স্ট ফেরীর গাড়ি ধরে চলে গেলেন ঢাকায়। থাকার মধ্যে থাকলাম কেবল আমরা ক'জন জেন্টলম্যান। ভদ্রতাবিরুদ্ধ বোধে থার্ডক্লাশ লোকের সাথে কুস্তি লড়তে গেলাম না। মাঠের মধ্যে বসে বসে মশা মারলাম সারারাত।

এ পর্যন্ত পেশ করে বন্ধুদের বললাম– এতবড় মোনাফেকী হজম করি কেমন করে বলুন তো?

প্রত্যুত্তরে বন্ধুরা শুধু বললেন– তারপর?

তার পরেরগুলোও পিত্তশূলের মতোই। পরের দিন ভর দুপুরে গাবতলী পৌঁছে গুলিস্তানে যাওয়ার জন্যে কোস্টারে (মিনিবাসে) চড়লাম। তামাম সিট ভর্তি। একদম শেষের দিকে বেঞ্চি মার্কা আসনে চারজনকে বসে থাকতে দেখে সেখানে এসে বিনয়ের সাথে বললাম– ভাই, একটু জায়গা হবে?

জবাবে এক ব্যক্তি বিরক্তির সাথে বললেন– জায়গা? এখানে জায়গা কোথায়?

বললাম– না মানে, আপনারা একটু চেপে বসলেই... কথা শেষ করতে না দিয়ে দুই তিন জন বললেন– কি ভেজাল করছেন? এই গরমে চাপাচাপি মানে? সামনের দিকে যান...

কেউ এক ইঞ্চি নড়লেন না। কিন্তু সিটটা যে পাঁচ ছয়জনের সিট, সেটা জানি। আর এও জানি, কিছু অভদ্র হওয়া ছাড়া ওখানে আসন পাওয়া যাবে না। রুচিতে বাধলো। ছাদের হ্যান্ডেল ধরে চুপচাপ ঝুলতে লাগলাম।

একটা মিনিটও গেল না। এরই মধ্যে এক ব্যক্তি এসে ঐ আসনে দুই ব্যক্তির মাঝখানে চেপে বসতে লাগলেন। এবারও তারা আপত্তি করতে যেতেই আগন্তুকটি কড়াকণ্ঠে বললেন– সরে বসুন ঐ দিকে। এটা ছয় সিটের আসন।

একজন তবু আমতা আমতা করে বললেন– কিন্তু এই গরমের মধ্যে...

আগন্তুকটি খেঁকিয়ে উঠে বললেন– তাই নাকি? যান যান, নেমে গিয়ে ট্যাক্সি রিজার্ভ করুন গে। বাসে চড়েছেন কেন?

সেঁটে বসে পড়লেন আগন্তুক। এরপর আর কেউই কোন কথা বললেন না। পরক্ষণেই কন্ডাকটার আর একজন লোক এসে রুক্ষকণ্ঠে 'চাপেন চাপেন' বলে ঐ আসনেই তাকেও ঠেশেগুঁজে বসিয়ে দিয়ে গেল। আপত্তিকারীদের মুখে এবারও আর টুঁ শব্দটি নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝুলতেই লাগলাম আমি।

বন্ধুরা গম্ভীরকণ্ঠে ফের বললেন– বেশ! তারপর?

বললাম– মিনি থেকে নামতেই একটা রিকশাওয়ালা তড়িঘড়ি রিকশা এনে বললো– আয়েন সাব, আয়েন আয়েন। যাবেন কই?

গন্তব্যস্থানের কথা বলে ভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে সহৃদয়কণ্ঠে বললো– ইনসাফ করে দেবেন সাব, এর উপর আর কথা কি আয়েন, আয়েন।

সে রিকশার আসন ঝাড়তে লাগলো। আমিও দেখলাম ঠিকই তো; এর উপর আর কথা কি? উঠে পড়লাম রিকশায় কিন্তু ও বাবা! গন্তব্যস্থানে পৌঁছে সাত টাকা তার হাতে দিতেই পাল্টে গেল মূর্তি তার। সে খিস্তি করে বললো– আরে! হালায় মিসকিনেরে সদগা দিবার লাগছেন নাকি? আরও সাত টাকা লাগান।

আমি একজন ভদ্রলোক, এটা বুঝতে পেরেই বোধ হয় তার পাল্টে গেল সুর। আমি অবাক হয়ে বললাম– বলো কি? ভাড়া এখানে খুব বেশি হলে পাঁচ টাকা। সে হিসেবে দুই টাকা বেশিই দিচ্ছি। আরো চাও মানে?

রিকশার বেল বাজিয়ে সে মেজাজের সাথে বললো– ফ্যাচ ফ্যাচ করবার লাগছেন ক্যান? এতই যহন টেহার দরদ, যান, দুই হ্যান টেহা রিলিফ দিলাম। আর পাঁচ ট্যাহা ফেলান, যাইমু গা...

বসচা শুনে দু'চারজন উৎসাহী শ্রোতা এসে দাঁড়িয়ে যেতে লাগলো। আমি ইনসাফের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই রিকশাওয়ালা তেড়িয়াকণ্ঠে বললো– ফের ইনসাফ দেহাইবার লাগছেন দেহি? ঠিক আছে হালায়। এই যে আমি রিকশায় উইঠা বইলাম। যেহানে ছিলাম, চালাইয়া লইয়া রিকশাডারে সেই হানে রাইখ্যা আইসেন। ব্যাস, এক পয়সা ভাড়া দেওন লাগবো না।

উপস্থিত শ্রোতাড়া হো হো করে হেসে উঠলো। শরমে আমার কর্ণমূল গরম হয়ে গেল। আর পাঁচ টাকা ফেলে দিয়ে কোনমতে সরে এসে বাঁচলাম। এরই মাঝে আর একলোক রিকশাযোগে এসে রিকশা থেকে নামলো এবং গুনে চার টাকা রিকশার উপর রেখে সে হাঁটা দিলো হনহন করে। চেহারা তার উস্কো খুস্কো। কাঁধে ছিল ক্রিকেট খেলার ব্যাট। রিকশাওয়ালা মিন মিন করে বললো– গুলিস্তান থাইক্যা আইলাম, আর একটা টেহা দিবেন না স্যার?

পেছন দিকে কটমট করে চেয়ে ব্যাটওয়ালা ব্যাটখানা এ ঘাড় থেকে ওঘাড়ে পার করতেই সুড়সুড় করে সরে পড়লো রিকশাওয়ালা।

আস্তানার কাছে এসে ইফতারির জন্যে গোটা দুয়েক কলা কিনতে গেলাম। ভাল কলা দেখিয়ে নিয়ে দেবারকালে কলাওয়ালা ছড়ার পেছন থেকে দুটো পচা কলা ছিঁড়ে দিলো। ওটা নিতে আপত্তি করলে কলাওয়ালা যে সব কথা শুনালো সেগুলো বলে আর মর্মব্যথা বৃদ্ধি করতে চাইনে। চম্বুক কথা, সে বদালয়েও দিলো না এবং ছেঁড়া হয়ে গেছে বলে ফেরতও আর নিলো না। অথচ এক কুলি এসে 'দেহি মিয়া দু'গ্যা কেলা' বলেই সে ঐ ছড়া থেকে নিজের হাতে বেছে দুটো বড় ও ভাল কলা ছিঁড়ে নিয়ে একই দাম ফেলে দিয়ে চলে গেল। দেখলাম বাহাদুর কলাওয়ালার মুখে এখন আর কোনো কথা নেই। ভেজা বিড়ালের মতো একদম খামুশ।

একটু থামতেই বন্ধুরা বললেন– আর কিছু বলার আছে?

বললাম– বলবো আর কতো? এই যে আপনাদের এখানে এলাম, চার টাকা রিকশা ভাড়া মিটিয়ে নিয়ে এলাম। নেমে একটা পাঁচ টাকার নোট দিলাম। কিন্তু রিকশাওয়ালা আর ঐ এক টাকা ফেরত দেয়নি আমাকে। আমি একটু রেগে যেতেই সে বললে– 'সাব, আপনারা দু'এক টেহা না দিলে আমরা আর পাই কনে, কন? ঐ এক টেহা আর দিমু না।'

চারদিকে বহুলোক। ঐ একটা টাকার জন্যে খেঁচাখেঁচি করাটা ভদ্রতায় আমার বাধলো। তাই ও টাকাটাও ছেড়ে দিয়ে আসতে হলো।

এতটা বর্ণনা করার পরও বন্ধুদের ঠাণ্ডা দেখে এবং তাঁদের তরফ থেকে কোনো সহানুভূতি না পেয়ে আমি কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বললাম– এসব কি খিস্তিপনা, বলুন তো? আমরা না দিলে ওরা পায় কনে, সেটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু ওদের এইভাবে দেয়ার জন্যে আমরা পাই কনে, এটা তো আর বুদ্ধির মধ্যে আসে না? ওদের জন্যে আমরা আছি, ওরা বেশি নেবে ঠকাবে ভোগাবে। আমাদের জন্যে কে আছে? কিসের জোরে আমরা টিকে থাকি?

: কিসের জোরে?

: হ্যাঁ, আমাদের সাকুল্লে পুঁজি কি?

সবাই এবার সমস্বরে বললেন– ভদ্রতা। এই বলেই কেটে পড়লেন বন্ধুরা।

দুলালীর দিনকাল

www.boighar.com

: সে কি লো? সে কি লো ধোলীর মা? তোমার বাড়িতে আবার ঘটকের আনাগোনা দেখতাছি যে? আবার কোন বদ খেয়াল মনে জাগলো তোমার?

ধোলীর ওরফে দুলালীর মা বুঝতে না পেরে বলে– বদখেয়াল।

প্রশ্নকারিণী ধোলীর মায়ের প্রতিবেশী মতির মা। মতির মা বলে– নয়তো কি? এর পরেও লাজ হয়নি তোমার?

: লাজ! আমার লাজ হওয়ার কি দেখলে, কও দেখি?

আবার ক্যান তোমার বাড়িতে ঘটক আনাগোনা করতাছে? ঐ বেঈমান পরদেশীটার হাতে এতবড় দাগা খাওয়ার পরও ফের খোয়াব দেখতাছো নিকাহ বিয়ার?

ধোলীর মা শরম পেয়ে বলে– ছিঃ ছিঃ ছিঃ। কি যে কও বুবু? ঝাঁটা মারি ঐ নিকাহ বিয়ার মুখে। একবারেই ঢের লাজ হয়াছে আমার। ফের ঐ গর্তে পা দিমু আমি?

: তাইলে আবার ঘন ঘন ঘটক আসতাছে ক্যান?

: সেটা কি আমার জন্যে? ঘটক আসতাছে আমার ধোলীর জন্যে।

: ধোলীর জন্যে! ও মাগো মা, ইডা আবার কুন কথা কও? এখনই ধোলীর শাদি দিবা নাকি তুমি?

নিঃশ্বাস ফেলে ধোলীর মা বলে– হ্যাঁ। না দিয়া আর কি করমু।

: কি করমু মানে? ঐ টুকুন বাচ্চা মেয়ের শাদি দিবা? ওর গায়ে তো আতুর ঘরের গন্ধ লাইগাই আছে এখনও।

: তয় কি করমু? বিছানায় শোয়ায়ে রাইখা ঘুম পারামু?

মতির মা গলায় জোর দিয়ে বলে– ঘুম পারাইবা ক্যান? পাঠশালায় পাঠাইবা। গাঁয়ের কত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দল বাইন্ধা পাঠশালায় যায়। ওদের সাথে ধোলীও যাবে।

পাঠশালায় যাইয়া ও কিছুটা লেখাপড়াও শিখুক আর ততদিনে কিছুটা বড়সড়ও হউক।

খাওয়ামু কি? ততদিন ওরে খাওয়ামু কি? ছাওয়াল তো ঐ একটাই লয়। উডা বাদে আরও দুই দুইডা ছোট ছোট ছাওয়াল-পোয়াল আছে। দুই বেলা কাউকেই পেটপুরে খাওয়ার দিবার পারিনে। সবগুলোকে ঘরে বাইন্ধা রাইখা খাওয়ামু কি?

: ধোলীর মা!

ধোলীরে শাদি দিলে পরের বাড়িতে গিয়ে দু'মুঠো খেয়ে বাঁচতে পারবে। এভাবে শুকাইয়া মরতে হবে না।

এরপরে আর কথা খুঁজে পায় না মতির মা। ক্ষণকাল নীরব থেকে প্রশ্ন করে– তা তোমার ঐ সব্বনেশে মিনষের, মানে ঐ বিবেকহীন কাফেরটার আর কোন খবরই কি পাওনি?

: পাই নি আবার। নিজের দ্যাশে ফিরে গিয়ে সে নাকি আবার শাদি কইরাছে নতুন কইরা।

দুই তিনডে ছেলে মেয়েও হয়্যাছে নাকি সেখানেও। নতুন বউ বাচ্চা লিয়া নাকি সুখেই আছে সে। এদিকে আমরা বেঁচে রইলাম না ভেসে গেলাম তা লিয়া কি কিছু মাত্তর চিন্তা আছে ঐ বিবেকহীন লোকটার?

এরপর নীরব হয়ে ফিরে যায় মতির মা। যেতে যেতে সে বড় করেই মলিনকণ্ঠে বলে– কপাল কপাল! পাঠশালায় যাওয়ার বয়সে সোয়ামীর ঘরে যেতে হচ্ছে সেরেফ প্যাটের দায়ে!

দুলালীর জন্মগত নাম ধোলী। গায়ের রংটা কিছু ফর্সা হওয়ায় পাড়া প্রতিবেশীরা ওর নাম রাখে ধোলী। ধোলীর মা অবশ্য ধোলী না বলে ওকে দেলী বলে ডাকতে থাকে। পরবর্তীতে ওর নাম হয় দুলালী। দুলালী নামটা দুলালীর নিজের রাখা নাম।

সে যাই হোক, ছোটকাল থেকেই দুলালীর লেখাপড়া শিখে শিক্ষিতা হওয়ার বড়ই ইচ্ছে। দল বেঁধে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা পাঠশালায় যায় দেখে দুলালী তাদের নিকট থেকে একটা পুরাতন বাল্য শিক্ষা বই চেয়ে নিয়ে সেও চুরি করে পাঠশালায় যাওয়া শুরু করে। কিন্তু দু'তিন দিন না যেতেই টের পেয়ে ক্ষেপে যায় দুলালীর মা। বাল্যশিক্ষা বইখানা টান মেরে তার হাত থেকে নিয়ে ফেলে দিয়ে বলে– ইঃ! মেয়ের আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনে। প্যাটে ভাত নাই, পাঠশালায় ভর্তি হইয়া বিদ্বান হওয়ার শখ!

অতঃপর গোবরের একটা ডালি ধরিয়ে দিয়ে বলে– যা, মাঠে যা। মাঠে গিয়া ডালি ভরে গোবর কুড়িয়ে আন। গোবর দিয়া দেলে (কেঁড়ে) বানিয়ে না বেচলে, মুখে ভাত যাবে কি কইরা। পাড়ার সবাই গোবর শুকাইয়া ঘুঁটে বানান শুরু কইরাছে। বাড়ির উপর কি গোবর আজকাল পাওয়া যায়?

শুরু হয় দুলালীর গোবর কুড়ানো কাজ। এভাবেই সে একটু বড় হয়ে উঠে আর গায়ের রংটা ফর্সা হওয়ায় পাঁচ জনের নজর পড়ে যায় তার উপর। বিশেষ করে জকি মণ্ডল তার দোজবর ছেলে কোকিল মণ্ডলের জন্যে দুলালীকে খুব পছন্দ করে ফেলে আর বারবার ঘটক পাঠায় দুলালীদের বাড়িতে।

অবশেষে জকি মণ্ডলের হাত এড়াতে পারে ধোলীর মা। বরটা দোজবর অর্থাৎ একবার বিয়ে করা বরটা বড়সড় মানুষ আর ধোলী ওরফে দুলালী নাবালিকা হওয়া সত্ত্বেও জকি মণ্ডল বলে– চিন্তু করো না ধোলীর মা। শাদির পানি গায়ে পড়লে

নাবালিকা সাবালিকা হয়ে উঠতে আর কয়দিন। রাজী হয়ে যাও, মেয়ে তোমার সুখেই থাকবে।

সুখ যা হোক, দুই বেলা দুই মুঠো পেটপুরে খেতে পাবে মেয়েটা, এই চিন্তাতেও রাজী হয়ে গেল দুলালীর মা। আর তখনই কোকিলের সাথে শাদি হয়ে গেল দুলালীর। কিন্তু বাপের দেখা এই নিতান্তই শিশুপাত্রী দেখে বেজায় নাখোশ হলো কোকিল। বাপ তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রেখে ধোলীকে লাগিয়ে দিলো সংসারের কাজে। সংসারের যাবতীয় কাজ তার ঘাড়ে দিয়ে দুলালীকে আটকিয়ে রাখে জকি মণ্ডল। মায়ের বাড়িতে আর একদিনও যেতে দেয় না। গোটা দুই দুইটি বছর পরে যখন যেতে দেয়, তখন একেবারেই মায়ের বাড়িতে ফিরে আসে ধোলী, ওরফে দুলালী। কারণ, তাকে তালাক দিয়ে কোকিল আর একটা সদ্যবিধবা তরুণীকে বিয়ে করে মোটা অংকের যৌতুক পাওয়ার লোভে। কোন সতীনের ঘর করবে না বলে তরুণীটি শর্ত দেয়ায় কোকিল তালাক দিয়ে বিদায় করে দুলালীকে।

ধোলী অবশ্য ইতোমধ্যেই বেশ ডাগর ডোগর হয়ে উঠেছে। এবার তার উপর নজর পড়ে পাড়ারই এক ষাটের উপরে বয়স ময়েন উদ্দীন ওরফে ময়েন খাঁ নামের এক প্রায় বৃদ্ধ লোকের। স্ত্রী মারা যাওয়ায় আর বেটাপুত সব পৃথক হয়ে পৃথক বাড়িতে পার হওয়ায় ময়েন খাঁ একাই থাকে বাড়িতে। তাকে দেখাশুনা করার কোন লোক না থাকায় ময়েন খাঁ দুলালীর মায়ের হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে শাদি করে দুলালীকে। নিজের কপাল মানিয়ে নিয়ে দুলালী মনোযোগ দিয়েই এই বৃদ্ধের সংসার করতে থাকে। কিন্তু এটাও নসীবে তার সয় না। বছর চারেক পরেই মারা যায় ময়েন খাঁ, আর ধোলী ফের বিধবা হয়ে মায়ের সংসারে ফিরে আসে।

কিন্তু মায়ের সংসারে সেই পূর্ববৎ হা-অন্ন হা-অন্ন অবস্থা। ধোলী ইতিমধ্যেই পুরোপুরি যুবতী হয়ে উঠেছে। আয় উপায়ের জন্যে সে এবার রাস্তায় নেমে আসে আর পুরোপুরি পাল্টে ফেলে নিজের নাম। ধোলী বা দেলী বাদ দিয়ে নিজে সে নিজের নাম রাখে দুলালী। আর এই দুলালী নামটাই সবাইকে সে জানায়।

কিন্তু আয় উপায়ের ধান্দায় পথে নেমে এসেই এক দালালের হাতে পড়ে দুলালী। গার্মেন্টসে কাজ পাইয়ে দেবে বলে সেই দালালটা দুলালীকে এনে এক নারী পাচারকারীর হাতে তুলে দেয়। অনেকটাই নসীবগুণে এই সময় পাচারকারীরা সদল বলে ধরা পড়ায় অন্যান্য মেয়েদের সাথে দুলালীও রক্ষে পায়। www.boighar.com

অতঃপর দুলালী গার্মেন্টসে যাওয়ার চেষ্টা করেও সুবিধে করতে পারে না। তার চেহারাটা বেশ আকর্ষণীয় হওয়ায় তাকে গার্মেন্টসে ঢুকিয়ে দেয়ার নামে সবাই কেবলই ছিঁড়ে খুবলে খাওয়ার উদ্যোগ নেয়। শেষ প্রতারকের হাত থেকে ফসকে এসে সে কি করবে কোথায় যাবে ভেবে গার্মেন্টসের গেটে বসে অশ্রুপাত করারকালে আবদুর রহমান নামের এক সদাশয় অধ্যাপকের নজরে পড়ে। তার দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনে এই অধ্যাপক সাহেব দুলালীকে তাঁর নিজের গৃহে নিয়ে গিয়ে বেশ ভাল মাইনের ঝিয়ের কাজে নিয়োগ করে। অধ্যাপক সাহেবের সংসারটা

বইঘর ও বিএবিডি

খুব ছোট, কাজও অল্প। ফলে এখানে এসে বেশ আরাম আয়েশের সাথে সুখেই দিন কাটতে থাকে দুলালীর। এতদিন পরে সে প্রকৃত সুখের মুখ দেখতে পায়।

কিন্তু কথায় বলে, সুখে খেতে ভূতে কিলায়। পেটের ক্ষুধা মিটে যাওয়ার সাথে সাথে জেগে উঠে তার যৌবনের ক্ষুধা। প্রেম করার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠে। ফলে কাঠমিস্ত্রি রাজমিস্ত্রি এবং বাস-ট্রাকের হেলপারদের সাথে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে জোরদারভাবে প্রেম চালিয়ে যেতে থাকে। টের পেয়ে অধ্যাপক সাহেব তাকে বার বার সতর্ক করে দেয়া সত্ত্বেও শুভবুদ্ধির উদয় হয় না দুলালীর। একদিন সে ট্রাকের এক ভিন্নদেশী হেলপারের হাত ধরে অধ্যাপক সাহেবের গৃহ ত্যাগ করে এবং ঐ হেলপারের ভাড়া করা খুপরী ঘরে এসে উঠে। ঐ হেলপারকে বিয়ে করে কয়েকদিন বেশ সুখেই কাটে তার। কিন্তু ঐ কয়েকটা দিন ফূর্তিফার্তা করে ঐ বিদেশী হেলপারটা চম্পট দিয়ে নিজ দেশে চলে যায়, আর ফিরে আসে না। দুলালী তখন অন্তঃস্বত্বা।

নিরুপায় হয়ে দুলালী আবার ঐ অধ্যাপকের কাছে ফিরে আসে আর অধ্যাপকের হাতে পায়ে ধরে তার বাসাতেই আবার কাজে বহাল হয়। এখানেই সে সন্তান প্রসব করে আর সেই সন্তান নিয়ে আরামে ও নিরাপদেই রয়ে যায় অধ্যাপকের বাসায়।

কিন্তু স্বভাব যায় না মলে আর ইল্লত যায় না ধুলে। খেয়ে দেয়ে ফের সবল হয়ে উঠার পর আবার প্রেমভাব জেগে উঠে দুলালীর মধ্যে। এবার সে অধ্যাপকের বাড়িরই কাজের লোকের প্রেমে পড়ে আবার সে অধ্যাপকের বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় ঐ কাজের লোকের হাত ধরে।

ফলাফল যা হবার তাই হয়। সেই কাজের লোকটাও আর একটা সন্তান দুলালীর গর্ভে দিয়ে কেটে পড়ে নীরবে। দুলালী আর কোনই খোঁজ পায় না তার। আর স্থানও পায় না ঐ অধ্যাপকের বাসায়। মায়ের বাসায় ফিরে এসে সে খোঁজ পায় না মায়েরও। অবশিষ্ট দুই সন্তান নিয়ে তার মাও যেন কোথায় চলে গেছে পেটের দায়ে।

দুলালী অগত্যা ফিরে আসে রাজধানীতে। ইতিমধ্যেই আর একটা সন্তান প্রসব করে দুলালী। ফলে সে আর কোন কাজ পায় না কোথাও। দুই দুইটে শিশু সন্তান দুলালীকে আর ঝিয়ের কাজও দেয় না কেউ। ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে অবশেষে দুই দুইটি সন্তান ও একটা ভাঙ্গা থালা নিয়ে এক ওভার ব্রীজের নিচে এসে বসে যায় দুলালী। ঐ ভাঙ্গা থালাটা বাড়িয়ে ধরে সে ভিক্ষে করে দিনভর আর রাত্রিকালে ও ঝড়-বাদলে ঐ ওভার ব্রীজের নীচেই দুই বাচ্চা নিয়ে এক কোণে সে শোয়। এভাবেই এখন দিন কাটে দুলালীর। আর দুলালী এখন এখানেই থাকে।

ভুলিও স্মৃতি মম

ভুলিও স্মৃতি মম,
নিশীথ স্বপন সম,
আঁচলের গাঁথা মালা–
ফেলিও পথ পরে...

অদৃষ্টের এটা পরিহাস না সমবেদনা জ্ঞাপন তা আল্লাহ তায়ালাই জানেন। মির্জা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আবু সালেহ যখন পথে নামলো তখন তার সামনে অবিরাম বেজে চলেছে এই গান। মির্জা বাড়ির বাহির আঙ্গিনার নিচ দিয়েই ইস্টিশনে যাওয়ার পথ। গ্রামের কাঁচা রাস্তা। জনৈক রসিক পথিক ট্রানজিস্টার হাতে নিয়ে এই পথে ইস্টিশনে যাচ্ছে। ট্রানজিস্টারে ফুল ভলিউম দেয়া। সেই ট্রানজিস্টার থেকে ভেসে আসছে গান– 'ভুলিও স্মৃতি মম...'

এক হাতে বেডিং আর অন্য হাতে বই-পুস্তকের ব্যাগ ঝুলিয়ে নিয়ে আবু সালেহ এই সময় পথে এসে নামলো এবং ঐ ট্রানজিস্টার ওয়ালার পেছনে পেছনে নতমস্তকে হাঁটতে লাগলো। তার দুই চোখ ঝাপসা। ভাল করে দেখার অবস্থা নেই। কিন্তু কানের কোন অন্তরায় ছিল না। সে গানের দিকে কান রেখে অর্ধ মুদ্রিত নয়নে পথ চলতে লাগলো। গান তো নয় যেন তারই অন্তরের মর্মান্তিক আর্তনাদ অকস্মাৎ মূর্ত হয়ে উঠে আছড়ে পড়ছে পথের উপর।

অল্প একটু এগিয়েই সন্তর্পণে চোখ তুললো আবু সালেহ। সে পেছন ফিরে তাকালো। ছেড়ে যাওয়ার আগে মির্জা বাড়িটা আর এক নজর দেখতে চাইলো। কিন্তু বাহির আঙ্গিনায় নজর দিয়েই সে দেখতে পেলো অনেকগুলি কৌতূহলী নজর তার দিকে বিব্রতভাবে চেয়ে আছে।

সে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে নিলো চোখ। আবার সে হাঁটতে লাগলো। কিন্তু অধিক দূর নয়, সামান্য পথ এগিয়েই সে আবার চোখ তুললো চুপিসারে। চোখ তুলেই চমকে উঠলো। ধড়াশ করে শব্দ হলো তার বুকের মধ্যে। মির্জা বাড়ির পেছন দিকে মোড় নিয়েছে পথ। এই মোড় থেকে সে দেখলো বাড়ির পেছনে গাছ গাছরার আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সালেহা। সে এক ধেয়ানে তাকিয়ে আছে তার দিকে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। তার চোখও ঝাপসা। তারও কান এই গানের দিকে। সেও কান পেতে শুনছে– আঁচলের গাথা মালা, ফেলিও পথ পরে... ।'

চোখ মুছলো সালেহা। চোখ মুছে আবার সে তাকালো। বান ডাকলো আবু সালেহর দুই চোখে। আর কিছুই তার দেখার সাধ্য রইলো না। চলমান সঙ্গীতকে অনুসরণ করে সে আবার পূর্ববৎ হাঁটতে লাগলো। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় মির্জা বাড়ির করুণ ও কৌতূহলী তামাম দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল।

কি দিয়ে কি হয়ে গেল আবু সালেহ এখন আর তার হিসাব মেলাতে পারছে না। মাত্র একটা বছরের ব্যবধান। এর মধ্যেই সব কিছু উলট পালট হয়ে গেল। একান্তই অকালে তার জিন্দেগীর সবচেয়ে সেরা নাটক অকস্মাৎ মঞ্চে উঠে গেল। সেটা মঞ্চে উঠে গেল বড় অপ্রস্তুত অবস্থায় আর নিদারুণ মার খেয়ে। সে নাটকের অভিনয় বন্ধ হলো মাঝপথে। আশৈশব অর্জিত সৎ চরিত্রের খ্যাতি তার বদ চরিত্রের ছোবরে বরবাদ হয়ে গেল। হেডমাস্টার সাহেব তাকে ফোর্সড টি.সি. দিয়ে বিদেয় করতে বাধ্য হলেন। আর ক'দিন পরেই কোরবানীর ঈদ। তার আগেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ চরিত্র কোরবানী দিয়ে আবু সালেহকে তার প্রিয় স্কুল ও প্রিয় শিক্ষকদের ছাড়তে হলো। ছিঁড়তে হলো জিন্দেগীর পরম প্রিয় পয়লা বাঁধন।

বাঁধনটায় সে জড়িয়ে গেল আচমকাই। একেবারেই কাঁচা বয়সে আর হাই স্কুলের শেষ ধাপ না পেরুতেই। তবে ব্যাপারটা আজকের মতো নয়। কথাটাও আজকের কথা নয়। এই শতাব্দির অর্থাৎ আজ থেকে কয়েক দশক আগের কথা। আজকের মতো তখন দুধের বাছারা হাই স্কুলের উপর ক্লাশে পড়তো না। উপর ক্লাশে উঠতে উঠতেই কৈশোর পেরিয়ে যেতো। কেউ কেউ ইতিমধ্যেই পৌঁছে যেতো যৌবনে। মেয়েদের তো কথাই নেই। প্রাইমারি পেরিয়েই শ্বশুরবাড়িতে পা দিতো শতকরা নব্বই জন। কম বয়সের বধূ বাঞ্ছনীয় নয়, এটা ঠিক; তবে একেবারেই বুড়িয়ে যাওয়া বধূর মতো তা সৌরভহীনও নয়। থাক সে কথা।

আবু সালেহ সেইকালের ছাত্র। তার কৈশোর প্রায় কেটে গেছে। যৌবনের পয়লা ধাপে পা দিয়েছে। নবম শ্রেণী পাশ করে সে দশম শ্রেণীতে সবেমাত্র উঠেছে। এই ওয়াক্তেই সে জড়িয়ে গেল নসীবের পরিহাসে। মন হারালো জিন্দেগীর সবেরায়।

বয়সের তুলনায় খ্যাতিটা আবু সালেহর আদৌ খাটো ছিল না। সেটা বেশ দড়ই ছিল। এলাকাজুড়ে ব্যাপ্তি ক্লাশের কেবল ফাস্টবয়ই নয় সে, বৃত্তি পাওয়া ছেলে। বৃত্তির পয়সায় পড়ে। খেলাধূলায় সেরা। বক্তৃতা-আবৃত্তিতে স্কুলে তার জুড়ি নেই। চেহারা চিত্তাকর্ষক। চরিত্রটা দুগ্ধবৎ সফেদ। সাত চড়ে মুখে তার 'রা' শব্দ কেউ শুনেনি। কো-এডুকেশান স্কুল। ছেলেদের লোলুপ দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে মেয়েদের হিমশিম খেয়ে যেতে হয়। সেখানে মেয়েরাই চেষ্টা করে আবু সালেহর দৃষ্টি টানতে পারেনি। আবু সালেহর প্রশংসা শিক্ষকদের মুখে মুখে। তাকে নিয়ে গল্প হয় হাটে-ঘাটে গ্রামান্তরে। এই আবু সালেহ ফেঁসে গেল।

আবু সালেহর গুণে ঘাটতি ছিল না। ঘাটতি ছিল বিত্তে। আর এ দুনিয়ায় এই ঘাটতিই বড় ঘাটতি। আবু সালেহর বিষয়-বিত্ত নেই বললেই চলে। একটা ভিটে আর কয়েক টুকরো জমি। মাতা-পিতাও নেই। ভিটেয় তার চাল চুলাও নেই। সে

ভেসে বেড়ানো ছেলে। যেখানে রাত সেখানে কাত। তার জামর দু'মুঠো ফসল যে বুনে সে-ই খায়। আবু সালেহর বিত্ত বলতে বৃত্তির পয়সা। তারও মেয়াদ শেষ হবে দশম শ্রেণী পেরুলেই।

ঘটনাটা সেদিন আকস্মিকভাবেই ঘটে গেল। দশম শ্রেণীতে প্রমোশন পাওয়ার পর কয়েকদিন ছুটি। এর মাঝে মুহররম ও মুহররমের মেলা। মুহররমকে নিয়ে গ্রামাঞ্চলের অনেক স্থানে আজও মেলা বসে। সেদিনও বসতো। মুহররম উৎসব নয়, ত্যাগের শপথ নেয়ার ওয়াক্ত। সেদিনের প্রেক্ষাপটে এ কথা আরো কম লোকে বুঝতো। আবু সালেহর নিজের বাড়িতে কেউ নেই। ছুটির দিনেও তাই সে জায়গীর বাড়িতেই থাকে। কয়েকজন ক্লাশ ফ্রেন্ডের উৎসাহে সে পার্শ্ববর্তী এক গ্রামে মুহররমের মেলা দেখতে চলে এলো। ঘটনাটার সূত্রপাত এখানেই।

হরেক রকম সৌখিন দ্রব্যের বিকিকিনির সাথে এ মেলার বড় আকর্ষণ ইমাম যাত্রার আসর। কারবালার ঘটনা নিয়ে যাত্রাপালা। গ্রামের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লোকেরাই এই যাত্রার আসর দিয়েছে। অনেকটা সাজপোশাক ও বাদ্যবাজনা বিবর্জিত যাত্রাগান। কিতাবহীন প্রমটারহীন ফ্রি-স্টাইল লম্ফঝম্ফ। এর একপাশে কাসেদদের 'হায় হোসেন' বিলাপ এবং আর একপাশে মর্সিয়া দলের মাটি ও বুক চাপড়ানো আর্তনাদ।

খুব জমে উঠেছে মেলা। আবু সালেহ তন্ময় হয়ে এই সমস্ত উন্মাদনা দেখছে। বিস্তীর্ণ এক বটগাছকে কেন্দ্র করে মেলা বসেছে মুহররমের। এই বটগাছের গোড়ার দিকে দাঁড়িয়ে ছিল আবু সালেহ। ভিড় যতই বাড়ছে ততই চাপ সৃষ্টি হচ্ছে আর আবু সালেহ ততই পিছু হটতে হটতে গাছের গোড়ার দিকে সরে যাচ্ছে।

কিন্তু অধিক পেছানোর জায়গা আর ছিল না। বটগাছের গোড়ার দিকে গাছের কাণ্ড থেকে যেসব মোটা মোটা শিকড় নেমে এসেছে তারই আড়ালে ঠাঁই নিয়েছে মেয়েরা। ভিন্নধর্মের কয়েকজন বর্ষিয়সী মহিলাসহ অনেকগুলি মেয়ে। অধিকাংশই বালিকা। কম বয়সের মুসলমান মেয়েও বেশ কিছু এসেছে। এদের কেউ কেউ পাঠশালার ছাত্রী। পাঠশালা পাশ করা হাই স্কুলের ছাত্রীও দু'চারজন আড়ালে আবডালে আছে। আঁচল-ওড়না দিয়ে ঢেকে রেখেছে মাথা। মেয়েরা কেউই লা-ওয়ারিশ নয়। মেলায় তারা এসেছে অভিভাবকদের সাথেই।

ভিড় বাড়তে বাড়তে শুরু হলো হৈ চৈ ও সাময়িক এক অস্থিরতা। এই অস্থিরতার সুযোগ নিলো কয়েকজন বখাটে বদমায়েশ। মেয়েদের মধ্যে ঢুকে পড়ার বদউদ্দেশ্যে তারা ঠেলাঠেলি শুরু করলো।

প্রথম দিকে বুঝতে না পেরে আবু সালেহ আরো খানিক পিছু হটতেই শিকড়ের পাশে দণ্ডায়মাণ কয়েকজন মেয়ের একদম গায়ের সাথে লাগালাগি হয়ে গেল। মেয়েরা ভয় পেয়ে চিৎকার শুরু করলে হুঁশে এলো আবু সালেহ। ঘটনাটা বুঝতে পেরেই সে শক্ত হয়ে গেল এবং শক্ত হয়ে অগ্রগামী বখাটেদের পথ আগলে দাঁড়ালো। শুরু হলো ধ্বস্তাধস্তি। আবু সালেহ একা একা আট দশজন বখাটের চাপ

বইঘর ও বিএবিডি
রুখতে লাগলো। হৈ চৈ শুনে মেয়েদের অভিভাবককেরা চারদিক থেকে ছুটে এলেন। তাঁরা সবাই আবু সালেহর পাশে এসে দাঁড়ালেন। বেকায়দা দেখে বখাটেরা ভেগে গেল। মেয়েরা শান্ত হলো। পরিস্থিতি পূর্বাবস্থায় ফিরে এলো আবার।

আবু সালেহ যে কয়জন মেয়ের একদম কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল তাদের একজনের অভিভাবক আবু সালেহর স্কুলফ্রেন্ড। নাম নাদের আলী। আবু সালেহর দুই ক্লাশ নিচের ছাত্র হলেও বয়সে ও স্বাস্থ্যে নাদের আলী আবু সালেহর চেয়েও অনেকখানি অগ্রগামী। নাদের আলী দূরে ছিল। গোলমাল শুনে ছুটে এসে আবু সালেহকে ভিড় ঠেকাতে দেখে সে জিয়াদা খুশি হলো। গোলমাল মিটে গেলে খুশির আধিক্যে সে আবু সালেহর সাথে মেয়েদের পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলো। সে জোশের সাথে বলতে লাগলো– এ আমার দোস্ত। আমরা একই স্কুলে পড়ি। খুব ভাল ছেলে। ডাকসাইটে ছাত্র। ক্লাশের ফার্স্ট বয়। স্যারেরা একে জব্বোর ভালবাসেন।

মোমেনা নামের মেয়েটি একটু মুখরা। নাদের আলীর ভাগ্নী। সে হেসে ফেলে বললো– শুধু গুণটাই শুনাচ্ছেন মামা? নামটা কি, সেটা তো আগে বলবেন?

নাদের আলী বললো– ও নাম? এর নাম আবু সালেহ। ক্লাশ টেনের ফার্স্ট বয়।

: কি নাম?

www.boighar.com

: সালেহ সালেহ, আবু সালেহ!

পাঁচ ছয়জন মেয়ে ওখানে এক জায়গায় ছিল। এদের মধ্যে যে মেয়েটি সবার চেয়ে একটু বড় সে ফিক করে হেসে উঠলো এবং ওড়না দিয়ে মুখ চেপে মাথা নিচু করলো। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মেয়েরাও ফিক ফিক করে হাসতে শুরু করলো। আবু সালেহ অবাক হলো। শরমও পেলো কিঞ্চিৎ। সে থতমত খেয়ে নাদের আলীকে প্রশ্ন করলো– কি ব্যাপার নাদের মিয়া? আমার নাম শুনে উনি হেসে ফেললেন কেন? বড় মেয়েটির দিকে ইংগিত করে নাদের আলী সহাস্যে বললো– কে ঐ মেয়ে? ওকে তুমি উনি বলছো? আরে দূর! ওতো আমার ভাগ্নীর মানে এই মোমেনার সই। পাঠশালার বান্ধবী। সবেমাত্র পাঠশালা পাশ করলো এবার। ও কোন মুরুব্বী কেউ নাকি?

: আচ্ছা। তা ও আমার নাম শুনে হেসে ফেললো কেন?

জবাব দিলো মোমেনা। সে হাসি মুখে বললো– কেন আবার? আপনি তো আমার এই সই-এর মিতিন হলেন।

: মিতিন!

: হ্যাঁ। আমার এই সইয়ের নাম সালেহা।

: সালেহা?

নাদের আলী বললো– ও হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইতো। আবু সালেহ আর সালেহা। সত্যিই তো! মিতিনই তো হলে তুমি।

নাদের আলী হাসতে লাগলো। আবু সালেহ এতক্ষণে ওড়নায় মুখ ঢাকা এই অপেক্ষাকৃত বড় মেয়েটির দিকে নজর তুলে সরাসরি তাকালো। সালেহাও এই

সময় আবু সালেহকে আরো ভাল করে দেখার জন্যে মুখের ওড়না সরালো। সঙ্গে সঙ্গেই চোখাচোখি আর আবু সালেহ এই এক নজরেই ধরাশায়ী হয়ে গেল।

মজনুর চোখে লাইলির মতো কৈশোর ও যৌবনের মাঝখানে দণ্ডায়মাণ এই ঈষৎ শ্যামলা মেয়েটার মধ্যে আবু সালেহ কি দেখলো তা সেই জানে। তবে সমরখন্দ বুখারা তার হাতে থাকলে সে এই মুহূর্তে নির্দ্বিধায় তা এই মেয়েটিকে উপহার দিয়ে বসতো।

সালেহার চেহারাটাও অবশ্য অনাকর্ষণীয় ছিল না। গায়ের রং অনুজ্জ্বল হলেও তার চোখ মুখ নাক ঠোঁট বেশ চমৎকার। খোদাই করাই বলা যায়। শ্রাবস্তীর কারুকার্য নয় সত্য, তবু তার চেয়েও বড় একটা কারুকার্য হয়ে এ মুখ আবু সালেহর মানসচক্ষে ধরা দিল।

চোখ নামালো আবু সালেহ। চোখ ফেরালো সালেহাও। আবু সালেহ আবার চোখ তুললো সন্তর্পণে। দেখলো সালেহাও তাকে সন্তর্পণে দেখছে। আবার চোখাচোখি এবং আবার সহাস্যে চোখ ফেরালো উভয়ে। সালেহার চোখে আবু সালেহ কেমন ছিল সালেহারই তা জানা রইলো। আবু সালেহ জানলো না। তবে সে বুঝতে পারলো নেশা ধরেছে তার চোখেও। এরপর পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি বিনিময় হলো। নয়নবানে অবিরাম বিদ্ধ হলো এই দুই যৌবনোন্মুখ নরনারী। খুন হলো দু'জনই।

অনাঘ্রাত জিন্দেগীর পয়লা ঘ্রাণ মারাত্মক। এর দক বড় তীব্র। অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে। দখল করে অন্তরের সবটুকু প্রকোষ্ঠই। এ নেশা ছুটে যেতে সময় নেয়। সফেদ ক্যানভাসে রঙ-এর পয়লা দাগ জীবন্ত হয়ে উঠে। জ্বলজ্বল করে জ্বলে।

জ্বলন্ত স্মৃতি নিয়ে উভয়েই ফিরে গেল উভয়ের আভাসে। আবু সালেহ ও সালেহা মেলা শেষে দু'জন দু'জনের চোখের আড়াল হয়ে গেল। কিন্তু রয়ে গেল হৃদয়জুড়ে। প্রথম প্রথম কয়েকদিন এই নিয়েই দিন কাটলো তাদের। একে অন্যের কথা ভেবে কেটে গেল রাত। এরপর ক্রমে ক্রমে লাঘব হলো তীব্রতা। একেবারেই বিলীন হয়ে গেল না। একের কাছে অন্যর স্মৃতি নিরজনের দোসর হয়ে রইলো।

সেই থেকে আর তাদের দেখা নেই। দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। ভেবেচিন্তে হতাশ হলো উভয়েই। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা দিলের ভার হালকা করতে লাগলো।

এইভাবেই হয়তো একদিন দু'জনই হারিয়ে যেতো দু'জনের অন্তর থেকে। কিন্তু পরিস্থিতির মার ছান্দার সাধ্য আছে কার? গায়েবী পরমজনের ইচ্ছে ইরাদার উপর হাত রাখতে পারে কে? ইস্কুলে এসে শিক্ষকদের কক্ষের দিকে যেতেই আবু সালেহ চমকে উঠে দেখলো ছাত্রীকক্ষের দরজার উপর সালেহা দাঁড়িয়ে। ঘটনা, এই স্কুলেই ক্লাশ সিক্সে ভর্তি হয়েছে সালেহা। বান ডাকলো মরা গাঙ্গে!

আবার প্রতিদিন চোখাচোখি। আবার সন্তর্পণে হাসাহাসি এবং আকারে ইশারায় হৃদয়ের লেনাদেনা। কথা তেমন না হলেও দেখাটা হতে লাগলো নিতি নিতি। স্ফীত হয়ে উঠতে লাগলো আবেগ ও আকর্ষণের পরিমাণ।

আবু সালেহ দিন দুয়েক স্কুলে আসতে পারলো না। যে বাড়িতে থাকতো সে তারা কিছুটা গরীব মানুষ। ফসল এবার ভাল হয়নি। টানাটানি সামনে তাদের। আবু সালেহকে তাই আর রাখতে তারা পারলো না। আবু সালেহকে স্থানান্তরে যেতে হলো। স্কুলের মৌলভী সাহেব এই স্থানান্তরের ব্যবস্থা করে দিলেন। অন্য এক গ্রামে এক অবস্থাপন্ন গৃহে আবু সালেহর জায়গীর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। এই নয়া বাড়িতে পার হওয়া নিয়ে আবু সালেহর দুইদিন স্কুলে আসা বন্ধ রইলো। সে স্থির করলো, নতুন জায়গীর বাড়িতে পার হয়ে ঠিকঠাক হওয়ার পর আবার সে শুরু করবে ইস্কুলে যাতায়াত। সালেহা বেগম দুই একদিন পথ চেয়ে থাকুক না। বিরহ বিনে আকর্ষণ বাড়ে না।

আবু সালেহ নয়া জায়গীরে পার হলো সাঁঝের একটু আগে। নয়াবাড়ির ছেলেমেয়েরা সেই সাঁঝেই পড়তে এলো নয়া মাস্টারের কাছে। একটা ভাল ছাত্রের সংস্পর্শে ও গাইডেন্সে তাঁর ছেলেমেয়েরা থাকুক, এই ইরাদায় গৃহস্বামী এক কথায় রাজী হয়েছেন আবু সালেহকে জায়গীর রাখতে। পড়ুয়া ছেলেমেয়ে তার অনেকগুলি। ছোট, বড়, মাঝারী। এতগুলো ছেলেমেয়েকে পড়াতে হবে দেখে আবু সালেহ মনে মনে দমে গেল। একা একা বসে থেকে সে এতক্ষণ সালেহার কথা ভাবছিল। সব ভাবনা তার ছুটে গেল।

মাগরিবের নামাজ অন্তে ছেলেমেয়েরা সবাই এসে নয়া মাস্টারকে ঘিরে বসলো। নতুন নতুন বোধে তারা চুপচাপ ও জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল। লণ্ঠনের আলোতে তাদের চেহারাগুলি ভাল করে দেখতে গিয়ে আর একবার ভিমরী খেলো আবু সালেহ। তার জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে গেল। কাঁপন জাগলো সর্বাঙ্গে। অন্তরে তার আওয়াজ উঠলো, একি তোমার রঙ্গ মওলা, এ কি রঙ্গ তব!

আবু সালেহ দেখলো, একটু ফাঁকে বসা সবচেয়ে বড় মেয়েটি। শাড়ী পরে এসেছে। শাড়ীর আঁচলে মুখ লুকিয়ে সে আড়চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। তার চোখের তারায় খেলা করছে হাজার একটা কৌতুক। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে সে প্রাণপণ হাসির বেগ দমন করছে। সে মেয়েটি সালেহা। অর্থাৎ আবু সালেহর ঠাঁই হয়েছে সালেহাদেরই বাড়িতে।

এর পরের ঘটনা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। চাওয়া-চাওয়ি, হাসাহাসি, কথাবার্তা, আলাপ-ঠাট্টা এবং সব শেষে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের রঙিন ছক তারা দিনের পর দিন নিরিবিলিতে বসে পোক্তভাবে এঁকে নিলো।

গড়িয়ে চললো দিন। গড়িয়ে গড়িয়ে ঘটনা ক্রমেই ঘনীভূত হতে লাগলো। আবু সালেহর ফায় ফরমায়েশ, খাওয়া দাওয়া তয়-তদবির, তার কাপড় কাঁচা, বিছানা পাতার কাজটাও সালেহা বেগম নিজের হাতে তুলে নিলো। এমনিতেই এক সাথে স্কুলে যাতায়াত নিয়ে পাঁচজনের পাঁচ কথা ইতিমধ্যেই তুলেছিল। এবার বাড়ির মধ্যেও ঝড় তুললো ভাই-ভাবী, চাচা-চাচী, ফুফু-মামী, চাকর-নফর অর্থাৎ মাতা-পিতা বাদে বাড়ির জেনানা মর্দানা সমুদয় ব্যক্তিবর্গ। তাদের সাথে যোগ দিলো আশ

পড়শী, পাড়ার লোক। নানা মুখে নানা কথা। এমন বেহায়াপনা তারা জীবনেও দেখেননি। মির্জা বাড়ির মর্যাদা এমনভাবে ক্ষুণ্ন এ বংশের আর কেউ করেনি। এই হতচ্ছাড়ি মেয়েটা জাতকুল মান তামামই ডুবালে! মির্জা সাহেব এখনও যদি দেখে এসব না দেখেন তাহলে তাকে পস্তাতে হবে আখেরে। দু'দিন পরে দশের মধ্যে নিজেই তিনি মুখ দেখাতে পারবেন না।

আবু সালেহকে সালেহার আব্বা আম্মার খুব পছন্দ। সালেহার পাশে আবু সালেহকে দেখতে তাদের মন চায়। লেখাপড়া আর খানিকটা এগুলেই এই ছেলের সাথে সালেহার শাদি দেয়ার ইচ্ছে পোষণ করেন তারা। ছেলের কিছু না থাক, তাদের তো আছে। ও থেকে খানিক দিয়ে দিলেই সুখে থাকবে মেয়ে জামাই। ফলে কারো কথায় এ যাবত কান দেননি তারা।

সালেহার আব্বা মির্জা সাহেবের মানসিকতা আরো শক্ত। বদনামটা যদি নেহায়েতই অধিক ছড়ায় ইতিমধ্যে তখনই তিনি উভয়ের শাদি দিয়ে দিবেন। ঘর জামাইও তো রাখে লোকে। আবু সালেহ কিছুদিন সেভাবেই থাকবে। এখানে থেকেই লেখাপড়া শিখবে। নিজের পায়ে দাঁড়ালে তাদের ভাবনা তারাই ভাববে।

সেই বদনামটাই খুব বেশি ছড়ালো। কুকথা বাতাসের আগে দৌড়ায়। কয়েক দিনের মধ্যেই চারদিকে থুথু উদগিরণ মাত্রাধিক হয়ে গেল। তল্লাট জুড়ে শোর পড়ে গেল সালেহা ও আবু সালেহর গোপন প্রেম-কাহিনী নিয়ে। মির্জা সাহেবের মুখ দেখানো সত্যি সত্যিই দায় হয়ে দাঁড়ালো।

মির্জা সাহেব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। আবু সালেহর দু'একজন আত্মীয় যাঁরা ছিলেন তাদের তিনি তড়িৎ বেগে ডেকে আনলেন এবং সেই রাতেই আবু সালেহর সাথে সালেহার শাদি পরিয়ে দিতে গেলেন।

বাদ সাধলেন বাদ বাকী আর সকলেই। মির্জা সাহেবের পুত্র-পরিজন, আত্মীয়-বান্ধব সবাই। আপত্তির তুফান তুলে ছুটে এলেন তারা। কথা তাঁদের সবগুলোই যুক্তিগ্রাহ্য। এতিম নিঃস্ব ছেলে। চালচুলা ঠাঁই-ঠিকানা কিছুই নেই। এমন পাত্রের সাথে মির্জা সাহেব তাঁর কন্যার শাদি দেবেন কি? তাতে কি মান থাকবে তার, না মান থাকবে তার পরিবারের? আত্মীয়-স্বজন সবার মাথাই হেট হয়ে যাবে। ওদিকে আবার একদিনের জন্যেও তো কেউ আবু সালেহর বাড়িতে কুটুম্বিতা করতে যেতে পারবে না।

সালেহার চাচা মামা, ফুফা-নানা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, যোগ্য বরের অভাব কি? তাদের আশেপাশের গ্রামগুলিতে কলেজে পড়া অনেক ছেলে আছে। এদের অনেকেরই বংশ-বুনিয়াদ উমদা। বিষয়বিত্ত অঢেল। সালেহার সাথে শাদির প্রস্তাব দিলে তারা লুফে নেবে সালেহাকে। তাতে মির্জা বাড়ির মর্যাদা আরো শানদার হবে। ভাল একঘর কুটুম বাড়বে। ধুমধাম করে সকলেই কুটুম্বিতা করতে পারবেন।

মির্জা সাহেবকে মহাক্লেশে ঘিরে ধরলেন তারা। বললেন- পাগলামী ছাড়ুন। এখনই আমরা তোফা বর এনে দিচ্ছি। মেয়ের জামাই আপনিই শুধু দেখার লোক? আমরা মেয়ের কেউ নই?

মির্জা সাহেব হিমশিম খেয়ে গেলেন। কি করবেন ভাবতে লাগলেন। তবু হয়তো সামাল দিতে পারতেন তিনি। কিন্তু গোদের উপর বিষফোঁড়া পয়দা করলেন আবু সালেহর এক আত্মীয়। তিনি গোঁ ধরে মির্জা সাহেবকে বললেন– এমন ব্রিলিয়ান্ট ছেলেটার পড়াশুনা বন্ধ হলে তো চলবে না? শাদি দেবেন দিন। কিন্তু ছেলেটার পড়াশুনার খরচ কত কি দেবেন সেটা আগে লেখাপড়া হোক, সে টাকা পাসবুকে জমা হোক, তারপরে শাদি।

মির্জা সাহেব বললেন– ঠিক আছে। অনেক বাধার মুখে আছি এখন। আগে কলেমাটা হয়ে যাক, তারপরে সব ঠিক করে দেবো।

ভদ্রলোক গরমকণ্ঠে বললেন– না, আগে পাশ বুকে টাকা, কলেমা তার পর।

মির্জা সাহেব বিনীতকণ্ঠে বললেন– আহা, জিদ ধরবেন না। কাজটা আগে ভালোয় ভালোয় পার হোক।

উনি বললেন– কভভি নেহি!

বিগড়ে গেলেন মির্জা সাহেব। এত বিপত্তি আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ক্রোধভরে বললেন– ঠিক আছে, এ শাদি হবে না। আমি মেয়ের বিয়ে দেবো না। একদম না। আপনারা বিদেয় হন।

মির্জা সাহেব উঠে গেলেন। খবর শুনে মহোল্লাসে নেচে উঠলেন মির্জা সাহেবের পরিবার পরিজন আত্মীয়বর্গ। তারা প্রায় লাঠি ধরে আবু সালেহর আত্মীয় ক'জনকে বাড়ি থেকে নামিয়ে দিলেন।

ঐ দিনই বিকেলে আবু সালেহও বেডিং ও বই-পুস্তক বেঁধে নিয়ে মির্জাবাড়ি ছাড়লো। বিদেয় হলে বেরুনোর আগে সে সালেহাকে কোনমতে জানিয়ে দিলো 'ভুলিও স্মৃতি মম...'

নসীবের পরিহাসে পথে নেমেও আবু সালেহ পথ চলতে চলতে শুনতে লাগলো ঐ গানটাই– 'ভুলিও স্মৃতি মম, নিশীথ স্বপন সম ...'

পথিমধ্যে এক ছেলে সালেহার এক চিরকুট এনে আবু সালেহর হাতে দিলো। সালেহা আবু সালেহকে জানিয়েছে– 'এ স্মৃতি ভোলার নয়।'

২

এরপর কেটে গেছে দীর্ঘদিন। দীর্ঘ আট ন'টি বছর। আবু সালেহর আর কোন খবর নেই। বিদায়কালে আবু সালেহর টেস্ট পরীক্ষা একদম সামনে ছিল। হেডমাস্টারের কাছে গেলে হেডমাস্টার সাহেব তাকে ফোর্সড টি.সি. দিয়ে দূর দূর করে বিদেয় করে দিলেন। এইটুকুই জানে সবাই। তার গাঁয়ের লোক বা আত্মীয়রাও এর বেশি জানে না।

এই বছর তিনেক আগে অবশ্য আবু সালেহর হদিস পাওয়া গেছে আবার। প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখে এসেছেন মওকা অভাবে আবু সালেহর আর লেখাপড়া হয়নি। ঢাকার কোন এক লাইব্রেরী না ক্লাবে সে পিয়নের চাকরি নিয়েছে। সে সেই চাকরিই করে এখন।

শাদি হয়নি সালেহারও। বহভারম্ভে লঘু ক্রিয়ার মতো এত তোড়জোর সত্ত্বেও সালেহার আর শাদি দেয়া যায়নি। এর একটা কারণ, আবু সালেহকে ঘিরে সালেহার কুৎসা। বড় কারণ, সালেহার নিজের জিদ। সে শাদি করতে চায় না, পড়াশুনা করতে চায়।

জিদটা তার ফলপ্রসু হয়েছে। এসএসসি পাশ করে সে কলেজে পড়ছে এখন। একাধিক অন্তরায় অতিক্রম করতে না হলে সে আরো উপরে পড়তো।

মেয়ের এই জিদের কি কারণ সবাই তা জানেন। কিন্তু জেনেও ফায়দা নেই। একটা পিওনের সাথে সালেহার শাদি হয়ই বা কি করে আর সে উদ্দেশ্যে আবু সালেহকে ধরে আনতে যাচ্ছেই বা কে?

ধরে আনতে হলো না। দীর্ঘদিন পরে আবু সালেহ হঠাৎ আবার নিজেই একদিন হাজির হলো মির্জা সাহেবের বাড়িতে। ঈদুল আজহার ছুটি। নৌকাপথে নিজের গ্রামে যাচ্ছিল সে। নদীর ঘাটে নৌকা বেঁধে রেখে সে নেমে এলো মির্জা বাড়িতে। পরনে তার পিওনের লেবাস না থাকলেও যা ছিল তা নিতান্তই সাদামাটা।

আবু সালেহকে আবার এখানে দেখে পূর্ববৎ ক্ষেপে গেলেন সে পরিবারের প্রায় সকলেই। আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা ছুটে এলেন হৈ হৈ করে। অনেক ছিঃ ছিঃ সহ্য করতে হয়েছে তাদের। এলাকাজুড়ে কুৎসা কলংকের ঝড় বয়ে গেছে। এখন সেটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। অনেকের তা আর মনেও নেই। সেটা আবার পুনর্জীবিত হবে এটা অসহ্য। তারা রুক্ষকণ্ঠে আবু সালেহকে বাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে গেলেন।

বাধা দিলেন মির্জা সাহেব। তিনি বললেন– না, আবু সালেহ আর এ বাড়ি থেকে যাবে না।

মির্জা সাহেবের জ্যৈষ্ঠ পুত্র আবদুল কাদের বললেন– এর অর্থ কি আব্বাজান?

মির্জা সাহেব বললেন– সালেহা কাল হোস্টেল থেকে এসেছে। আবু সালেহ রাজী থাকলে আজই তাদের শাদি পরিয়ে দেবো।

আবদুল কাদের আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন– সেকি, এই একটা পিওনের সাথে শাদি দেবেন সালেহার? ইজ্জতের প্রশ্ন পড়ে মরুক, এমন একজন নিঃস্ব ও ভবঘুরে লোকের হাতে মেয়ে দেয়া মানে তো মেয়েটাকে একদম কোরবানী করে দেয়া।

মির্জা সাহেব বললেন– তাই যদি মনে করো তা তোমরা করোগে। আমি বাপ। মেয়ের মুখে হাসি ফোটানোর প্রশ্নটাই আমার কাছে বড়।

অকস্মাৎ সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। হকচকিয়ে গিয়ে সবাই দেখলেন ধবধপে পোশাকের উপর উজ্জ্বল তকমা আঁটা একজন চাপরাশী ও তার পেছনে একজন বন্দুকধারী পুলিশ হন হন করে সামনে এগিয়ে এলো। তারা আবু সালেহর কাছে এসে তাজিমের সাথে বললো– হুজুর, সেই নৌকা থেকে নেমে এলেন আর ফিরে গেলেন না। ফিরতে কি হুজুরের খুব বেশি দেরী হবে?

আবু সালেহ উদাসকণ্ঠে বললেন– না, কি আর এমন দেরী?

মির্জা সাহেবের আওলাদ আবদুল কাদের অপার বিস্ময়ে বললেন– হুজুর! হুজুর মানে?

চাপরাশিটা তেড়িয়াকণ্ঠে বললো– তাজ্জব! হুজুরকে দাঁড় করে রেখে আপনারা কথা বলছেন তার সাথে? একটা কুরসীও কি মকানে আপনাদের নেই?

: কুরসী!

একজন সি.এস.পি. অফিসার আপনাদের বাড়িতে আর আপনারা তা ভ্রূক্ষেপই করছেন না?

মির্জা সাহেব থতমত করে বললেন- সি.এস.পি. অফিসার।

এস.ডি.ও, এস.ডি.ও.। আপনারা তাহলে হুজুরকে আসলেই চেনেন না দেখছি। আমাদের এই হুজুর সিরাজগঞ্জের এস.ডি.ও. বাহাদুর। অল্প দিন আগে সিরাজগঞ্জে এসেছেন। হুজুর খুব নামকরা মহকুমা প্রশাসক।

: সে কি!

চাপরাশিটা এবার কণ্ঠস্বর অনেকখানি খাটো করে স্মিতহাস্যে বললো– হুজুর তো বিয়ে শাদি করেননি, পোষ্য-পরিবার নেই। তাই এই ঈদুল আজহার ছুটিতে হুজুর একটু গ্রামের দিকে যাচ্ছেন। মানে নিজের জন্মস্থানটা দেখতে যাচ্ছেন।

আবদুল কাদেরের চোখ দুটি ফুটে উঠেছে তখন। তিনি ঢোক চিপে অস্ফুটকণ্ঠে বললেন– এস-ডি–ও–!

অনেক আগেই সালেহা এসে দেউটির আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল এবং স্বপ্নদৃষ্টবৎ তন্ময় হয়ে সকলের কথা শুনছিল। স্বপ্নোত্থিতের মতো এবার সে নিজের অজ্ঞাতেই সশব্দে বলে উঠলো– আলহামদুলিল্লাহ!

সাবাশ চাচী, সাবাশ

'অতীত দিনের স্মৃতি
কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে...'

কবির কথা। সেরেফ কথার কথাই নয়, একেবারে হক কথা। অতীত পিরীতের কথাই হয়তো প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল কবির। তা পিরীতের কথাই হোক আর তামাসার কথাই হোক– সত্যি সত্যিই কিছু লোক অতীতের সব কথাই ভুলে যায় বেমালুম। কিন্তু কিছু লোক তা ভোলে না। ভোলে না মানে, ভুলতে তারা পারে না। তাদের মনের কোণে কিছু কথা ওঁৎ পেতে বসে থাকে সংগোপনে। প্রসঙ্গের পরশ পেলেই তড়াক করে সে কথা লাফিয়ে উঠে তৎক্ষণাৎ। অন্য সব কথাকে এক তুড়িতে তাড়িয়ে দিয়ে সে কথাটা একাই দখল করে মনোরাজ্যে আর একাই সেখানে রাজত্ব করে কিছুক্ষণ মানুষটা এক পলকে পাল্টে যায় আমূল। হারিয়ে যায় তার অস্তিত্ব। ভুলে যায় স্থান-কাল-পাত্র। চলে যায় অতীতে ভূতে ধরা রুগীর মতো মানুষটা। তখন কখনো বা হেসে উঠে আজগুবী, কখনো বা বিমর্ষ হয় বেদনায়। বেদনার আধিক্যে কারো কারো চোখ থেকে ঝরে পড়ে পানি।

আগামীকাল ঈদুল ফেতর। হঠাৎ করে আজ জামান সাহেবের সেই দশা হলো। স্ত্রী কন্যা পুত্র ঘেরা গুরুগম্ভীর পরিবেশে হঠাৎ করেই ভূতে ধরা রুগীর দশা প্রাপ্ত হলেন তিনি। অতীতের এক আজব স্মৃতি মনে আসায়, সবার মাঝে বিপুলবেগে হাসতে লাগলেন চাপা হাসি। বেগটা এতই তীব্র যে, মুখটা চেপে ধরেও সে হাসি থামাতে আর পারেন না। তবু ভাল যে, ব্যাপারটা হাসির ছিল। কান্নার ব্যাপার হলে আর আজগুবি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলে অনেক জিল্লতিই নসীবে ছিল আজ তার। সন্দিহান চিত্তে অর্ধাঙ্গিনী চেপে ধরতেন তাকে। এ কান্নার অর্থ ভেঙ্গে না নিয়ে কিছুতেই ছাড়তেন না। ওদিকে আবার হেমায়েতপুরে নেয়ার চিন্তাও মাথায় আসতো পুত্র-কন্যার।

প্রসঙ্গটা ঈদেরই। ঈদের দিনে খাওয়ার প্রসঙ্গ। বাজারের সময় তার হাতে এলো বাজারের ফর্দা। সবই ভোজন সামগ্রী। খাবারের মেন্যুও বিচিত্র। বিরিয়ানী, জর্দা, সাদা পোলাও, লাল পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা, কোরমা, কাবাব, দই, মিষ্টি প্রভৃতি ছাড়াও হরেক রকমের অন্ন ব্যঞ্জন ও পানাহারের বায়না। যাকে বলে ষোড়শোপচারে ভোজ। সে ব্যবস্থা না করলে নাকি মান থাকবে না ফ্যামিলীর। রসনার তৃপ্তিতে সবার ঘাটতিতো পড়বেই, সেই সাথে মেহমানদের সামনেও লজ্জায় মাথাকাটা যাবে সবার। তাদের ব্যখ্যায়, ঈদের আনন্দ মানেই রসনার তৃপ্তির ব্যাপার। ভোজন বিলাস ছাড়া অন্য কিছুই নয়। রোজার সাথে সম্পর্ক তাদের যথেষ্টই ঢিলেঢালা।

কাজেই, রোজার ঈদের প্রকৃত আনন্দটা কোথায়, তা তারা বড় একটা বোঝে না। এদের আনন্দ রসনায়। তাই, সকাল থেকে সাঁঝ পর্যন্ত কখন কি খাবে তারই আনযাম রাখা হয়েছে ফর্দে। বাজারের ফর্দের দিকে চেয়ে আর এদের ভোজনের বর্ণনা শুনে জামান সাহেব ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন। এরপর শাঁ করে চলে গেলেন অতীতে। চলে গেলেন তার বাল্যজীবনে আর সঙ্গে সঙ্গেই হাসতে লাগলেন আজগুবি। মুখ চেপে ধরে হাসতে লাগলেন বিপুল বেগে।

স্ত্রী-কন্যা পুত্রেরা হতবাক। হতবাক ঝি-চাকর আয়ারা। জামান সাহেব থামলে সকলেই চেপে ধরলেন তাকে। জানতে চাইলেন হাসির অর্থ। ভয়ানক চাপের মুখে জামান সাহেব বললেন– অন্য কিছু নয়। হঠাৎ অতীতের একটা কথা মনে পড়ায় এই হাসি এসে গেল আমার।

ফের সবাই প্রশ্ন করলেন– কি সে কথা?

জামান সাহেবের মুখে হাসি এলো আবার। হাসি চেপে বললেন– কথাটা হলো- 'সাবাশ চাচী, সাবাশ!'

পলক খানেক চেয়ে থেকে ছেলেমেয়েরা বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলো– সাবাশ চাচী মানে? অর্থ কি এ কথার?

জামান সাহেব বললেন– অর্থ এটা একটা ঘটনা। আমার বাল্যকালে এই ঘটনাটা ঘটেছিল। ঐ ঘটনারই মধ্যেকার একটা কথা এটা।

বলা বাহুল্য, চাপের মুখে জামান সাহেব বাধ্য হয়ে তার বাল্যকালের সেই ঘটনাটা বর্ণনা করতে লাগলেন–

ঘটনাটা একটা ঘটনাই। গাঁয়ের নাম ইছবপুর। প্রত্যন্ত এক পল্লী। জামান সাহেব ঐ গাঁয়েই জন্মগ্রহণ করেন। একেবারেই সাদামাটা এক কৃষক পরিবারে জন্ম তার। বাল্যকালে তার নাম ছিল নুরু। 'নূর্‌যা'ও বলতো হিংসুটেরা। কিন্তু তিনি ছিলেন ভীষণ মেধাবী। তাক লাগানো রেজাল্ট করে সব পরীক্ষা পাশ করার পর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাও পাশ করেন কৃতিত্বের সাথে। অতঃপর নুরু মিয়ার নাম হয় মুহাম্মদ নুরুজ্জামান তথা মিস্টার এম. এন. জামান। এখন তিনি সাকুল্লে জামান সাহেব।

অত্যন্ত উচ্চপদে চাকরি করে প্রভূত মান সম্মান কামিয়েছেন জামান সাহেব। বিস্তর বিষয় বিত্ত ও বাড়ি গাড়ি করেছেন। বাস করেন অভিজাত এলাকায়। চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন এখন। কিন্তু আভিজাত্যটা খোয়া যায়নি সে কারণে। নিজের তেমন না হলেও এই আভিজাত্যবোধটা তার স্ত্রী-কন্যা-পুত্রদের প্রবল। তাই ঈদ ভোজনের এইসা মাফিক মেন্যু তাদের।

কিন্তু জামান সাহেবের ছেলেবেলার দিনগুলি কতই না পৃথক ছিল তার সন্তানদের আজকের এই দিনের চেয়ে। আজ এরা সকাল থেকেই ষোড়শোপচারে খেতে চায়। কিন্তু জামান সাহেব তথা সেদিনের নূরু এমন কথা ভাবতেও পারতো না। সেদিনের

নুরুদের ঈদের দিনের নাশতা ছিল পান্তা পানি, অর্থাৎ সাদামাটা বাসী ভাত। ঈদের খানা পাকাতে পাকাতে দুপুর হয়ে যেতো। ঈদের খানাকে ঈদের শিরনী বলতো তৎকালীন পল্লীর প্রায় সকলেই। সে শিরনী পাকানো হতো মোটা চাল আর ঝাল মরিচ দিয়ে। মোরগের মাংস আর তেল মশলার মিশ্রণ থাকতো বলে এটাকে বলা হতো পোলাও অর্থাৎ ঝাল পোলাও। মসজিদের খতিব এসে সকাল বেলা গাঁয়ের প্রত্যেকের মোরগ জবাই করে দিতেন। বিনিময়ে তিনি সবগুলো মোরগের কল্লা ও কলিজা গামলা ভরে পেতেন। অন্তত ইছবপুর এলাকার এটাই ছিল নিয়ম।

খতিব এসে মোরগ জবাই করে দেয়ার পর তবেই শুরু হতো এই শিরনী বা ঝাল পোলাও-এর পাক। পাক নামার সাথে সাথে কারো এ পোলাও মুখে দেয়ার উপায় ছিল না। কারণ, এটা তো কেবল ঈদের খানাই নয়, ঈদের শিরনীও। পাক শেষে গামলা ভরে আগে মসজিদে পাঠানো হতো শিরনী। তবেই খেতে পেতো ছেলেমেয়েরা। তার আগে কেঁদে মরে গেলেও নয়।

গাঁয়ের সব বাড়ির শিরনী বা পোলাও এসে মসজিদে জমা হতো। গাঁয়ের মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে বসতো এবং সকলের শিরনী একটু একটু করে সবার পাতে দেয়া হতো। উল্লেখ্য যে, যারা খুবই গরীব মানুষ তারা মোরগের পোলাও পাকাতে পারতো না। ডালে চালে খিচুরী পাকিয়ে মসজিদে পাঠাতো।

একবার এই শিরনী বিতরণকালেই জামান সাহেবের ঐ হাসির ঘটনা ঘটে। ইছবপুর গাঁয়ের মাতবর ছিলেন জাহান আলী তলবদার। জমিদারের খাজনা আদায়ের কাচারীতে তার বাপদাদারা তলবদারের কাজ করতেন। খাজনা পরিশোধ করার জন্যে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে প্রজাদের তলব দিয়ে ফিরতেন। সেই সুবাদে তাদের পদবী তলবদার। যতটা না গুণে তার চেয়ে দশগুণে গর্জনের জোরে জাহান আলী তলবদার গাঁয়ের মাতবরীটা কুক্ষিগত করেছিলেন। এছাড়া তলবদার পিয়ন যাই হোক, জমিদারের কাচারীতে কাজ করা লোক তারা। এ কি চারটি খানি কথা! গাঁয়ের মানুষ তাদেরকেও জমিদারের কাছাকাছি কেউ মনে করতো। মাতবরী তার আটকায় কে? তদুপরি তোয়াজকারীও তার পেছনে কয়েকজন ছিল। তারা অষ্টপ্রহর তার পেছনে সেঁটে থাকতো আর তোতা পাখির মতো সমর্থন করতো মাতবরের তামাম কথা। এই তোয়াজকারীদের শীর্ষে ছিল ঐ গাঁয়েরই তইবর আলী, গোদাই শেখ আর ময়ান মাঝি।

এসবের ফলে জাহান আলীর দুর্দান্ত দাপট আর অহংকার। নিজের আর তার পরিবারের প্রশংসায় মাতবর সাহেব মুখর থাকতেন সব সময়।

সেবার শিরনী বিতরণকালে দেখা গেল, সবাই মোরগের শিরনী দিয়েছে কিন্তু তসরীর মা পাঠিয়েছে ডাল খিচুরি। তসরীর মা অত্যন্ত এক গরীব বিধবা। মোরগের পোলাও পাকানোর সংস্থান তার হয়নি। তার শিরনী দেখেই গর্জে উঠলেন মাতবর সাহেব। বললেন– আসলে এটা চালাকী। খতিব সাহেবকে কল্লা কলজে না দেয়ার

বইঘর ও বিএবিডি

ফন্দি। নইলে বছরের এই একদিন একটা মোরগ জোটেনি তার? রেখে দে, ঐ খিচুরি পৃথক করে একপাশে রেখে দে।

খতিব সাহেবের প্রতি মাতবরের এই দরদের কারণ, কল্লা কলজে সবগুলোই খতিব সাহেব বেঁধে নিয়ে যান না। অর্ধেকটাই পাঠিয়ে দেন মাতবরের বাড়িতে।

সে যাই হোক, শিরনী বিতরণ ও শিরনী খাওয়ার সময় বরাবরের মতো শুরু হলো প্রত্যেকের বাড়ির শিরনীর গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ এসব নিয়ে টিকা টিপ্পনী। এরই মাঝে কে একজন বললেন– আরে সবারই কি পাকের হাত সমান? মশলা পাতি তেলজল প্রচুর থাকলেই কি পাক ভাল হয়? সেজন্যে চাই পাকের হাতযশ। ঐ যে কথায় বলে–

'পাখির মধ্যে খঞ্জন, মাছের মধ্যে রন্ধন,
কাপড়ের মধ্যে সাদা, নারীর মধ্যে রাধা।'

আসল কথা হচ্ছে পাকানীর উস্তাদী।

www.boighar.com

মাতবরের বাড়ির পোলাও অর্থাৎ শিরনী এলো এতক্ষণে। তা দেখেই মাতবর সাহেব হাঁক দিয়ে বললেন– আরে, এই ময়ান, এবার আমার বাড়ির পোলাওটা বিতরণ করো দেখি। সবার বাড়ির পোলাও সকলে খেলো। এবার আমার বাড়ির পোলাও খেয়ে দেখুক, রান্না কাকে বলে আর তোমার চাচীর কেমন উস্তাদি হাত।

মাতবরের বাড়ির পোলাও একটু একটু করে সবার পাতে দেয়া হলো। সে পোলাও যে মুখে দিলো সঙ্গে সঙ্গে তারই মুখ বিকৃত হয়ে গেল। চাউলটা ঠিক মতো ফুটেনি। একদিকে গলে গেছে আর একদিকে চাউল আছে আস্ত। এটাতো মামুলী ব্যাপার। সবচেয়ে বড় কথা, লবণ দেয়নি আদৌ। তেল খানিকটা ঢাললেও ঝালটা আবার এতটা বেশিই ঢেলেছে যে, ঐ লবণহীন ঝালের পিণ্ড মুখে দেয়ার সাথে সাথে আগুন ধরে গেল সবার মুখে। কিন্তু মাতবর সাহেব নারাজ হবেন ভেবে কেউ কোন আওয়াজ না দিয়ে নীরবে চাপতে লাগলো ঝালের ঝাঁঝ। এরই মধ্যে মাতবর সাহেব আওয়াজ দিয়ে বললেন– কেমন লাগছে হে, আমার বাড়ির পোলাও? তোমার চাচীর পাকের হাতটা কেমন, তা বলো?

মুখের ঝাল কোৎ করে গিলে কয়েকজন অতিকষ্টে আওয়াজ দিলো– চমৎকার মাতবর সাহেব, চমৎকার।

তইবর আলী নেচে উঠে আওয়াজ দিলো– আর কারোই সাধ্যি নেই চাচীর মতো এত চমৎকার রাঁধে। সাবাশ চাচী, সাবাশ!

বলেই সে গোপনে আবার হা হু করতে লাগলো। মুখে দিয়ে মাতবর সাহেবও বুঝলেন এটি একদম অখাদ্য। তবু সবার সামনে খাটো হওয়ার পাত্র নন তিনি। জোর গলায় বললেন– দেখতে হবে তো, কার বাড়ির পাক!

ফের তইবর আলী সমর্থন দিয়ে বললো– বললামই তো চাচা, চাচীর মতো পাকের হাত এ গাঁয়ে আর আছে কার?

কালু পাগলা আধ পাগলা ছেলে। কিন্তু বড়ই মুখ ভাঙ্গা। চাচীর পোলাও মুখে দিয়েই সে ওয়াক থুঃ বলে মুখ থেকে ফেলে দিলো মাটিতে। সশব্দে বললো– এক্কেবারে অখাদ্য। এড্যা মানুষ খায়?

শুনেই চোখ গরম করলেন মাতবর। তইবর আলী প্রতিবাদ করে বললো– কি বললেন? মানুষে খায় না? কুকুরে ঘিয়ের মর্ম বুঝবে কি?

গাঁয়ের সকলের শিরনী বিতরণ করা শেষ হয়েছিল। একটু একটু করে পাওয়ার ফলে আর সবগুলো ভাল না হওয়ায় এখানে খেয়ে পেট কারো ভরে না। তৃপ্তিও হয় না। বাড়িতে গিয়ে তৃপ্তি করে খেতে হয়। এ বছর প্রায় সকলের পাকই নিম্নমানের হয়েছিল। খেয়ে তাই তৃপ্তি হলো না অনেকের। শেষে এলো তসরীর মায়ের খিচুরি। নাসিকা কুঞ্চিত করে মাতবর সাহেব বললেন– অল্প অল্প, ও অখাদ্য বেশি দিও না আমার পাতে। যে নেয়, তাকে দাও।

তবু একটু করে সবার পাতেই দেয়া হলো। মুখে দিয়েই সকলে তা গোগ্রাসে গিয়ে ফেললো সবটুকু। আরো খানিকটা পাওয়ার আশায় তারা চেয়ে রইলো খাজিনদারের দিকে। কিন্তু ছেলে ছোকরা মিলে মানুষের সংখ্যা অনেক। একটু একটু করে দিলেই ফুরিয়ে যায় সবার শিরনী। এটাও তাই গেল। দ্বিতীয় বার দেয়ার কোন প্রশ্নই উঠলো না।

তইবর আর গোদাই তসরীর মায়ের খিচুরিটা গপাগপ গিলে হাত চাটতে লাগলো। আরো খানিকটা খাওয়ার আশা তীব্র হলো তাদের। 'সাবাশ চাচী, সাবাশ' বলে জোর আওয়াজ দিলেও, চাচীর পোলাও সবটুকুই পড়ে রইলো পাতে। ক্ষুধায় আর অতৃপ্তিতে তারা উসখুস করতে লাগলো।

তেল মশলার দাপট তার না থাকলেও, তসরীর মা ঝাল-লবণ আদা-রসুন পেঁয়াজ সব কিছুই ঠিকমতো দিয়েছে আর চাউলটাও ঠিকমতো ফুটিয়েছে। এতে করে খিচুরিটা বেশ মুখরোচক হয়েছে।

এদিকে তইবর আলী তার বাড়ির পোলাও খেয়ে মোটেই তৃপ্ত হতে পারেনি। অনেকটা ঐ 'সাবাশ চাচী, সাবাশ'-এর মতো অখাদ্য হয়েছে তার বাড়ির শিরনীও। বাড়িতে গিয়ে ও পদার্থ খাওয়ার আগ্রহ তার এক বিন্দুও ছিল না। তার মন পড়ে রইলো তসরীর মায়ের খিচুরির পেছনে।

মাতবরের মুখেও লেগে রইলো সে স্বাদ। বাড়িতে এসে মাতবর সাহেব গৃহিণীকে আচ্ছামতো ঠ্যাংগালেন এবং মুখে বললেন– তসরীর মায়ের পা-ধোয়া পানি খেয়ে এসো গে যাও...

নানা কারণে গৃহিণীকে ঠ্যাংগানোর সাহস তইবর আলীর ছিল না। সে ভাবতে লাগলো, বাড়িতে ফেরার পথেই তসরীর মায়ের বাড়ি। তসরীর মায়ের নিকট থেকে কিছু খিচুরি চেয়ে নেবে সে।

চিন্তা মতোই কাজ। তইবর আলী তসরীর মায়ের বাড়িতে এসে দেখলো, বাড়িতে কেউ নেই। তসরীর মায়ের নড়বড়ে ঘরের দুয়ার ঝাপ দিয়ে বন্ধ করা। বাড়িতে কেউ নেই দেখে ফিরে যাওয়ার বদলে তইবরের বদবুদ্ধি চাঙ্গা হয়ে উঠলো। হাঁড়িতে যদি খিচুরি কিছু থেকে থাকে, তাহলে এই ফাঁকে সে সবটুকুই সাবাড় করে যাবে- এই মতলব আঁটলো।

ঝাপ খুলে ঘরে ঢুকলো তইবর। দেখলো সামনেই খিচুরির হাঁড়ি শিকেয় ঝুলছে। মাটির হাড়ি। হাড়ির গাঁয়ে খিচুরি কিছু লেগেই আছে। ঝাপ ঠেলে কুকুর ঢুকতে পারে ভয়ে এই ব্যবস্থা। তইবর আলী হাড়িটা কাত করে ঢাকনা খুলে দেখলো বেশ কিছুটা খিচুরি হাঁড়ির তলায় তখনও অবশিষ্ট আছে। এদিক ওদিক চেয়ে সে হাত ঢুকালো হাঁড়ির মধ্যে এবং হাপুড় হুপুড় গিলতে লাগলো খিচরি।

ঠিক এই সময় ফিরে এলো তসরীর মা। ঝাঁপ খোলা দেখেই সে চোর চোর বলে চিৎকার দিয়ে উঠলো। চমকে উঠে তইবর আলী হাঁড়ি থেকে তাড়াতাড়ি হাত বের করতেই বিপুল বেগে দুলে উঠলো শিকেটা আর কিভাবে যেন মাটিতে হাড়িটা উল্টে এসে তইবর আলীর মাথার উপর পড়লো। পড়বি তো পড়... । সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে গেল হাঁড়ির তলা আর তইবর আলীর মাথাটা ঢুকে গেল হাড়ির মধ্যে। তসরীর মায়ের চিৎকারে সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক ছুটে গেল। আতংকের মধ্যে চেষ্টা করেও তইবর হাঁড়ি থেকে মাথাটা বের করতে পারলো না। মাথাটা হাঁড়ির মধ্যে এমনভাবে আটকে গিয়েছিল যে, হাঁড়িটা গোটাই ভেঙ্গে না ফেললে মাথাটা বের করা সহজ সাধ্য ছিল না। 'ধর ধর' রবে লোকজন এসে ধরে ফেললো তইবরকে। বাইরে টেনে এনে ভেঙ্গে ফেললো হাঁড়ি আর বেরিয়ে এলো মাথাটা। কাছের একজন তইবরকে চিনতে পেরেই বলে উঠলো– ছিঃ ছিঃ! শেষ মেষ তসরীর মায়ের খিচুরিটা চুরি করে খাচ্ছিস! খাবি তো তোর চাচীর শিরনী খা। এত বাহাদুরী দিলি!

তইবরের গা মাথা চোখ মুখ তখন খিচুরিতে এমনভাবে লেপটে গেছে যে আর চেনাই যায় না তাকে। কে একজন বলে উঠলো– কে রে, চোরটা কে?

কালু পাগলা নিকটেই ছিল। জবাবে সে বললো– চিনলে না? ঐ যে শিরনী খাওয়ার সময় 'সাবাশ চাচী, সাবাশ' বলে ফাল পাড়লো যে লোক, এটা সেই তইবর। চাচীর সেই সাবাশী খানা ফেলে গরীবের খিচুরি খেতে এসেছে চুরি করে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! বেহুদা আর বলে কাকে?

তইবরকে চিনতে পেরে তখন সবার সে কি হাসি!

কাহিনী শেষ করতেই জামান সাহেব দেখলেন তার স্ত্রী-কন্যা-পুত্রেরা হাসিতে লুটোপুটি খাচ্ছেন। তাদের উদ্দেশ্যে করে জামান সাহেব এবার বললেন– এই হলো আমার হাসির কারণ। তারপর বললেন, আমাদের ছেলেবেলার সেই ঈদের খাওয়া আর আজকের তোমাদের এই খাওয়ার বায়না! 'সাবাশ চাচী, সাবাশ!' –বলেই ফের হেসে ফেললেন নূরুজ্জামান সাহেব।

ভ্রান্তি

গৈ-গাঁয়ের এক চায়ের দোকানের সামনে বাঁশের মাচার উপর চুপচাপ বসেছিল আজহার উদ্দীন। দেখতে পেয়েই আজহার উদ্দীনের এককালের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবুল হোসেন আওয়াজ দিয়ে ছুটে এসে তার পাশে বসতে বসতে বললো– আরে দোস্ত, কি ব্যাপার, কি ব্যাপার! তুমি হঠাৎ এখানে? সেই যে কতদিন আগে গাঁয়ে একবার এসেছিলে তার পরে আর খবর নেই। আজ হঠাৎ কোত্থেকে?

জবাবে আজহার উদ্দীন ম্রিয়মাণ কণ্ঠে বললো– এসেছিলাম এখানকার বানভাসিদের রিলিফ দেয়ার কাজে। কাজ শেষ হয়ে গেলো তাই ভাবলাম– গাঁ থেকে একবার একটু ঘুরেই আসি।

আবুল হোসেন ফের সরবে বললো– বহুৎ খুব, বহুৎ খুব। হয় পা'লে, না হয় পরবে। অমনি অমনি তো কারো আসা হয় না কোথাও।

–বলেই সে চায়ের দোকানদার তরুণ কেরামতুল্লাহর দিকে চেয়ে বজ্রকণ্ঠে হুকুম ছাঁড়লো– এই কেরমত্যা, দুই কাপ ফার্স্টক্লাশ চা লাগাতো জলদি। সাথে দুই প্লেট বিস্কিট। চা কিন্তু এক নম্বর হওয়া চাই। দুই নম্বর হলে তোর চা-কাপ দুটোই চলে যাবে ঐ ভাগাড়ে, খেয়াল রাখিস।

কেরামতুল্লাহ স্বাচ্ছন্দকণ্ঠে বললো– জি আচ্ছা। তা উনি কে ভাইজান।

আজহার উদ্দীনের দিকে ইংগিত করলো। জবাবে আবুল হোসেন বললো– মস্তবড় মানুষ, মস্তবড় মানুষ। দুই হাতের বেড়ে ধরতে পারবিনে তুই, এমনই বড় মানুষ।

: তাই? তা ঐ বড় মানুষটা এমন মনমরা ক্যান, ভাইজান?

এ্যাঁ, মনমরা? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইতো। তা কি ব্যাপার দোস্ত? তোমাকে এমন নির্জীব দেখাচ্ছে কেন?

আজহার উদ্দীন উদাসকণ্ঠে বললো– নির্জীব দেখাচ্ছে? কই, আমি তো ঠিকই আছি।

আবুল হোসেন বললো– না, একদম ঠিক নেই। আমি সমানে চিৎকার করে যাচ্ছি আর তুমি দায়সারা গোছের দুই একটা কথা বলছো মাত্র। কি ঘটনা? এমন হাসিখুশি মানুষ তুমি, মনে কোন চোট লেগেছে নাকি আবার? মানে এখানে এসে?

আজহার উদ্দীন নিঃশ্বাস ফেলে বললো– তা যদি বলো, তা হলে ঠিক তাই। একটা বড় ধরনের চোট লেগেছে ফের মনে।

আবুল হোসেন লাফিয়ে উঠে বললো– সাব্বাশ! ঠিক ধরেছি তা হলে। চোটটা লাগলো কি ভাবে, এবার বলো দেখি!

: বললেই তুমি তা বুঝবে কি করে? সে অনুভূতি কি আছে তোমার?

: নেই?

: না। তুমি কি প্রেমে পড়েছো কখনো?

উপেক্ষার হাসি হেসে আবুল হোসেন বললো– আরে ছোঃ ছোঃ। ঐসব ফালতু কাজে কোন জ্ঞানী মানুষ যায়? প্রেমে পড়লেই তো তোমার মতো ব্যর্থ প্রেমিক হয়ে বুক চাপড়িয়ে বেড়ানো। তার চেয়ে আমি বেশ আছি।

: তবু আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি সুখী।

: বেশি সুখী? ভালবেসে ঐ কচুপোড়া খাওয়ার পরেও?

: জি, তার পরেও। কারণ 'ইট ইজ বেটার টু হ্যাভ লাভড এ্যান্ড লষ্ট, দ্যান নেভার টু হ্যাভ লাভড এ্যাট অল।' তোমার মতো যারা জীবনেও প্রেমে পড়েনি, তাদের জীবন তো একেবারেই বৈচিত্র্যহীন, আটপৌরে। ভালবেসে হারালেও সে স্মৃতিটা আমার কাছে তোমাদের এই আটপৌরে জীবনের চেয়ে অনেক বেশি সুখের।

: বটে। তা সে স্মৃতিটা বুঝি উথলে উঠেছে আজ আবার।

একজ্যাকটলি। ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করতে গিয়ে আমার সেই পুরানো ক্ষততে হাত পড়েছে হঠাৎ করেই। দায়টা কাঁধে থাকার কারণে সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা পার্টিগুলি প্রত্যন্ত অঞ্চলে গেলেও অঞ্চলগুলি এতই ব্যাপক যে, সব জায়গায় যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কিছু জায়গা থেকেই যায় 'আন লুকড ফর' অর্থাৎ নজর দেয়ার বাইরে। প্রাইভেট পার্টিগুলোর বেশির ভাগই তো নাম কেনা পার্টি। প্রচার সর্বস্ব রিলিফ পার্টি। রিলিফ বিতরণের চেয়ে অনেকেই তারা ছবি তোলে বেশি। ছবি তোলাও শেষ, রিলিফ বিতরণও শেষ। সামনের কিছু এলাকাতে এসে হৈ চৈ করে রিলিফ বিতরণ করে যায়, প্রত্যন্ত এলাকায় এরা বড় একটা যায় না। এতে করে গ্রামগঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন নিম্ন ভূমির মধ্যে যারা বসত করে আছে অর্থাৎ বন্যায় যারা সর্বাধিক আক্রান্ত, সেই প্রত্যন্ত এলাকায় রিলিফ তেমন পৌঁছে না। আমরা কিছু লোক নিজেদের উদ্যোগে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করতে এসেছিলাম এমনই একটি প্রত্যন্ত এলাকায়। এক জায়গায় এক বাঁধের উপর অবস্থানকারী কিছু বানভাসীদের মধ্যে চালের পোঁটলা বিতরণ করতে গিয়ে আমার সেই পুরনো ক্ষততে আবার হাত পড়লো অকস্মাৎ।

: কি রকম, কি রকম?

: সেখানে সকলে আগ্রহভরে চালের পোঁটলা গ্রহণ করলো। জুবাইর নামের একজন অসুস্থ যুবক অত্যন্ত অনীহার সাথে আমার বাড়িয়ে ধরা পোঁটলাটি গ্রহণ করতে করতে হু-হু করে কেঁদে উঠলো এবং বললো– 'হায়রে হায়! সেই চাল এলোই যদি, পনেরটা দিন আগে কেন এলো না!'

: আচ্ছা!

আমি তার কথার অর্থ জানতে চাইলে সে জানালো, জুবাইদা নামের এক সুন্দরী মেয়েকে সে ভালবেসে বিয়ে করেছিল বছর দেড়েক আগে। বাঁধ থেকে বহুদূরে দুই তিন ঘর লোকের একটা বসতির দিকে আঙ্গুল তুলে সে বললো, ঐ বসতিতে সে বাস করতো বউ নিয়ে। সাকুল্যে তারা দুইজন ছাড়া সংসারে তাদের আর কেউ ছিল না। হঠাৎ এই ভয়ংকর বন্যা আসায় তাদের ঐ বসতির অন্যান্য সবাই অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু জুবাইর মিয়ার যাওয়ার কোন স্থান না থাকায় ঐ বাড়িতেই থেকে যায় বাধ্য হয়ে। আশা ছিল, শিগগিরই কমে যাবে বন্যা। কিন্তু কমে না, বাড়তেই থাকে দিন দিন। ফলে অচিরেই ফুরিয়ে যায় খাদ্যসামগ্রী। শুরু হয় লতাপাতা সেদ্ধ করে খাওয়া। এই অবস্থায় ক'টা দিন যেতেই মারাত্মক অসুখে পড়ে উত্থান শক্তি হারিয়ে ফেলে জুবাইর। সাঁতারে অপটু বউ অথৈ পানি সাঁতরিয়ে কোথাও যেতে পারে না লতাপাতা ঘাস বা অন্য কিছু আনতে। ফলে অসুস্থ স্বামী আর তার চলতে থাকে টানা উপোস। তারা অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকে কোন রিলিফ পার্টির নৌকা আসার উপেক্ষায়। কিন্তু কোন রিলিফ পার্টি আসে না।

: তারপর?

আসে দুশমনের নৌকা। কাবের বেপারী নামের ঐ এলাকার এক ধনাঢ্য ব্যক্তির নজর ছিল সুন্দরী জুবাইদা খাতুনের উপর। ঘরে দুই দুইটি বউ থাকা সত্ত্বেও জুবাইদাকে শাদি করার বড়ই খাহেশ হয় বেপারীর। কিন্তু জুবাইর এই পিতামাতাহীন জুবাইদাকে শাদি করার ফলে ক্রোধে ফুঁশে উঠে ব্যাপারী। সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এই সর্বগ্রাসী বন্যাই সে সুযোগ এনে দেয় তাকে। এক কর্মচারীকে শিখিয়ে পড়িয়ে বেপারী তাকে নৌকাসহ পাঠিয়ে দেয় জুবাইর ও জুবাইদাকে নিয়ে আসতে। কর্মচারীটি এসে জুবাইর মিয়াকে বুঝায় যে, জুবাইর মিয়ার এই দূরবস্থার কথা শুনে বড়ই ব্যথিত আছেন বেপারী সাহেব। স্ত্রীসহ এখনই তাকে বেপারীর বাড়িতে যেতে হবে। তাদের স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন বেপারী। সুস্থ হয়ে উঠলে বেপারী সাহেব তাদের দু'জনকে কাজও দেবেন তাঁর চাউলের মিলে।

: সে কি! তারপর?

স্বামীর মুখে এ কথা শুনে চমকে উঠে জুবাইদা। বলে– 'না না, আমি কিছুতেই ঐ বেপারীর বাড়িতে যাবো না। মরি, এখানেই না খেয়ে মরবো, তবু ঐ চরিত্রহীন বেপারীর হাতে ধরা দেবো না আমি। হঠাৎ বেপারীর এই দরদ মানেই এর পেছনে তার দূরভিসন্ধি আছে।'

কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় দিশেহারা জুবাইর মিয়া স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত না করে বেপারীর ঐ নৌকায় চড়তে স্ত্রীকে বাধ্য করে। পুনঃ পুনঃ আপত্তি করার পরও স্বামীর এই জিদ দেখে জুবাইদা কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে বেপারীর নৌকায় চড়ে এবং স্বামীকে কসম দিয়ে বলে– 'তুমি আমাকে বেপারীর কাছে বিক্রি করে দিচ্ছো নাতো?'

বইঘর ও বিএবিডি
জুবাইরও কসম খেয়ে বলে– 'আল্লাহর কসম" এমন দুর্গতি আমার কখনো যেন না হয়।'

আবুল হোসেন ফের রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলো– তারপর তারপর?

আজহার উদ্দীন ব্যথিতকণ্ঠে বললো– তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। বাড়িতে এনেই চিকিৎসা করার কথা বলে কাবের বেপারী জুবাইরকে তখনই উপজেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। এ খবর জুবাইদাকে জানতে দেয়া হয় না। জুবাইরকে পাঠিয়ে দিয়ে ঐ রাতেই পৃথক ঘরে তুলে জুবাইদাকে সারারাত ধর্ষণ করে কাবের বেপারী এবং জুবাইদাকে অর্ধমৃত অবস্থায় ঘরে ফেলে রেখে বেরিয়ে যায়। পরের দিন সকালে ব্যস্ত হয়ে স্বামীর খোঁজ করলে জুবাইদাকে জানানো হয়, বেপারীর কাছে তাকে বিক্রি করে দিয়ে পালিয়ে গেছে তার স্বামী জুবাইর মিয়া। স্বামীর এই বেঈমানীর জন্যে বেপারী বাড়ির এক কাজের মেয়ের কাছে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে হঠাৎ করে হারিয়ে যায় জুবাইদা খাতুন। পরের দিন জুবাইদার মৃতদেহ ভেসে উঠে বেপারী বাড়ির ঘাটের পাশেই।

আবুল হোসেন ফের স্তম্ভিত কণ্ঠে বললো– কি করুণ, কি করুণ এই ব্যাপার? তা জুবাইর মিয়া আর কি বললো এরপর?

আজহার উদ্দীন বললো– জুবাইর মিয়া এরপরে খুব বেশি কিছু বললো না। সেরেফ বললো– 'এ দুঃখ আমি আস্তে আস্তে ভুলতে পারবো স্যার। কিন্তু আমি বেঈমানী করিনি, জুবাইদা এ সত্যটি জেনে যেতে পারলো না। আমি যে একজন ডাঁহা বেঈমান এই মিথ্যাটাই জেনে গেল সে। এ দুঃখ আমি জীবনেও ভুলতে পারবো না স্যার, জীবনেও না।...'

আবুল হোসেন এবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। পরে সে মাথা তুলে বললো– সেটাই স্বাভাবিক। যা সত্য নয় তাই সত্য বলে জেনে গেছে জুবাইর মিয়ার বউ। এজন্যে তার মনে চিরদিন দুঃখ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার ঘটনাটা তো এ রকম নয় দোস্ত। তোমারটা শুধু 'লাভড্ অ্যান্ড লস্ট।' এমনটি অনেকেরই হয়। ভালবেসে তাকে পায় না। প্রায় সবাই তা ভুলেও যায় দিনে দিনে। এজন্যে তোমার মনে চিরদিনই দুঃখ, মানে ক্ষত থাকার কারণ তো দেখি নে বড় একটা।

ক্লিষ্ট হাসি হেসে আজহার উদ্দীন বললো– আমার ব্যাপারটাও যে ঐ একই রকম দোস্ত। হুসনে আরার সাথে আমার চিঠি চালাচালির ঘটনা তো শুনেছো? ঐসব চিঠিতে দু'জনই আমরা প্রতিজ্ঞা করি কেউ আমরা বেঈমানী করবো না। পরস্পরকে ছাড়া অন্য কাউকে শাদি করবো না কেউ আমরা।

আবুল হোসেন ফের প্রশ্ন করলো– তারপর?

আজহার উদ্দীন বললো– একদিন আমার লেখা একটি চিঠি হুসনে আরার অসতর্কতার দরুন এমন একটা প্রতিপত্তিশালী ঠগের হাতে পড়ে– হুসনে আরার উপর যার বদনজর ছিল অনেক দিন থেকেই। চিঠি পড়ে আমার সাথে হুসনে আরার গভীর প্রেমের ব্যাপারটা বুঝতে পারে সে। ফলে মনে তার জ্বলে উঠে প্রতিহিংসার

আগুন। হুসনে আরার সাথে আমার সম্পর্ক ছুটিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তার বাপ চাচা ও আত্মীয়-স্বজনকে উস্কানি দিয়ে আমার উপর তাদের প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত করে তোলে সে।

: আচ্ছা!

: এদিকে আমাকে সে ডেকে বলে, 'হুসনে আরা তোমাকে কোন চিঠি লিখে থাকলে সেগুলো দাও, ঐ চিঠিগুলো হুসনে আরার বাপ চাচাদের দেখিয়ে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা হয়েছে মর্মে তাদের রাজি করাবো এবং হুসনে আরার সাথে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবো।' সরল মনেই আমি হুসনে আরার লেখা সব চিঠি পোঁটলা করে এনে ঐ ঠগের হাতে দেই। চিঠিগুলো পেয়েই সে গুলো নিয়ে গিয়ে হুসনে আরার বাপ-চাচার হাতে দেয় এবং তাদের উস্কানি দিয়ে বলে, 'মেয়েকে তোমার নষ্ট করেছে ঐ বদমায়েশ আজহার উদ্দীন। এই নাও তার প্রমাণ। শয়তানটাকে ডেকে এনে রীতিমতো ধোলাই দাও এখনই।'

: বলো কি!

: সেই মোতাবেক হুসনে আরার সাথে আমার শাদির কথাবার্তা হবে এই ভাওতা দিয়ে আমাকে লোক মারফত ডেকে এনে পাশের এক স্কুল ঘরে তোলা হয়। কিন্তু ঘরে ঢুকেই আমি বুঝতে পারি ঘটনা অন্যরকম। আমাকে খুন জখম করার জন্যেই এই ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। আমি তখন কলেজের ছাত্র। নব্য যুবক। কেউ কিছু বোঝার আগেই আমি সবলে দুয়ার খুলে ক্ষিপ্র বেগে পালিয়ে যাই সেখান থেকে।

: তারপর?

: তারপর ঐ চিঠির পোঁটলাটা নিয়ে গিয়ে হুসনে আরার সামনে ফেলে দিয়ে তাকে বোঝানো হয়, আমি একজন মস্ত বড় প্রতারক। হুসনে আরাকে আমি ভালবাসিনি কখনো। তাকে নিয়ে আমি প্রেম প্রেম খেলা খেলেছি মাত্র। আমি ভালবাসি অন্য এক মেয়েকে এবং সেই মেয়েকেই শাদি করবো আমি এটা আগে থেকেই চূড়ান্ত হয়ে আছে। আমার খেলা শেষ হয়ে যাওয়ায়, হুসনে আরা আর আমার মধ্যে চিঠি চালাচালির কথাটা আমি স্বেচ্ছায় আর সহাস্যে সবার কাছে ফাঁশ করে দিয়েছি আর হুসনে আরার চিঠিগুলোও স্বেচ্ছায় আর হাসতে হাসতে আমি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি।

: তাজ্জব! বলো কি! এই ব্যাপার?

: হ্যাঁ। কথাগুলো এমনইভাবে হুসনে আরাকে বোঝানো হলো যে, সে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করলো, আমি একজন জঘন্য প্রতারক ও ঘোর বেঈমান। এ কারণেই তার যখন শিগগিরই বিয়ের প্রস্তাব এলো অন্য বরের সাথে, হুসনে আর নির্দ্বিধায় তাকে কবুল করে নিলো আমাকে এক ঘোর বেঈমান মনে করে।

: স্যাড স্যাড, ভেরি স্যাড। তা পরে তুমি তাকে এই ষড়যন্ত্রের কথা খুলে বলেছো নিশ্চয়ই।

: না, সে সুযোগ আমি পাইনি। আর এটা যে একটা ষড়যন্ত্র এ কথা হুসনে আরাকে কেউ বুঝতেও দেয়নি। অনেকদিন পরে ঘটনাচক্রে হঠাৎ আমি তার সামনে পড়তেই সে দুই চোখে দাউ দাউ আগুন বর্ষণ করে যেভাবে ছিটকে সরে গেল আমার সামনে থেকে তাতে আমি একশোভাগ নিশ্চিত যে, হুসনে আরা আজও আমাকে একজন ঘোর বেঈমানই মনে করে আছে। আসল ঘটনা আজও সে জানে না।

: আজহার উদ্দীন।

কাজেই আমার কেসটাও সেরেফ, 'লাভড অ্যান্ড লস্ট' নয় আবুল হোসেন। সত্যটা কোন দিন জানতে পারলো না হুসনে আরা। তাই ঐ জুবাইর মিয়ার মতোই এ দুঃখ আজও আমার মনে খচখচ করে ফুটে।

এরপর আবুল হোসেন আর কোন প্রশ্ন খুঁজে পায়নি।

এক যে ছিল ছোট্যাকানা

আদি নামটা ছোট্যা (ছুইটা) নয়। পিতৃদত্ত নাম তার ছোটু মিয়া। একটা চোখ কানা। ভূমিষ্ঠ হওয়ার কালেই এই অনিষ্টটা ঘটে। কানাকে কানা আর খোঁড়াকে খোঁড়া বলার এন্তার মানা-নিষেধ নানা শাস্ত্রে আছে। কিন্তু তা থাকলে কি হয়, যতদূর জানা যায়, এই মানা না মানার লোকই এ দেশে বেশি। এমন লোকও আছে, দানা পানির অভাবে নিজের জান ফানা ফানা যদিও তবু কানাকে কানা তারা বলবেই। শিক্ষার অভাবটাই বড় নয় এখানে। জন্মগত স্বভাবটাই বড়। শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনবান-ধনহীন সর্বস্তরেই অনেকের এ স্বভাব সমাধিক পুষ্ট। ফলে, দুষ্টজনের কটু ভাষ্যে ছোটু হলো ছোট্যা (ছুইটা) আর স্বভাবদুষ্ট জনগণের নিরলস তৎপরতায় নামটার পাশ থেকে উঠে গেল 'মিয়া' শব্দ শূন্যস্থানে সেঁটে বসলো 'কানা'। আদি নামটা অক্কা পেলো আঁতুড়ঘরেই। ছোটুমিয়া একডাকে ছোট্যা (ছইটা) কানা হয়ে সবার মাঝে স্বচ্ছভাবে বিরাজ করতে লাগলো। ছোটু বললে ছোট্যাকে আজ কেউ আর চেনে না।

কানা হলেও ছোট্যা (ছইটা) মিয়া ফূর্তিবাজ মানুষ। সংসারটা টানা পোড়েনের অল্প একটু উপরে। চাষ বাসটা ঠিক রাখলে খানার অভাব কোন মাসেই হয় না। বিত্তের বাজারে ডানা মেলার খাহেশ লেশমাত্রও ছোট্যাকানার নেই। 'খায় দায় গান গায় তাইরে নাইরে না'– এই দিকটাই অধিকতর পছন্দ তার। তাই ফূর্তিবাজ ছোট্যামিয়া যৎ সামান্য কৃষিকাজে আর সাজ সাজ রবে অনন্ত বাজে কাজে দিন কাটায়।

যদিও কানা, তবু একজন মোটামুটি দানাদার মানুষ সে। তার মধ্যে আছে এক অদ্ভূত আকর্ষণী শক্তি আর লিডারশিপ কোয়ালিটি। এ কারণে তাকে ঘিরে এ গাঁয়ে গড়ে উঠেছে এক মস্তবড় অপোগণ্ড সংঘ। বাপে তাড়ানো মেয়ে খেদানো গুনাহগারের দল ঘর করেছে পর আর আপন করে নিয়েছে ছোট্যা মিয়ার প্রশস্ত আঙ্গিনা আর সংকীর্ণ বসার ঘর। ওইর‍্যা, মর‍্যা, মাখনা, কছির, মজুর দল অন্নের জন্যে প্রহর খানেক বাধ্য থাকে জন্মদাত্রীর। মান্যগণ্যও করে তাকে। অন্ন প্রাপ্তি সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে আবার যে বেয়াড়া সেই বেয়াড়া। ছন্নছাড়া চাঁদমনিরা অতঃপর হন্যে হয়ে ছুটে আসে ছোট্যাকানার আকর্ষণে। ছোট্যাকে তারা নেতার মতো মানে। নেতার উপর কথা বলার পরিবারে কেউ না থাকায় নেতার বাড়ি মাথায় তুলে নিয়ে তারা ধুমছে বিরাজ করে সেখানে। নেতার সাথে গল্প করে, হুঁকো টানে, তাস পিটে, কেচ্ছা গায়, লাঠি খেলে আর দল বেঁধে মেলা দেখে বেড়ায়। অন্য কথায় আঠার মতো সেঁটে থাকে ছোট্যা কানার পিছনে।

বইঘর ও বিএবিডি
ছোট্যাকানার সান্নিধ্যে একমাত্র এই উড়ন চণ্ডিরাই আসে না, আসে গাঁয়ের খেটে খাওয়া অগণিত না উন্মিদ নাচারেরাও। ইহকাল পরকাল আর ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার যাদের অবকাশ নেই, আয় উন্নতি সুখ শান্তি আর আরাম আয়েশের আশা কেবলই দূরাশা যাদের কাছে, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে কোনমতে নিজের ও পরিবারের পেটের জ্বালা মেটানোর জন্যেই জন্ম– এই যাদের ধ্যান-ধারণা, তারাও ক্ষণিকের আনন্দ আশায় ছুটে ছুটে আসে ছোট্যা মিয়ার দরবারে। ছোট্যা মিয়াদের পাশে বসে কেচ্ছা শোনে, তালি বাজায়, মাথা দোলায়, বিড়ি টানে এবং রাত্রির বয়সটা চড়তি হয়ে উঠলে ফের টলতে টলতে পথ ধরে ভাঙ্গাচুরা গৃহাঙ্গণের।

এতে করে দুইভাগে ভাগ হয়েছে গাঁয়ের মুসলমান বাসিন্দারা। যাঁরা ইহকাল ও পরকাল নিয়ে ভাবেন, ভূত-ভবিষ্যৎ ও দেশ দুনিয়া নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন, আয় উন্নতি জ্ঞাতি গোত্র ও সমাজ জামাত নিয়ে মাথা ঘামান যারা– সেই সব আলেম পণ্ডিত মুরুব্বী মাতবর একদিকে, আর এক দিকে কর্মবিমুখ বখাটে আর খেটে খাওয়া বদ নসীবের দল। বলা বাহুল্য, এই শেষের ভাগটা প্রথমভাগের চেয়ে পঞ্চগুণে বড়।

এই সংখ্যা লঘিষ্ঠ মুরব্বী মাতবর ও আলেম পণ্ডিতেরা আর এক বাড়তি ভাবনায় পড়েছেন এই বিপুল আকার সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিয়ে। এই বেহুঁশ বেয়াড়ারা পরকালের কথা ভাবে না, সামাজিক শৃঙ্খলা মানে না, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও নামাজ রোজার ধারে কাছে ভিড়ে না। কিভাবে এই বেহুঁশদের হুঁশে আনা যায়, এইটেই মুরুব্বীদের বাড়তি ভাবনা এখন। সমাজের শৃঙ্খলা বিধানের প্রয়োজনেও বটে আর দীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার নৈতিক দায়িত্বের জন্যেও বটে। আলেম-পণ্ডিত প্রধান মুরুব্বী এক্ষণে খুবই তৎপর হয়ে উঠেছেন।

বরাবরের মতো সেদিনও সন্ধ্যার পর ছোট্যা কানার গৃহাঙ্গণ সরগরম হয়ে উঠেছে। ছোট্যা মিয়ার চেলারা আর খেটে খাওয়া মানুষেরা অনেকেই এসে জুটে গেছে। এই সময় কয়েকজন মাতবর ও আলেম পণ্ডিত এসে হাজির হলেন সেখানে। তাদের দেখে হাজেরান মজলিস কুল্লে হতবাক। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো আগন্তুকদের দিকে। কোন রকম ভূমিকায় না গিয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে গাঁয়ের বড় মাতবর বললেন– চেয়ে চেয়ে দেখছো কি? আমরা তোমাদের রঙ্গ দেখতে আসিনি। আমরা জানতে এসেছি, তোমরা আসলেই মুসলমান, না হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান? তোমাদের সত্যিকারের জাতি ধর্ম কি, এইটেই আমরা জানতে চাই।

জবাবে ছোট্যামিয়া সবিস্ময়ে বললো– সে কি চাচা, এ কথার মানে? আমরা মুসলমান, দস্তুরমতো মুসলমান। হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান হবো কেন? আমাদের বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষ মুসলমান।

মাতবর এবার কিছুটা রুষ্টকণ্ঠে বললেন– বাপদাদা চৌদ্দ পুরুষ মুসলমান হলেই নিজে মুসলমান হওয়া যায়? আর কিছু কি করার প্রয়োজন হয় না?

: আর কিছু কি চাচা?

বইঘর ও বিএবিডি

তার আগে বলো, এমন বেশরা বেদীনের খাছিয়ত নিয়ে এভাবে মেতে আছো কেন?

: তা মানে, কোনটা কি, তাতো বুঝিনে চাচা। আমাদের ভাল লাগে তাই এসব নিয়ে থাকি।

: ভাল লাগলেই কি সব কিছু করা যায়? ধর্মের নির্দেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে না? ইসলামের নির্দেশ নিষেধ মেনে না চললে তোমরা মুসলমান থাকবে কি করে?

: চাচা।

: এতবড় গলায় নিজেদের মুসলমান মুসলমান করছো, তো নামাজ পড়ো না কেন? বেনামাজী কি কখনো মুসলমান হতে পারে?

না চাচা, নামাজ যে একেবারেই পড়িনে, এ কথা ঠিক নয়। দুই ঈদেই নামাজ পড়ি সবাই আমরা। ঈদগাহ সাজানোর কাজে আমরাই অধিক খাটি। এছাড়া সভা-অনুষ্ঠানে আমরাও সবার সাথে মাঝে মাঝে নামাজ আদায় করি।

: ব্যস, তবে আর কি? ঐটুকুতেই মুসলমান হয়ে গেছো? ওয়াক্তিয়া নামাজ, জুমআর নামাজ এসব আদায় না করেই মুসলমান? এসব যে প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ফরজ এ কথা কি শুনোনি?

ছোট্যাকানা এবার মাথা চুলকিয়ে বললো– তা তো শুনেছি চাচা। কিন্তু করবো করবো করে আদায় আর হয়েই উঠে না।

: উঠে না কেন?

: মানে, কখন কোথায় কিভাবে থাকি আর তো কোন ঠিক ঠিকানা নেই। তাই...

গর্জে উঠলেন মাতবর। বললেন– তবে রে নাদান। এই জবাব দিয়েই আখেরাতে পার পেতে চাও তোমরা? একজন মুসলমান যদি মুসলমানের অবশ্য করণীয় না করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে মাফ করবে ভেবেছো?

ফের মাথা চুলকাতে চুলকাতে ছোট্যাকানা বললো– না চাচা, তা কখনো ভাবিনে। তবে...

ফের তবে? আসল কাজের বেলায় এত তবে কিন্তু কেন? অকাজগুলো তো বেশ চুটিয়েই চালাচ্ছো। যত গড়িমসি কেবল ভাল কাজের বেলায়। পরকালের কথা কি একবারও মনে হয় না তোমাদের?

এবার পথে এলো ছোট্যামিয়া। নত মস্তকে বললো– ভুল হয়ে গেছে চাচা। এমনটি আর কখনো হবে না। এখন তো কাপড় চোপড় সব ঠিক নেই। আগামীকাল থেকেই আমরা নামাজ ধরবো চাচা, নির্ঘাত ধরবো।

ছোট্যামিয়ার চেলারাও সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বললো– জরুর চাচা, জরুর। আগামীকাল থেকেই পাঁচওয়াক্ত নামাজ আদায় করা শুরু করবো আমরা। এ কথার কোন নড়চড় হবে না।

খেটে খাওয়া মানুষদের কেউ কেউ এই সময় বললো– চাচার কথাগুলো তো ষোল আনাই ঠিক। কিন্তু সমস্যাটা হলো আমাদের সময় করা নিয়ে। পেটের ধান্দায় দুইবেলা মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। আমাদের পক্ষে সময় করাটা খুবই কঠিন।

আবার রুষ্ট হলেন মাতবর সাহেব। ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন– কঠিন! দুইবেলা দুই শানকি খাওয়ার সময় পাও, সারারাত ভোঁশ ভোঁশ করে ঘুমানোর সময় পাও, আর নামাজের সময় করাটা তোমাদের কাছে কঠিন? এতটাই অধঃপাতে গেছো তোমরা? চেষ্টা করলে কিনা সম্ভব?

খেটে খাওয়া মানুষেরা জবাব খুঁজে পেলো না। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর অনুচ্চকণ্ঠে বললো– কথাটা ঠিকই, আগামীকাল থেকে নামাজ ধরবো আমরাও।

: আর রোজা?

ওটাও চাচা, ওটাও। খালি পেটে যদিও পরিশ্রম করা কঠিন, তবু রোজা রাখারও চেষ্টা করবো আমরা। চেষ্টা করে দেখবো, পারি কি না।

মাতবর সাহেব উৎসাহ দিয়ে বললেন– পারবে পারবে। প্রথম প্রথম দু'চার দিন কিছুটা অসুবিধা হলেও অভ্যাস হয়ে গেলে দেখবে, আর কোন অসুবিধাই হচ্ছে না।

ছোট্যাকানারা এ কথায় সানন্দে বললো– আল হামদুলিল্লাহ। রোজা ধরবো আমরাও।

: সাব্বাশ! কিন্তু রোজা নামাজ করলে তো এসব রঙ তামাশা চলবে না। যথা সম্ভব এসব খাটো করতে হবে।

: তাও করবো চাচা। দরকার হলে একেবারেই বাদ দিয়ে ফেলবো।

: মারহাবা মারহাবা!

ওয়াদা আশ্বাসের মধ্যে দিয়ে শেষ হলো নসিহত। অতঃপর প্রথম প্রথম দু'চারদিন ওয়াদা রক্ষার তৎপরতা বেশ জোরে শোরেই চললো। কিন্তু তারপরেই যথা পূর্বং তথা পরং। কিছুদিনের মধ্যেই উৎসাহ তাদের ধীরে ধীরে পানসে হয়ে গেল। নামাজ রোজা ছেড়ে দিয়ে পূর্বজীবনে ফিরে এলো ছোট্যাকানার দল আর ঐ খেটে খাওয়া মানুষেরা। পূর্ব আচরণ শুরু করলো আবার। নামাজ রোজার আর ধারে কাছেও গেল না।

পরপর কয়েকবার চেষ্টা করলেন আলেম-মুরুব্বী-মাতবরেরা। কিন্তু ফলাফল ঐ এক। শুরুটা যদিও বা হয়, প্রতিবারেই শুরুটা শেষ হয়ে যায় শুরুতেই। বার বার নসিহত করে বিরক্ত হয়ে গেলন নসিহত দানকারীরা। এ কান দিয়ে শুনে সব কথাই ও কান দিয়ে বের করে দেয় নাদানেরা। হালটা একেবারেই ছেড়ে না দিলেও, এদের আল্লাহর হাতে সঁপে দেয়া ছাড়া নসিহত দানকারীরা আশাব্যঞ্জক আর কোন পথ দেখতে পেলেন না।

২

শুরু হয়েছে দোল উৎসব। গাঁয়ের পশ্চিমপাড়ায় দোলবাড়ি আর দোল উৎসব শুরু হয়েছে সেখানেই। উৎসব চলবে তিন দিন আর মেলা চলবে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে। সেই মোতাবেক থরে থরে দোকান পাট বসেছে। পূর্ব পাড়ার মতো পশ্চিম পাড়াও একটা মস্তবড় পাড়া। যেন লাগালাগি দুই গাঁ। পূর্ব পাড়ার সবাই যেমন মুসলমান, পশ্চিম পাড়ার সবাই তেমনি হিন্দু। সেরেফ হিন্দুই নয়, প্রায় সকলেই জমিদার। বারো শো থেকে পনের শো বিঘে জমির মালিক এক একজন। অল্প কিছু জমি নিজের হাতে রেখে অবশিষ্ট সব জমি কোরফা পত্তন দিয়েছেন তারা। অর্থাৎ মূল জমিদারের প্রজা হয়ে তারা আবার প্রজা পত্তন করেছেন। আদায়কারী ও পেয়াদা পিয়ন রেখে খাজনা আদায় করেন তারা। প্রথামতে তিথি পার্বনে বাজনাও আদায় করেন যথারীতি। পূর্ব পাড়াসহ আশপাশের কয়েক খানা গাঁয়ের লোক এই বাবুদের কোরফা প্রজা। এই বাবুরাই তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বাবুদের ভয়ে সকলেই থরথর করে কাঁপে আর বাবুদের মনোরঞ্জনে প্রতিযোগিতা চালায়। এই দোল উৎসব এই বাবুদেরই। তারাই এর আয়োজক।

www.boighar.com

এবারের দোল উৎসবটা হচ্ছে মহা সমারোহে। পর পর তিন রাত্রি ধরে দোলবাড়ির নাটমণ্ডপে চলবে এক ডাকের কবি গান। বহু দূর থেকে এক ডাকসাইটে কবিয়াল দল নিয়ে এসেছেন বাবুরা। সেই সাথে সবাইকে চমকে দিয়ে এবার তারা গান শোনার দাওয়াত করেছেন চারপাশের গাঁগুলোর তামাম মুসলমান মাতবরদের। রাজা হয়ে প্রজাকে দাওয়াত এমনটি এর আগে কখনো দেখেননি ঐসব মুসলমান মাতবরেরা। দাওয়াত পেয়ে মাতবরদের খুশির সীমা অবধি রইলো না।

কিন্তু বিনা উদ্দেশ্যে বাবুরা এক পা'ও চলেন না। কিছু দিন আগে মস্তবড় এক ইসলামী জলসা বসে এই এলাকায়। দেশ বিখ্যাত এক আলেম এসে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব আর হিন্দুসহ অন্যান্য সকল ধর্মের অসারতা তুলে ধরে জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখেন জলসায়। সেই খবর শুনে বুকে জ্বালা ধরে বাবুদের। তাই পাল্টা জবাব দেয়ার জন্যে অর্থাৎ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার সাথে ইসলামকে তাচ্ছিল্য করার উদ্দেশ্যেই এই কবিগানের আয়োজন আর মাতবরদের দাওয়াত করা।

যথা দিনে যথা সময়ে আসর বসলো কবিগানের। মহানন্দে ছুটে এলেন আমন্ত্রিত মাতবরগণ আর বরাহুত অগণিত মুসলমান শ্রোতা। ছোট্যাকানাদের রুখে কে? চেলা চামুণ্ডা আর খেটে খাওয়া পার্টি নিয়ে ছোট্যাকানা ছুটে এলো সকলের আগেই।

শুরু হলো গান। শুরু হলো দুই কবিয়ালের পাল্লা। ফরমায়েশী পাল্লা। বাবুদের পরামর্শক্রমে হিন্দু মুসলমান প্রসঙ্গ শুরু করলো কবিয়ালরা। একজন হিন্দুধর্মের এবং অন্যজন ইসলামের পক্ষ নিয়ে পাল্লায় অবতীর্ণ হলো। হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে সে পক্ষের কবিয়াল সাড়ম্বরে দাতাকর্ণ ও বৃষ-কেতুর পর্ব উপস্থাপন করলো। দাতা কর্ণ কিভাবে নিজপুত্র বৃষকেতুকে বলি দিয়ে অতিথিরূপী ভগবানকে আপ্যায়ন করেছিল, সেদিকটা তুলে ধরলো জোরে শোরে।

গান শুনতে এসেছিলেন বাবুরাসহ অসংখ্য হিন্দু শ্রোতা। হিন্দুদের অগণিত আবাল বৃদ্ধ বনিতা। গোটা আসরের বারো আনা জায়গা দখল করে তারাই বসেছিল। পূজা মণ্ডপের বারান্দাভর্তি উপবিষ্ট ছিল প্রচুর হিন্দু যুবতী এয়োতি ও বৃদ্ধা। কবিয়ালের পয়ারের তালে তালে বাবুরাসহ সবাই করতালি বাজিয়ে সাবাশ সাবাশ আওয়াজ দিতে লাগলেন।

জবাবে ইসলামের পক্ষের কবিয়াল হজরত ইব্রাহিম আলাইহে ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হজরত ইসমাইলকে কোরবানী দেয়ার প্রসঙ্গটা যদিও আনলো তবে অন্তর্নিহিত কারণেই সেটাকে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারলো না। পারলো না ইসলামকে সগৌরবে তুলে ধরতে। অপরদিকে হিন্দু পক্ষের কবিয়াল হিন্দু ধর্মের গৌরব সিংহনাদে বয়ান করতে লাগলো আর ইসলামের পক্ষের কবিয়াল নেতিয়ে পড়ে আস্তে আস্তে লা জবাব হয়ে গেল। হিন্দু শ্রোতাদের উল্লাস তখন দেখে কে? তাদের উল্লাসে উল্লসিত হয়ে হিন্দু পক্ষের কবিয়াল যুক্তিতর্ক বহির্ভূতভাবে ইসলামকে নিয়ে শুরু করলো যৎপর নাস্তি উপহাস করা, ইসলাম একটা হিংস্র হীন কুৎসিৎ ধর্ম আর মুসলমানেরা একটা অসভ্য অধম ম্লেচ্ছ জাতি বলে যদেচ্ছ পয়ার গাওয়া শুরু করলো কবিয়াল। সেই সাথে উল্লাসে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগলো আসরের সমুদয় হিন্দু শ্রোতা। দোহাইর বাইনেরাও বাজনার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে পয়ারের তালে তালে উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ দিতে লাগলো– 'আহা বেশ ভাল, মুখে হরি বল' ইত্যাদি।

এসব কদর্য উক্তি যে মনগড়া ও একেবারেই যুক্তি তথ্যহীন এটা বুঝতে পারা সত্ত্বেও মুসলমান মাতবর প্রধান মুরুব্বীরা নতমস্তকে বসে রইলেন নীরবে। বাবুরা রুষ্ট হবেন ভয়ে প্রতিবাদে টু শব্দটিও করার সাহস পেলেন না। কিন্তু আগুন ধরলো অন্যদিকে। কবিয়ালের বিষোদগিরণ পুনরায় চরমে উঠতেই চটে গেল ছোট্যাকানা। মিঠাই মিষ্টান্ন পাক করার উদ্দেশ্যে চেলাকাঠের কয়েকটা স্তূপ ছিল নাট মণ্ডপের পাশেই। ছোট্যাকানা লাফিয়ে উঠে হুংকার দিয়ে বললো– তবেরে শালা, ইসলাম কুৎসিত ধর্ম আর মুসলমানেরা ম্লেচ্ছ জাতি? ধর শালাকে। এসব কথা সে কোথায় পেলো, সেটা আদায় করে না নিয়ে আজ ছাড়বো না।

–বলেই একটা চেলাকাঠ হাতে নিয়ে আসরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ছোট্যাকানা। সঙ্গে সঙ্গে চেলাকাঠ হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ছোট্যাকানার চেলারাও। শুরু হলো হুলুস্থুল কাণ্ড। বেগতিক দেখে আসর থেকে দৌড় দিলো হিন্দুপক্ষের কবিয়াল।

ছোট্যাকানারা অল্প কয়েকজন লোক। তাদের চারপাশে অগণিত হিন্দু শ্রোতা। হিন্দু যুবক আর বাবুদের পাইক পেয়াদা মোসাহেব। হুংকার দিয়ে ছোট্যাকানাদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ালো তারা সবাই।

কিন্তু ছোট্যাকানারা মরিয়া। প্রাণের চিন্তা না রেখে তারা উন্মত্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রতিপক্ষের উপর। এতে করে থমকে গেল প্রতিপক্ষ। মরার ভয় এদের একজনেরও

নেই দেখে ঘাবড়ে গেল তারা। ভাবতে লাগলো, মারা এরা পড়লেও তাদের অনেককেই না মেরে এরা মরবে না। অপরপক্ষে মরতে তারা রাজী নয় একজনও।

ছোট্যাকানাদের এগুতে দেখেই মার মার রবে উঠে দাঁড়ালো আসরে উপস্থিত খেটে খাওয়া মুসলমানেরা সবাই। হাতে হাতে চেলা কাঠ নিয়ে তারাও এসে যোগ দিল ছোট্যার দলের সাথে এবং বিপুল বিক্রমে হামলা করলো প্রতিপক্ষ হিন্দুদের।

মুহূর্তে পাল্টে গেল পরিস্থিতি। এমন মরিয়া মানুষ প্রতিপক্ষ হিন্দুরা এর আগে কখনো দেখেনি। আঁতকে উঠলো সবাই। বাবুরা ভয়ার্তকণ্ঠে পালাও পালাও আওয়াজ দিয়ে পড়িমরি দৌড় দিলেন মুক্ত কচ্ছ হয়ে। মুক্ত কচ্ছ দৌড় দিল হিন্দু শ্রোতারা সবাই। চেলা কাঠের দু'টার ঘা পিঠের উপর পড়তেই বাপ বাপ রবে দৌড় দিল বাবুদের পাইক পেয়াদা ও প্রতিপক্ষের যুবক শ্রেণী।

পূজা মণ্ডপের বারান্দায় রোল উঠলো আর্তনাদের– 'ও মাগো, কি করি গো' বলে ছুটোছুটি করতে লাগলো মহিলারা। ইতমধ্যে কে একজন আওয়াজ দিলো– ধর ঐ বাম্নিদের...

মহিলাদের আতংক সঙ্গে সঙ্গে মহাতংকে রূপান্তরিত হলো। গগনভেদী আর্তনাদের সাথে রাম রাম বলতে বলতে পড়িমরি পালিয়ে গেল মহিলারাও। ভেঙ্গে গেল গান। জনশূন্য হয়ে গেল বিশাল নাট্য মণ্ডপ। ফেটে গেল বাঁশি, ফেঁসে গেল ঢোল, গুঁড়িয়ে গেল হারমোনিয়াম, ছিঁড়ে গেল আসরে পাতা চট-সতরঞ্চি সব কিছু। উল্লেখ্য, এরপর আর কোনদিন হিন্দু মুসলমানের লড়াই বসাতে সাহস করেন নি বাবুরা।

ছোট্যাকানাদের উদ্দেশ্যে ধন্য ধন্য রব উঠলো চারদিকে। আসর ফেরতা তামাম মুসলমান শ্রোতা শত মুখে ছোট্যাকানাদের তারিফ গাইতে লাগলো। আসর ভাঙ্গার পর জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তির পিছে পিছে গ্রাম্য এক মাতবর গৃহের পথ ধরেছিলেন। তারা ছোট্যাকানাদের তারিফ প্রশংসা করছিলেন। তারিফ করতে করতে মাতবরটি এক সময় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বললেন– কি তাজ্জব ভাই সাহেব। সাহস করে কেউ আমরা একটা কথাও বলতে পারলাম না যেখানে, সেখানে তুচ্ছ ঐ ছোট্যারা এমন কাণ্ড ঘটিয়ে দিলো এক পলকে?

জবাবে বিজ্ঞ লোকটি ধীরকণ্ঠে বললেন– মাঝে মাঝে এ দুনিয়ায় এমনটিই ঘটে যায় ভাই সাহেব। তাজ্জবের ব্যাপার হলেও তাজ্জবের কিছু নেই।

তা হয়তো ঠিক। কিন্তু আমি ভাবছি ছোট্যাকানাদের কথা। মুসলমানদের মান-ইজ্জতটা যে আজ এরাই এভাবে রক্ষে করবে এ কথা কখনো ভাবিনি।

বিজ্ঞজনটি এবার মুক্তকণ্ঠে বললেন– ভাই সাহেব, এদের নিয়ে আল্লাহ তায়ালা কি করবেন, সেটা আল্লাহ তায়ালার বিষয়। তবে সত্যি কথা বলতে কি, এরাই হলো ইসলামের এক লুক্কায়িত প্রচণ্ডশক্তি। স্বার্থের লোভে বিধর্মীদের কাছে মাথা বিক্রয়কারী কিছু ধর্মদ্রোহী ছাড়া মুসলমানের ঘরে জন্ম গ্রহণকারী সকল মানুষের অনুভূতিই ঐ ছোট্যাকানাদের অনুভূতি। নামাজ রোজার প্রতি যত উদাসীনই হোক,

ইসলামকে নিয়ে উপহাস করা আর মুসলমানদের হেয় করা কিছুতেই এরা বরদাশত করতে পারে না।

: ভাই সাহেব।

ইসলামের যখনই ক্রান্তি লগ্ন আসে, ইসলাম দেশে টিকবে না বিলুপ্ত হয়ে যাবে এমন চরম মুহূর্ত দেখা দেয় যখন তখনই এরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। ইসলামের সেই ক্রান্তি লগ্নে ঈমানদারদের সাথে এরা অর্থাৎ ছোট্যাকানাদের সব অনুভূতির মানুষেরা গর্জে উঠে যখন তখনই ঘটে যায় অভাবনীয় বিপ্লব। কাঁপতে কাঁপতে অপসৃত হয় অপশক্তি আর অলৌকিকভাবে সম্পন্ন হয় মুসলমানদের এক ঐতিহাসিক বিজয়।

এবার সবেগে মাথা নেড়ে মাতবরটি বললেন– ঠিক ঠিক। ঠিক কথা বলেছেন। 'ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবাল কা বাদ'– এটা বোধ হয় সম্ভব হয় অনেকটা এ কারণেই।

দুলাহ মিয়া

: নাম?

: দুলাহ মিয়া।

: হোয়াট?

: আমার নাম দুলাহ মিয়া।

: দুলা মিয়া মানে?

: মানেটা বোঝানো কঠিন স্যার। আব্বা আম্মা নাম রাখলেন সুজাউদৌলাহ। কিন্তু তা হলে কি হয়? পড়শীরা পাঁচজন কি আস্ত থাকতে দিলে ওটা? তারা ওটাকে ঠেলতে ঠেলতে প্রথমে দৌলাহ আর সব শেষে দুলাহ মিয়াতে এনে তবে ছাড়লে। এখন আমার আব্বা আম্মাও আমাকে দুলাহ বলে ডাকেন। আত্মীয় পরিজন সবাই বলেন দুলাহ মিয়া।

তা বলুক। ঐসব দুলাহ মিয়া ফুলাহ মিয়া এখানে চলবে না। চাকরি পেতে হলে সেরেফ মিয়া মানে মিয়া সাহেব হতে হবে তোমাকে।

: জি স্যার। যা বলবেন, তাই হবো।

: হতেই হবে। এবার বলো, লেখাপড়া কতখানি করেছো?

: অনেকখানি স্যার। সে দিক দিয়ে কম বলতে পারবে না কেউ?

: কি রকম? অনেকখানি কতখানি।

অনেকখানি... অনেকখানি। বাল্যশিক্ষা, আমার বই, ছড়াপড়া– এগুলো সবই ছরছর করে পড়তে পারি।

হেসে ফেললেন হক সাহেব। হক এ্যান্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী মো. আজিজুল হক সাহেব। বললেন, ও আচ্ছা। তা বাড়ি কোথায় তোমার?

জবাবে দুলাহ মিয়া বললো– গাঁয়ে। বগুড়া জেলার এক দূরবর্তী গাঁয়ে।

: বটে। তা তোমাকে চেনে এমন কেউ এই ঢাকা শহরে আছে?

আছে স্যার। এখানকার থানার ওসি সাহেব আমাকে চেনেন। আমাদের একই গাঁয়ে বাড়ি।

: বলো কি! ওসি সাহেব চেনেন? তাহলে তো খুব ভাল কথা।

আপনি ড্রাইভার চান, এই বিজ্ঞাপন কাগজে দেখেই আমি ওসি সাহেবের কাছে এলাম। উনিই আমাকে আপনার বাড়িটা চিনিয়ে দিলেন।

: বহুৎ খুব বহুৎ খুব। তা তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স তো আছে নিশ্চয়ই?

জি স্যার আছে। এই যে আমার লাইসেন্স। নাম চেহারা মিলিয়ে নিন স্যার। লাইসেন্সটা হাতে নিয়ে হক সাহেব তার দিকে তড়িৎ চোখ বুলালেন। এরপর বললেন– হ্যাঁ-হ্যাঁ, ছবিটা তো তোমারই; নামও তো দেখছি সুজাউদৌল্লাহ, ওরফে দুলাহ মিয়া। বেশ বেশ।

লাইসেন্সটা ফেরত নিয়ে দুলাহ মিয়া বললো– অনেক শহরে গাড়ী চালিয়েছি স্যার। অনেকদিন থেকে আমি গাড়ী চালাই।

: ঢাকা শহরে চালিয়েছো কখনো?

: জি? তা কথা হলো, অসুবিধে হবে না স্যার।

হক সাহেব নারাজকণ্ঠে বললেন– উঁহু, মুখে বললে তো হবে না। মফস্বল শহরে গাড়ী চালানো আর ঢাকা শহরে গাড়ী চালানো এক কথা নয়।

: হবে না স্যার, কোনই অসুবিধে হবে না। দয়া করে আমাকে নিয়োগ করে দেখুন, আমার কাজ দেখে খুশি ছাড়া নাখোশ আপনি হবেন না।

: না-না, তা হয় না। পরীক্ষা করে না দেখে সরাসরি তাহলে নিয়োগ করা যাবে না। ঢাকায় গাড়ী চালানো নিয়ে যেখানে কথা।

: তাহলে তাই-ই করুন স্যার। যেভাবে ইচ্ছে পরীক্ষা করে নিন।

হ্যাঁ, তাই-ই করবো। আমার বড় ছেলের ড্রাইভার মকবুল হোসেন পাকা ড্রাইবার। তার কাছেই পরীক্ষা দাও। বিজ্ঞাপন দেয়ার তিন চার দিন পার হয়ে গেল। তবু সুবিধে মতো লোক যখন কেউ এলো না তখন তোমাকেই পরীক্ষা করে দেখি।

অতঃপর তিনি মকবুল হোসেনকে ডেকে নিয়ে দুলাহ মিয়াকে তার গাড়ীতে তুলে দিলেন এবং দুলাহ মিয়াকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে বললেন। দুলাহ মিয়াকে ড্রাইভিংয়ে বসিয়ে দিয়ে মকবুল হোসেন তার পাশে এসে বসলো এবং গাড়ী ছাড়তে বললো। ছুটতে লাগলো গাড়ী। ঘণ্টা দুয়েক শহরের অলিগলি ও নানা পথে ঘোরার পর মকবুল হোসেন ফিরে এসে হক সাহেবকে বললো– কি তাজ্জব ব্যাপার স্যার! কাকে পরীক্ষা করতে বলছেন আমাকে? এ লোক তো আমার ওস্তাদেরও বড়। তার কাছে আমার নিজেরই শেখার আছে অনেক। এতবড় মজবুত ড্রাইভার খুব কমই আমি দেখেছি।

www.boighar.com

হক সাবে খুশি হয়ে বললেন– তাই নাকি? তাহলে সত্যিই ছেলেটা একজন ভাল ড্রাইভার?

মকবুল হোসেন বললো– ভাল কি বলছেন স্যার। যথেষ্ট ভাল ড্রাইভার। আপনার কাজ তো খুবই হালকা-পাতলা কাজ। ওর কাছে এ কাজ একেবারেই মামুলি।

: অর্থাৎ?

বইঘর ও বিএবিডি

: আপনার তো ব্যবসার ঝামেলা আর নেই। আপনার ছেলেরাই সব বুঝে নিয়েছেন পুরোপুরি। তাদের গাড়ী ড্রাইভারও আলাদা। ব্যবসার কাজে আপনাকে আর ছুটোছুটি করতে হয় না। আপনার ড্রাইভারের কাজ কেবল আপামণিকে ভার্সিটিতে নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসা আর মাঝে মধ্যে আপনাকে নিয়ে একটু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানো।

এ কাজ ঐ দুলাহ মিয়া মানে ঐ মিয়া সাহেব হেসে খেলে করতে পারবে।

: করতে পারবে? ঠিক বলেছো?

: জি স্যার। আপনি নিশ্চিন্তে ওকে নিয়োগ করতে পারেন।

ঐদিনই হক সাহেব দুলাহ মিয়াকে ডেকে বললেন– সাব্বাশ নওজোয়ান। পরীক্ষা ভালভাবেই পাশ করেছো তুমি! তোমাকে নিয়োগ করতে এখন আমি প্রস্তুত। কিন্তু কিছু শর্ত আছে এর সাথে। পয়লা শর্ত, তোমার থাকা খাওয়া সব এখানে। অন্য কোথাও গিয়ে থাকা তোমার চলবে না। দ্বিতীয় শর্ত, গাড়ী চালানো কাজ আমার অল্প। গাড়ী চালানোর বাইরেও কিছু ফাই ফরমায়েশ খাটতে হবে আমাদের। এতে তুমি রাজী?

: জি স্যার, জি। আমার কোন আপত্তি নেই।

আমাদের মানে, সেরেফ আমার আর আমার নাতনীর কিছু ফাই-ফরমায়েশ। বাড়ির আর সকলের অনেক চাকর নফর আর লোকজন আছে। ব্যক্তিগতভাবে কেবল আমাদেরই কেউ নেই। টুকিটাকি কাজগুলো সময় মতো করে দেয়ার কাউকে পাওয়াই যায় না তেমন। এগুলো তোমাকে করতে হবে।

করবো স্যার, যা করা দরকার সব আমিই করে দেবো। অন্য কারো প্রয়োজনই আর পড়বে না।

www.boighar.com

: গুড।

হক সাহেব খুশি হয়ে দুলাহ মিয়াকে নিয়োগ দান করলেন।

কিন্তু খুশি হলো না হক সাহেবের নাতনী ফিরোজা বানু বেগম। পরের দিন সকালেই সে তার নানাজানকে আক্রমণ করে বললো– এ কি রকম লোক নিয়োগ করলেন নানা? খুঁজে আর লোক পেলেন না?

আজিজুল হক সাহেব জোর দিয়ে বললেন– দরেজ লোক, দরেজ লোক। বড়ই এক্সপার্ট ড্রাইভার।

: সেইটেই কি বড় কথা হলো? তার চেহারার দিকে তাকালেন না?

: তাকাই নি মানে? তার চেহারাটাই তো আমাকে আরো কাবু করেছে বেশি। ওহ! কি মনোরম চেহারা! সিনেমার অনেক নায়কই এর চেহারার কাছে ফেল।

সমস্যাটা তো ওখানেই। লেখা জানে না পড়া জানে না অথচ নায়ক নায়ক চেহারা। এসব লোকের চরিত্র কি ভাল হয় কখনো? কোন বয়সী লোক পেলেন না?

: তা কথা হলো অসুবিধে হবে বলে তো মনে হয় না। কথাবার্তায় ছেলেটা খুবই ভদ্র আর নম্র। এর উপর ফের নামাজী। প্রতি ওয়াক্তেই নামাজ পড়তে দেখলাম। পরহেজগার ছেলেরা তো বেয়াদব হয় না।

: কিন্তু...

দু'চার দিন কাজে লাগিয়ে দেখো। যদি উল্টাপাল্টা দেখা যায়, বিদেয় করে দেবো।

উল্টাপাল্টা কিছুই দেখা গেল না। যথেষ্ট সদগুণ ছাড়া এই নতুন ড্রাইভারের মধ্যে দোষের কিছুই চোখে পড়লো না। নীরবে গাড়ী চালায়। কথা বললে তার জবাব দেয়, না বললে নিজে সে কোন কথা বলে না। ফিরোজার দিকে সরাসরি চোখ তুলেও তাকায় না। যা হুকুম হয় সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করে হৃষ্টচিত্তে।

কয়েকদিন কেটে গেল। একদিন ভার্সিটিতে যেতে যেতে ফিরোজা বানু প্রশ্ন করলো– তোমার নামটা এমন বিদঘুটে কেন? 'মিয়া সাহেব' কোন একটা নাম নাকি?

জি না, আমার নাম দুলাহ মিয়া। স্যার বললেন, ও নাম চলবে না। এখন থেকে তুমি মিয়া সাহেব। তাই মিয়া সাহেব হয়ে গেলাম।

ফিরোজা বানু ঈষৎ হেসে বললো– অমনি মিয়া সাহেব হয়ে গেলে?

: জি ম্যাডাম।

: এই খবরদার! ও সব ম্যাডাম ফ্যাডাম কখখনো বলবে না। আপা বলবে, আপা।

: জি-জি, আপা।

একটু পরে ফিরোজা ফের প্রশ্ন করলো– শুনলাম অনেকদিন থেকেই গাড়ী চালাও। নেশাটেশা কিছু করো না?

: নেশা!

: ড্রাইভারেরা তো অনেকেই নেশাখোর। মদ-গাঁজা খায়। তুমি খাও না?

: তওবা তওবা, মুসলমানের জন্যে ওসব গুনাহ আপা। ওসব খেলে ঈমান থাকে না।

: সিগারেট, বিড়ি?

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। না বুঝে আগে দু'চারটে খেতাম। এখন আর খাইনে।

দুলাহ মিয়ার সৎ স্বভাবে আর সৎ আচরণ দেখে ফিরোজা বানুর তামাম দ্বিধা দূর হলো দিনে দিনে এবং কালক্রমে সে তার সাথে এক হয়ে মিশে গেল।

এতে আবার পয়দা হলো আর এক ফ্যাসাদ। দুলাহ মিয়ার আকর্ষণীয় চেহারা দেখে ফিরোজার বান্ধবী, আত্মীয়-স্বজন আর পড়শীরা এক একজন এক একভাবে ভুল করতে লাগলো। দুলাহ মিয়াকে কেউ ভাবলো ফিরোজা বানুর বর, কেউ ভাবলো

হবু বর। কেউ ভাবলো ফিঁয়াসে। অর্থাৎ প্রেমিক ধারণা তাদের মিথ্যা হয়ে যাওয়ায় প্রথমে সবাই হোঁচট খেতে লাগলো এবং পরে ফিরোজার চরিত্র এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে পাঁচজনে পাঁচ রকম বলতে শুরু করলো।

ফিরোজা বানুকে নিয়ে যেতে এসে দুলাহ মিয়া সেদিন চুপচাপ বসেছিল ইউনিভার্সিটির লনে। ক্লাশ শেষে কয়েকজন বান্ধবীসহ ফিরোজাবানু তার দিকে এগিয়ে এলো এবং ডাক দিয়ে বললো– এসো মিয়া, এবার যাওয়া যাক।

দুলাহ মিয়া এগিয়ে আসতেই তার দিকে ফিরোজার বান্ধবীদের দুই চোখ স্থির হয়ে গেল। তারা থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বিহ্বলকণ্ঠে বললো– ও মাই গড! কি হ্যান্ডসাম চেহারা! কে রে ফিরোজা, ইনি তোর কে হন?

ফিরোজা বানু থতমত করে বললো– না না, আমার কেউ হয় না।

বান্ধবীরা এবার অনুচ্চকণ্ঠে বললো– হয় না? তাহলে হবু কেউ নিশ্চয়ই।

: তার মানে?

মানে তোর প্রেমিক, তোর হবু বর। আহা, এমন খাশা চেহারা কোথা থেকে যোগাড় করলি ভাই! এমনটি পাওয়ার জন্যে যে কোন মেয়েই দরিয়ায় ঝাঁপ দিতে ইতস্তত করবে না।

ফিরোজাও অনুচ্চকণ্ঠে বললো– ছিঃ! এসব কি বলছিস! ও আমার ড্রাইভার।

প্রচণ্ড হোঁচট খেলো বান্ধবীরা। বললো– ড্রাইভার?

: হ্যাঁ, আমার ড্রাইভার।

: হাউ ষ্ট্রেঞ্জ। ড্রাইভারের এত সুন্দর চেহারা! এমন সুপুরুষ।

বান্ধবীরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো। একজন ফের সখেদে বললো– হা ইশ্বর! হতভাগীকে কি শেষ পর্যন্ত ডোবাতেই ডুবিয়ে মারবে তুমি?

চলতেই লাগলো এই জের। কুৎসা, সন্দেহ আর কানাঘুঁষা। ভার্সিটির নষ্ট ছেলেরা নেচে উঠলো এ খবরে। সুন্দরী ফিরোজা বানু তুচ্ছ একজন ড্রাইভারের ভোগ্যা শুনে তারাও মওকা খুঁজতে লাগলো।

সেদিন ভার্সিটি থেকে বেরিয়ে আসতেই গাড়ীর চাকা গড়বড় করতে লাগলো। এতে করে রাস্তার একপাশে থামিয়ে দুলাহ মিয়া গাড়ী থেকে নামলো এবং লোহার রডের স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে চাকা টাইট দিতে লাগলো। এই সময় তিন চার জন ছাত্র নামের সন্ত্রাসী এসে গাড়ীর দুই পাশে দাঁড়ালো এবং নেতা গোছের একজন ফিরোজা বানুকে উদ্দেশ্য করে বললো– আসুন ম্যাডাম, ড্রাইভার গাড়ী ঠিক করছে করুক, এই ফাঁকে পার্কে ঢুকে আমরা একটু মৌজ করি, আসুন।

ফিরোজা বানু গরমকণ্ঠে বললো– তার মানে?

মানে আমাদের একটু প্রেমদান করবেন আসুন। অনেকদিন পরে বাগে পেয়েছি আজ। আজ আর ছেড়ে কথা বলছিনে। নেমে আসুন।

: বটে! সরুন, সরে যান আপনারা এখান থেকে। এই আপনাদের চরিত্র?

কেন ম্যাডাম? একজন তুচ্ছ ড্রাইভারের সাথে চুটে প্রেম চালাচ্ছেন দিনরাত। আমাদের বেলায় এই সতীপনা কেন?

: অভত্য, ইতর!

দুলাহ্ মিয়া এবার আওয়াজ দিলো– এই, খবরদার!

: আরে থামো মিয়া। আমরা ভদ্র ঘরের উচ্চ শিক্ষিত সন্তান। এঁর সাথে পড়ি। তুমি একজন গণ্ডমূর্খ ড্রাইভার। থার্ড ক্লাশ লোক। আমাদের কথার মধ্যে তুমি কথা বলো কেন?

ফিরোজা বানু বললো– আপনারা যাবেন, না চিৎকার দিয়ে লোক জোটাবো। এই! কি ভদ্র ঘরের সন্তান সব!

সন্ত্রাসীদের একজন বললো– মুখের কথায় হবে না উস্তাদ। জোর খাটান। টেনে ওকে বের করুন গাড়ী থেকে। শূন্যে শূন্যে নিয়ে চলুন।

'ঠিক ঠিক' বলে সবাই গাড়ীর দুয়ারে হাত দিলো। আগুন ধরলো দুলাহ্ মিয়ার মাথায়। 'তবে রে' বলে সে হুংকার দিয়ে উঠলো। লোহার রডটা বাগিয়ে ধরে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লো তাদের সামনে। রডটা এবার ঊর্ধ্বে তুলে সগর্জনে বললো– বাঁচতে চাও তো পালাও। নইলে ফাটলো মাথা। ইয়া আলী...!

ড্রাইভারটা যে হঠাৎ এমন ভয়াল মূর্তি ধারণ করবে এতটা ভাবতেই পারেনি সন্ত্রাসীরা। রডটা মাথার উপর পড়ো পড়ো দেখে সবাই চমকে উঠলো। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় তারা সরে পড়লো সুড় সুড় করে।

চাকা ঠিক করা শেষ হয়ে গিয়েছিল। দুলাহ মিয়া গাড়ীতে উঠে গাড়ী স্টার্ট দিতে গেল। ফিরোজা বানু এতক্ষণ দম বন্ধ করে ছিল। এবার সে কম্পিতকণ্ঠে বললো– তুমি ওভাবে ওদের সামনে লাফিয়ে পড়লে কেন? নামেই ওরা ছাত্র। আসলে মার্কামারা সন্ত্রাসী সবাই। সাথে পিস্তল থাকে। তোমাকে গুলি করতো যদি?

জবাবে দুলাহ্ মিয়া বললো– তো কি করবো? আপনাকে ওদের হাতে ফেলে রেখে কি পালিয়ে যাবো আমি?

ফিরোজা বানুর তৎপরতায় মিয়া সাহেব থেকে দুলাহ্ মিয়ার নাম আবার দুলাহ্ মিয়াতেই ফিরে এলো। হক সাহেবও এখন তাকে দুলাহ্ মিয়া বলেই ডাকেন। সেদিন বিকেলে সমবয়সী এক ব্যবসায়ীর সাথে ড্রয়িংরুমে বসে গল্প করছিলেন হক সাহেব। গল্পের মাঝেই তিনি হাঁক দিলেন– দুলাহ্ মিয়া, দুলাহ্ মিয়া...!

দুলাহ্ মিয়া এলে তিনি বললেন– আমার বড় ছেলে এসে থাকলে তাকে ঘরে থাকতে বলো। তার সাথে কিছু জরুরী কথা আছে আমার। হুট করে আবার যেন বাইরে বেরিয়ে না যায়।

বইঘর ও বিএনবিডি

'জি আচ্ছা!' বলে চলে গেলো দুলাহ মিয়া। তাকে দেখে আগন্তুক ভদ্র লোকটি মোহিত কণ্ঠে বললেন– নাত জামাই বুঝি! বড় দর্শনধারী নাত জামাই যোগাড় করেছেন তো! নাতনীর শাদি দিলেন অথচ দাওয়াতটাও পেলাম না?

হক সাহেব সবিস্ময়ে বললেন– নাত জামাই! নাত জামাই কোথায় দেখলেন?

: কেন, এই যে দুলাহ মিয়া বলে ডাক দিলেন যাকে?

হক সাহেব হেসে বললেন– কি যে বলেন! ও আমার নাত জামাই হবে কেন? ওতো আমার ড্রাইভার।

: ড্রাইভার! সে কি! তাহলে দুলাহ মিয়া বললেন কেন?

: ওর নামটাই যে দুলাহ মিয়া। বিদঘুটে এক নাম।

: তাজ্জব!

কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে রইলেন ভদ্রলোক। এরপরে ফের বললেন– তা নাতনীটার শাদির কথা কিছু চিন্তা ভাবনা করছেন কি? কোন সম্বন্ধ কোথাও থেকে এলো? মানে, কোথাও কোন সম্বন্ধ দেখছেন কি?

হক সাহেব গম্ভীরকণ্ঠে বললেন– তা আমি সম্বন্ধ দেখে কি করবো বলুন? নাতনীর যে আমার কিছুই পছন্দ হয় না।

: পছন্দ হয় না?

হয় কৈ? আমার বাল্যবন্ধু রকিব সাহেবের নাম তো শুনেছেন। মস্ত বড় সম্পদশালী লোক। খুবই উঁচু ঘর। তার এক নাতী সাত আট বছর বিলেত থেকে লেখাপড়া করেছে। এক্ষণে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে এসেছে। আমার নাতনী ফিরোজাকে রকিব সাহেবের খুব পছন্দ। ফিরোজার সাথে তার সেই নাতিকে শাদী দেয়ার জন্যে কত ঝুলাঝুলি করলেন তিনি। কিন্তু ফিরোজা কিছুতেই রাজী হলো না এ শাদীতে।

: সেকি! রাজী হলো না কেন?

আমার নাতনীকে তো জানেন। বড়ই পরহেজগার মেয়ে। নামাজ রোজায় পারদর্শী। দীর্ঘদিন বিলেতে থাকা ঐ ছেলেকে কিছুতেই সে খসম বলে মেনে নিতে রাজী নয়।

: কারণ?

: কারণ ছেলেটার চরিত্র ও চালচলন। যে পরিবেশ থেকে এসেছে সেই পরিবেশ। ওদেশে তো নারী-পুরুষর অবৈধ সম্পর্ক ভাত-মাছের মতোই মামুলি ব্যাপার। মদ খাওয়া নেশা করা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। ওদেশে যারা দীর্ঘদিন থাকে তাদের মধ্যে ঐসব বদগুণ আপছে আপ চলে আসে। নামাজ রোজার ধার ধারে না তারা। আল্লাহ রাসূল মানে না। আমার নাতনীটি জেনেছে, ঐ বদগুণগুলো তামামই সাথে নিয়ে দেশে ফিরেছে ছেলেটা। চালচলনও ম্লেচ্ছের চালচলন। এরপর আর তাকে শাদী করতে রাজী হয় কি করে বলুন?

বইঘর ও বিএনবিডি

তা বটে, তা বটে। নাতনী আপনার ঠিকই করেছে। আমার জানামতে যারাই ওদেশে দীর্ঘদিন থেকেছে, তারা প্রায় সবাই সাহেব হয়ে দেশে ফিরে এসেছে। ইসলামী আদম আখলাক কিছুই তাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। এ রকম ছেলে নেবেন কেন?

অঢেল সম্পদ আছে আপনার। আপনার বাপ-মা মরা ঐ নাতনীরও শুনি অনেক বিষয় সম্পদ আছে। দেখে শুনে একটা পরহেজগার ছেলে যোগাড় করে নিন।

হ্যাঁ, তাই করবো ভাবছি। একটা বছর পরেই এমএ দেবে ফিরোজা। পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই সে চেষ্টা জোরদারভাবে নেবো।

দিন যতই যেতে লাগলো দুলাহ মিয়ার আচরণে তার পতি ফিরোজা বানু ততই বেশি আকৃষ্ট হতে লাগলো। নামাজ কালাম ইবাদত-বন্দেগী তো আছেই, সেই সাথে কাজকামের প্রতি তার নিষ্ঠা আর ফাই ফরমায়েশ খাটাতে তার নিরহংকার মনোভাব ফিরোজাকে ক্রমেই মুগ্ধ করতে লাগলো।

একদিন একটা ছেঁড়া স্যান্ডেল হাতে নিয়ে ফিরোজা বানু ব্যস্তভাবে চাকর বাকরদের খোঁজ করতেই দুলাহ মিয়া এসে বললেন– কি হয়েছে আপা, চাকর বাকর ডাকছেন কেন?

স্যান্ডেলটা তুলে ধরে ফিরোজা বানু বললো– এই যে স্যান্ডেলের এই ফিতেটা ছিঁড়ে গেল হঠাৎ, নতুন স্যান্ডেল। মুচির কাছে দিলেই আবার পায়ে দিতে পারি। কিন্তু ডাকহাঁক করে চাকর বাকর কাউকেই পাচ্ছিনে।

: আরে তাতে কি হয়েছে? আমাকে দিন, আমি এক্ষুণি ঠিক করে এনে দিচ্ছি।

: সে কি, তোমাকে? আমার জুতা নিয়ে তুমি যাবে মুচির কাছে। না না, তা হয় না।

: হয় না কেন আপা! এতো একদম মামুলি কাজ। আপনার কাপড় জামা ধোয়ারও জরুরী প্রয়োজন পড়লে আমাকে বলবেন, আমিই ধুয়ে দেবো। সব সময় চাকর নফরের আশায় থাকবেন কেন?

ফিরোজা বানু বিপুল বিস্ময়ে বললো– তুমি! তুমি ধুয়ে দেবে? সম্মানে বাধবে না তোমার?

: ছিঃ ছিঃ। তা বাধবে কেন? ঠেকা কাম চালাতে সম্মানে বাধবে কেন? এসব তো আমার চাকরির শর্ত। সব কিছু করে দেয়ার ওয়াদা করেই তো চাকরিতে আমি ঢুকেছি। ওয়াদার বরখেলাপ কখ্খনো করতে পারিনে আমি।

: দুলাহ মিয়া!

: দিন দিন, স্যান্ডেলটা আমাকে দিন...

স্যান্ডেলটা এক রকম জোর করে নিয়েই দুলাহ মিয়া বাজারের দিকে ছুটলো। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো ফিরোজা বানু বেগম।

দশ বারোদিন পরে কিছু উপহার সামগ্রী কিনে এনে হক সাহেব ফিরোজা বানুকে বললেন– তোর খালার ভাসুর পুতের আগামীকাল খাৎনা। তারা এসে বিশেষভাবে

বইঘর ও বিএবিডি
দাওয়াত দিয়ে গেছেন। না গেলে বলবে, দেয়ার ভয়ে এলো না। তুই রেডি থাকিস।

: কখন যাবেন নানা?

আগামীকাল সকালে। দুপুরে অনুষ্ঠান। ঘণ্টা তিনেক সময় লাগবে যেতে। সকাল সকাল গিয়ে সকাল সকাল ফিরে আসবো। কিন্তু হক সাহেব নিজে যেতে পারলেন না। রাতে ভীষণ জ্বর এলো গায়ে। সকালেও পুরোদস্তুর লেগেই রইলো জ্বর। বাধ্য হয়ে ফিরোজা বানুকেই যেতে হলো উপহার নিয়ে। সঙ্গে কাউকে নেয়ার চিন্তা করেছিল। কিন্তু সময়মতো কাউকেই হাতের কাছে না পেয়ে একাই সে উঠে বসলো গাড়ীতে এবং দুলাহ মিয়াকে গাড়ী ছাড়তে বললো। যাতায়াত ছয় ঘণ্টা সময়, দিনের পথ, ভয় কি?

যথাসময়েই পৌঁছলো তারা। খাৎনা অনুষ্ঠানও যথা সময়েই শেষ হলো। কিন্তু খাওয়া দাওয়া শেষ হতে বেলা গড়িয়ে গেল অনেকখানি। বিদায় আদায় নিয়ে বেরুতে বেরুতেই বেলা পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। পথে নেমে তারা হিসাব করে দেখলো, বাসায় পৌঁছতে রাত প্রায় আটটা সাড়ে আটটা বেজে যাবে।

নসীবের লিখন। ভীষণ গরম পড়েছিল দিনের বেলা। সাঁঝ ঘনিয়ে আসতেই গুড় গুড় করে ডেকে উঠলো আসমানের উত্তর-পশ্চিম কোণ। ছোট্ট একখণ্ড মেঘ দেখতে দেখতে ছেয়ে ফেললো গোটা আকাশ। শুরু হলো ঝড়বৃষ্টি। ঝড়বৃষ্টি ঠেলে ঠেলে কিছুপথ এগুনোর পর দুলাহ মিয়া বললো– ঝড়বৃষ্টির বেগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে আপা। পথে আর লোক চলাচল নেই। কি যে হয়?

ফিরোজা বানু তখন দোয়া দরূদ পড়ছিল। বললো– আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। চালিয়ে যাও, আল্লাহ ভরসা।

কিন্তু মাঝামাঝি পথ পেরুতেই ঝড়ের বেগ বাড়তে বাড়তে সাইক্লোনে রূপান্তরিত হলো এবং রাস্তার উপর গাছপালা ভেঙ্গে পড়ে বন্ধ করলো গাড়ীর গতি। সেই সাথে মুষল ধারে বর্ষণ। দুলাহ মিয়া বললো– আগে পিছে আর কোনদিকেই এগুনোর পথ নেই আপা। গোটা গোটা গাছ উপড়ে পড়েছে পথের উপর। রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজের লোকেরা লেবার লাগিয়ে এগুলো সাফ করার আগে এ পথে আর কোন গাড়ী ঘোড়া চলবে না। তার চেয়েও বড় কথা, কোন গাছ যে কোন সময় আমাদের গাড়ীর উপর পড়বে তার ঠিক নেই।

ফিরোজা বানু ভীতকণ্ঠে বললো– তাহলে এখন উপায়!

: এখানেই যে কোন বাড়িতে আশ্রয় নিতে হবে।

: তাহলে শিগগির তাই করো। অপঘাতে মরতে পারিনে আমরা।

নসীবগুণে নিকটেই একটা পাকাবাড়ি পাওয়া গেল। বেশ বড় লোকের বাড়ি। চারদিকে প্রাচীর। ফটকটা খোলাই ছিল কিন্তু ঘরের দরজা জানালা সব ভেতর

বইঘর ও বিএবিডি
থেকে বন্ধ করা। দরজায় এসে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন এক সৌম্যদর্শন মুরুব্বী। প্রশ্ন করলেন কে?

অনুনয়ের সুরে ফিরোজা বানু বললো– এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আমরা বড় মুসিবতে পড়ে গেছি জনাব। দয়া করে আমাদের একটু আশ্রয় দিন।

মুরুব্বী ফের প্রশ্ন করলেন– কোথা থেকে আসছো তোমরা? মানে বাড়ি কোথায় তোমাদের?

: বাড়ি ঢাকায়।

: ঢাকায় কোথায়?

মেসার্স হক অ্যান্ড কোম্পানীর নাম শুনেছেন কিনা জানিনে। আমি সেই হক সাহেবের নাতনী।

শুনামাত্রই লাফিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। সোল্লাসে বললেন– এ্যাঁ সেকি। হক সাহেবের নাতনী? সোবহান আল্লাহ, সোবহান আল্লাহ! এসো এসো, ভেতরে এসো। কি কাণ্ড, কি কাণ্ড!

ফিরোজা বানু প্রশ্ন করলো– তাঁকে আপনি চেনেন?

: চিনবো না মানে? আমরাও ব্যবসায়ী লোক। আমার বড় ব্যবসা তো ঐ হক অ্যান্ড কোম্পানীর সাথে। আমরাই তার মেন ক্লায়েন্ট।

অতঃপর দুলাহ মিয়ার দিকে চেয়ে বললেন– তা ইনাকে তো চিনলাম না? তোমার কোন নিকট আত্মীয় বুঝি।

জবাব খুঁজে না পেয়ে ফিরোজা বানু মাথা নীচু করলো। তা দেখে ভদ্রলোক ফের উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন– ও বুঝেছি বুঝেছি। নাতজামাই। হক সাহেবের নাতজামাই। তা এতে শরম পাওয়ার কি আছে।

: জি?

: নাতজামাই ছাড়া যে নাতনীকে অপর পুরুষের সাথে হক সাহেব কখনো ছেড়ে দিতে পারেন না, তা ঠিকই আমরা জানি। যে কট্টরপন্থী লোক তিনি। ভাল ভাল, খুব ভাল। বড় খাশা নাতজামাই যোগাড় করেছেন হক সাহেব। তাঁর নাতনীটির মন ভরেছো তো?

ফিরোজার দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক। দুলাহ মিয়ার সাথে চকিতে দৃষ্টি বিনিময় করে ফিরোজা বানু নতমস্তকে বললো– জি জি।

ভদ্রলোক এবার দুলাহ মিয়াকে বললেন– সেরেফ হক সাহেবেরই নয়, তুমি আমাদেরও নাতজামাই। এসো এসো, ভেতরে এসো। তোমাদের গাড়ীর ব্যবস্থা পড়ে করছি।

দু'জনকে ভেতরে নিতে নিতে ভদ্রলোক ফের বললেন– সেবার এক মজার কাণ্ড ঘটেছিল। দু'জন তরুণ তরুণী এসে রাত্রিকালে আশ্রয় চাইলো। হায় আল্লাহ! খোঁজ নিয়ে দেখি, ওরা স্বামী স্ত্রী নয়, কেউ কারো নিকট আত্মীয়ও নয়। লাইফ এনজয়

বইঘর ও বিএবিডি
করে বেড়াচ্ছে। আর যায় কোথায়? অমনি দূর দূর করে কুকুরের মতো দিলাম তাদের তাড়িয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে ফিরোজা ও দুলাহ মিয়ার মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো এবং স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় যাতে করে নিখুঁতভাবে হয়, সেই ইঙ্গিত বিনিময়।

হক সাহেবের নাতনী নাতজামাই হিসাবে আদর আপ্যায়ন খুব ভালভাবেই সম্পন্ন হলো। কিন্তু মুসিবত দেখা দিল শোয়ার বেলায়। দু'জনের এক ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা করা হলো। ঘেমে উঠলো উভয়েই। না করার আর উপায় নেই। ঘরে ঢুকে দুয়ার বন্ধ করে ফিরোজা এসে থপ করে বিছানার উপর বসলো এবং পাশেই এক হেলনা চেয়ারের উপর বসে পড়লো দুলাহ মিয়া। অনেকক্ষণ কারো মুখে কথা নেই। পরে ফিরোজা বানু আফসোস করে বললো– এতটাই লেখা ছিল কপালে!

দুলাহ মিয়া সান্ত্বনা দিয়ে বললো– আফসোস করবেন না আপা। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমান। আমি এই চেয়ারে বসেই কাটিয়ে দেবো রাতটা।

ঘুমুতে বললেই কি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি আমি? যতটা বিশ্বস্তই হও না কেন, তুমি পর পুরুষ। পরপুরুষ ঘর রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমানো কি সম্ভব?

: আরে কয় কি! যাকে বিপদ থেকে বাঁচানো আমার নৈতিক দায়িত্ব, সেই আমি তার বিপদের কারণ হবো– এসব ভাবে কি!

www.boighar.com

: কি বললে?

আমি বলছি, আপনি ঘুমান। আপনার কোন বিপদ আমার দ্বারা হবে না, অন্তত এটুকু আস্থা আমার উপর রাখুন।

আস্থাটা রাখতেই হলো। মন সাহস না পেলেও চোখ ভয় করলো না। অনেক ধকলের পর রাত একটু গভীর হতেই চোখ দুটো মুজে এলো নির্ভয়ে।

কেটে গেল রাত। সকাল বেলা ধড়মড় করে উঠে ফিরোজা বানু দেখলো, ঐ হেলনা চেয়ারের উপরই গুটিশুঁটি মেরে পড়ে আছে দুলাহ মিয়া। তার কথা আর আচরণের মধ্যে একবিন্দুও ব্যতিক্রম ঘটেনি। এতে করে মনটা তার ভরে উঠলো যেমন, হেলনা চেয়ারের উপর লোকটাকে ঐ অবস্থায় দেখে দুঃখও হলো তেমনি। মনে মনে বললো– আহা বেচারা!

যে চিন্তা ফিরোজা বানু অনেকদিন থেকেই করে আসছে, এই একটা রাতের পর ঐ চিন্তাই সে চূড়ান্ত করে ফেললো। বাড়িতে ফিরে আসার পথে সে দুলাহ মিয়াকে বললো– এভাবে আর চলে না মিয়া সাহেব। এর একটা ফয়সালা হওয়া চাই।

গাড়ীর গতি শ্লথ করে দুলাহ মিয়া বললো– কি চলে না আপা?

আমাদের এই অভিনয়। অনেকেই জেনে গেছেন আমরা স্বামী-স্ত্রী। এই জের আরো বেশী টানতে গেলে সব ফাঁশ হয়ে যাবেই আর তাতে করে কেলেংকারীর অবধি থাকবে না।

গাড়ীটা থামিয়ে দিয়ে দুলাহ মিয়া বললো– তাহলে কি করতে চান আপা?

: আমি তোমাকেই বিয়ে করতে চাই ।

: কি যে বলেন আপা! মস্করা করেন কেন? আমি কি আপনার স্বামী হওয়ার যোগ্য?

যোগ্য নও মানে? সর্বোতভাবে যোগ্য । এত বেশি যোগ্য যে তোমাকে ছেড়ে দিলে, তোমার অর্ধেক যোগ্যতা সম্পন্ন লোকও আমি আর পাবো না ।

: তা হবে কেন আপা? আমি লেখাপড়া জানিনে, কোন পদস্থ লোকও নই...!

আমার পদ আর লেখাপড়ার দরকার নেই । আমি চাই মানুষ । তোমার মতো । নির্মল চরিত্রের বিশ্বস্ত । নিরহংকার, ঈমানদার মানুষ । আমি আজীবন মনে মনে যা চেয়েছি, তোমার মধ্যে তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছি । আজই কেবল নয় । অনেকদিন থেকেই তোমাকে আমি মনে মনে ভালবেসে ফেলেছি । এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, শাদীতে আর দেরী করা চলবে না । সত্বর তোমাকে আমি শাদী করতে চাই । তুমি রাজি আছো তো?

তা আমি রাজী থাকবো না কেন আপা? এ যে আমার আসমানের চাঁদ হাতে পাওয়া । কিন্তু আপনার আত্মীয়-স্বজন, বিশেষ করে আপনার নানাজান এ শাদী মেনে নেবেন কেন?

মেনে নিলে ভাল, না নিলে বয়েই গেল । নানার কাছে আছি, তাই । আমি কি কারো মুখাপেক্ষী নাকি? মারা যাবার সময় আমার আব্বা আম্মা আমার জন্যে যা রেখে গেছেন, বসে থেকে খেলেও জীবন আমাদের কেটে যাবে । এছাড়া আমি এমএ পাশ করে বেরুলেই তো চাকরি একটা পেয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ । বরাবর রেজাল্ট আমার খুব ভাল ।

: আপা!

আর আপা আপা নয় । যা বলছি তার উত্তর দাও । দু'চারদিনের মধ্যেই কথাটা আমি নানাজানের কাছে তুলবো । তিনি না করলে, কাজীর অফিসে গিয়ে শাদী করবো তোমাকে । এরপর আমরা দু'জন আমার আব্বার বাড়িতে চলে যাবো । বাড়িঘর সব ভাড়া দেয়া আছে । একটা অংশের ভাড়া ছাড়িয়ে নিয়ে আমরা বসবাস করবো সেখানে । এসবে তুমি রাজী আছো তো?

: জি জি, আমি রাজী আছি ।

: গাছে তুলে দিয়ে মই টান দেবে নাতো?

: মই টান দেয়া মানুষ আমি কোনদিনই নই আপা ।

বলি বলি করতে করতে রোজা চলে এলো । রোজার মধ্যে কথাটা নানাজানের কাছে তুলবে কিনা ভাবতেই নানাজানের সেই বাল্যবন্ধু রকিব সাহেব আবার সবান্ধবে এসে হাজির হলেন । রকিব মিয়াকে দেখে হক সাহেব খোশকণ্ঠে বললেন– আরে দোস্ত যে! আসুন আসুন । তা হঠাৎ আবার কি মনে করে?

রকিব ওরফে রকিব উদ্দৌলাহ সাহেব হেসে বললেন– আমার উদ্দেশ্যে ঐ একটাই। আপনার নাতনীর সাথে আমার নাতীর শাদি দেয়া। আমি যে হাল ছাড়ার লোক নই।

হক সাহেব ম্লানকণ্ঠে বললেন– তবুও উপায় নেই দোস্ত। আপনার ঐ বিলেত ফেরত ব্যারিষ্টার নাতীকে যে আমার নাতনী কিছুতেই শাদি করতে রাজী নয়।

রকিব সাহেব হেসে বললেন– জামানা বদল গিয়া দোস্ত। এখন নাতনী আপনার এক পায়ে খাড়া।

: কেমন?

: আর কেমন! উভয়ের তাড়াতাড়ি শাদী দিয়ে নাতনী নাতজামাই নিয়ে খোশ হালে ঈদ করুন। ওরা নিজেরা নিজেরাই শাদী করে ফেললে ঈদটা আপনার বিষাক্ত হয়েও উঠতে পারে।

: ওরা! ওরা কারা।

: আমার নাতী আর আপনার নাতনী। ওদের যে আর তর সইছে না...!

: কি আবোল তাবোল বকছেন দোস্ত! আপনার নাতীর সাথে আমার নাতনীর সাক্ষাৎ হলো কোথায়?

: আপনার এই বাড়িতে। অনেকদিন থেকেই তো ওরা দু'জন একসাথেই আছে।

: তার অর্থ? কে আপনার নাতী?

আপনার ড্রাইভার দুলাহ মিয়া। আপনার নাতনীর মিথ্যা সন্দেহ দূর করার জন্যে, সে ড্রাইভার সেজে আপনার বাড়িতে ঢুকেছে। আসলে সে ম্লেচ্ছও নয়। বেশরাও নয়। নাতী আমার আসলেই একজন ঈমানদার মুসলমান।

: সে কি! দুলাহ মিয়া আপনার নাতী?

: জি, নামও দুলাহ মিয়া, কামেও সে এখন দুলাহ মিয়া।

স মা প্ত

www.boighar.com

www.boighar.com